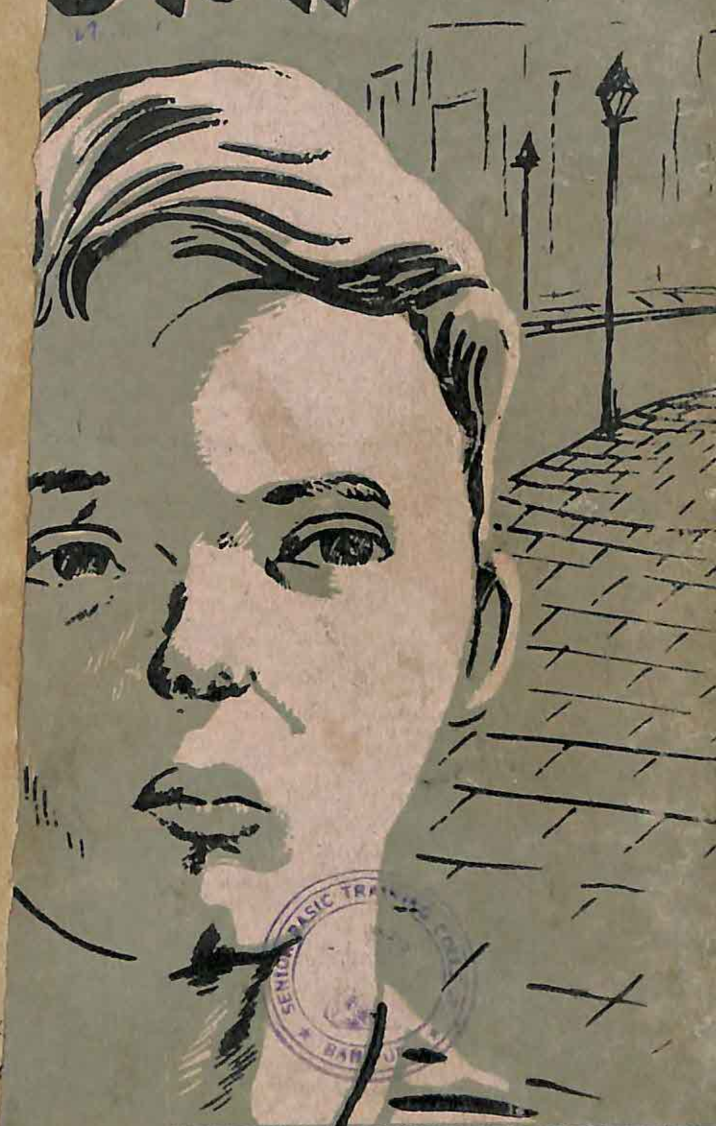
ভাগা



ম্যাকসিম গোর্কি

ম্যাকসিম গোর্কি

অভাগা

অনুবাদক ঃ সত্য গুপ্ত

অভাগা

ম্যাকসিম গোর্কি

নবভারতী

৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
এপ্রিল—১৯৫৩

প্রকাশক :
সুনীল দাশগুপ্ত
নব ভারতী
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রক :
শ্রীসুখলাল চ্যাটার্জি
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা—১৪

দাম—তিন টাকা

ভূমিকা

"অভাগা" ম্যাকসিম গোর্কির প্রথম রচিত উপন্যাস "লাক্‌লেস্ পল" বা "অরফ্যান পল"-এর অনুবাদ। ১৮৯৪ সালে নিঝ্‌নি নভগরদ শহরের একটি স্থানীয় পত্রিকায় উপন্যাসখানি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গোর্কির সম্মানে এই নিঝ্‌নি নভগরদের নাম হয় গোর্কি শহর।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে গোর্কি তাঁর এই প্রথম লেখা উপন্যাসখানিকে নিজের রচনাবলীর ভিতরে সংযোজিত করার উদ্দেশ্যে সংস্কার করেন। কিন্তু বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গোর্কির মৃত্যুর পরে তাঁর অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে পাওয়া গেলো এই উপন্যাসখানির টাইপ করা পাণ্ডুলিপি—স্থানে স্থানে তাঁর নিজের হস্তাক্ষর কিছু কিছু পরিবর্তন করে পরে ইহা বই আকারে প্রকাশিত হলো।

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে গোর্কি রচনা করেন তাঁর এই প্রথম উপন্যাস। রাত্রির অন্ধকারে পিতামাতা কর্তৃক পথের পাশে পরিত্যক্ত একটি অভাগা শিশুর জীবন কাহিনী অলবম্বন করে তরুণ গোর্কির এই অনবদ্য রচনা। তৎকালীন জার শাসিত রুশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার প্রতি স্তরে যে পাপ, অত্যাচার অনাচারের যে ক্লেদাক্ত কালিমা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিলো ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুতীব্র কশায় তরুণ গোর্কি একদিকে যেমন তাকে করে তুলেছেন জর্জরিত, অন্যদিকে শোষিত নিপীড়িত তলার মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, ব্যথা, বেদনার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি ও মানবীয় দরদের অপূর্ব প্রকাশে সমগ্র উপন্যাস-খানিকে করে তুলেছেন মহান।

ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে উপন্যাসখানির যতখানি সৌন্দর্য যতখানি তীব্রতা সংরক্ষিত হয়েছে, বাংলা অনুবাদেও তা যথাযথ সংরক্ষিত ক'রতে সাধ্য মত চেষ্টা ক'রেছি, তবে কতখানি সফল হ'য়েছি, তার বিচার পাঠক-বর্গের উপর নির্ভর ক'রছে।

—অনুবাদক

কলিকাতা,
২৩শে এপ্রিল, ১৯৫৩

এক

আমার এই উপন্যাসের নায়কের বাপ-মা ছিলেন অতি বিনয়ী লোক। পাছে কোনও একদিন লোকসমাজে তাঁরা পরিচিত হয়ে পড়েন এই ভয়ে একদিন গভীর রাত্রে শহরের এক জনবিরল পথের ধারে তাঁদের শিশুপুত্রটিকে ফেলে রেখে অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ নিজেদের এই সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁদের অন্তরে এতটুকুও গর্ববোধ ছিলো না; কিম্বা এতোটুকু নৈতিক সাহসও ছিলো না যে, পুত্রটিকে তাঁরা নিজেদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে গড়ে তোলেন। সে রকমের কোনও সদিচ্ছা যদি থাকতো তা হ'লে তার আভাস পাওয়া যেতো; কিন্তু যে রাত্রে তাঁরা তাদের শিশুপুত্রটিকে সমাজের হাতে সঁপে দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, শিশুটির গায়ের কম্বলের উপরে আঁটা এক টুকরা কাগজে কেবলমাত্র লেখা ছিলো বাহুল্যবর্জিত দুটি কথা: নাম—পল। সংসারের অধিকাংশ বাপ-মায়ের মতো তারা এতোটা নির্বোধ ছিলেন না যে স্বভাব, সংস্কার, আচার, ব্যবহারের মধ্যে তাদের নিজেদের জীবনের বেশীরভাগ সময়ই বৃথা নষ্ট করছেন সেইসব স্বভাব, সংস্কার, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা তাদের নিজেদের সন্তানদের মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেন। রাস্তার বেড়ার ধারে পরিত্যক্ত হয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুদে পল ব্যাপারটাকে খাঁটী অদৃষ্টবাদীর মতই গ্রহণ করেছিলো। নিঃশব্দে শুয়ে মুখের ভিতরে পুরে দেয়া পনীর মাখানো কাপড়ে মোড়া রুটীর টুকরাটি পরম নিশ্চিন্তে চুষতে লাগলো; চুষতে চুষতে যখন বিরক্ত হয়ে উঠলো তখন জিভ দিয়ে ঠেলে রুটীর টুকরাটি সরিয়ে দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। কিন্তু সেই ক্ষীণ শব্দে সুগভীর নৈশ নিস্তব্ধতা এতটুকুও বিক্ষুব্ধ হলো না।

প্রথম শরতের কৃষ্ণা রাত্রি; মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ; নৈশ বাতাসে তুষারপাতের পূর্বাভাষ। নুয়ে পড়া বার্চ শাখায় ইতিমধ্যেই পাতাগুলো হল্‌দে হয়ে উঠেছে, কতকগুলি পড়েছে ঝরে ক্ষুদ্র পলের ছোট্ট দেহখানি ঘিরে; থেকে থেকে দু'একটি পাতা নিঃশব্দে বৃন্তচ্যুত হয়ে ভিজা বাতাসে দুলে দুলে ধীরে নেমে আসছে নীচে মাটির বুকে। দিনের বেলা বৃষ্টি হয়ে গেছে; সন্ধ্যার আগে অস্তগামী সূর্যের কিরণ ভিজা মাটিকে উত্তপ্ত করে দিয়ে গেছে।

থেকে থেকে দু'একটি পাতা পলের দেহ ঘিরে মাতৃহস্তে সযত্নে শক্ত করে বাঁধা কম্বলের ফাঁকে অদৃশ্যপ্রায় টুকটুকে ছোট্ট মুখখানির উপরে ঝরে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পলের মুখখানি বিকৃত হয়ে উঠছে আর চোখ দু'টি ঘন ঘন পিট্‌ পিট্‌ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ছোট্ট দেহখানি কম্বলের পুটলির ভিতর থেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছে ততক্ষণ পর্যন্তই তাকে সহ্য করতে হয়েছে ঐ উৎপাত। এতোক্ষণে বাঁধন মুক্ত হয়ে সে তার পা-খানি তুলে মুখের ভিতরে পুরে দিয়ে পরমানন্দে চুষতে শুরু করে দিলো।

এখানে অবশ্য আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন; আমি কেবলমাত্র সাময়িকভাবে পথের ধারে পরিত্যক্ত শিশুটির কার্যকলাপের বর্ণনা করছি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী নই। ওকে দেখেছিলো কেবল নক্ষত্রখচিত সুনিবিড় আকাশ আর দেখেছিলেন স্বর্গের দেবতা—যাঁর কথায় শত শত কবির কল্পনা আবেগে মুখর হয়ে ওঠে আর ধার্মিকদের প্রার্থনায় ফেনিয়ে ওঠে আকুল উচ্ছ্বাস; কিন্তু মাটির পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারে যাঁর নীরব ঔদাসীন্য চিরন্তন।

আমি নিজে যদি পলকে ঐভাবে পথের পাশে পড়ে থাকতে দেখতাম তবে প্রথমে ওর বাপ-মায়ের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠতো, তারপর ঐ অসহায় পরিত্যক্ত শিশুটির প্রতি জেগে উঠতো করুণ অনুকম্পা। তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে পুলিস ডেকে আনতাম, তারপর একটা খুসীভরা গর্বিত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতাম। আমার বিশ্বাস, এরকম অবস্থায় যে কেউই আমার মতন করতো। কিন্তু কেউই তখন সেখানে ছিলো না। সুতরাং শহরের বাসিন্দারা বিনা আয়াসে এমন একটা মহৎ হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দেবার অপূর্ব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। মানুষমাত্রেই

কোনও না কোন কাজের ভিতর দিয়ে তার অন্তরের মহৎ বৃত্তির পরিচয় দেবার প্রয়াস পায়, অবশ্য যদি সেটা তার স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। যাহোক, একটি লোকও তখন সেখানে ছিলো না। ক্রমে পলের ক্ষুদ্র দেহটি শীতে অবশ হ'য়ে এলো; মুখের ভিতরে পুরে দেয়া পা-খানি আপনা থেকেই খসে পড়লো। অস্ফুট গোঙানী ক্রমে তীব্র চীৎকারে পরিণত হয়ে নৈশ স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে তুললো।

বেশীক্ষণ পলকে অমনি অবস্থায় পড়ে থেকে চীৎকার করতে হয়নি। আধঘণ্টার ভিতরেই একটি লোক এসে উপস্থিত হলো; লোকটি গায়ে কি যেন একটা জড়ানো, মনে হচ্ছিলো যেন একটা মোটা গাছের গুঁড়ি সচল হয়ে এগিয়ে এসে পলের মুখের'পরে ঝুঁকে পড়লো। 'বেজন্মা'—ভারী-গলায় বলে উঠেই লোকটা পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বারকয়েক থু-থু ফেললো তারপর শিশুটিকে দু'হাতে বুকে তুলে নিয়ে খুলে ফেলা কম্বলটি পুনরায় ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ওভার কোটের ভিতরে ঢেকে নিলো। এমনি করে সে তীব্র শীতের কন্‌কনে হাওয়া আর শিশু পলের কান্না দুই-ই একসঙ্গে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হলো।

বেশ, বেশ, ভালো!—হঠাৎ কে একজন বলে উঠলো;—বেজন্মা! এবার গ্রীষ্মে হয়েছিলো তিনটা, কি অভিশাপ! আরো একটা! নরক নরক! ঘোর কলি! থু-থু......

লোকটা ক্লিম ভিস্‌লেভ, রাত-চৌকীদার; গোঁড়া নিষ্ঠাবান্‌; কিন্তু অত্যধিক মদ্যাসক্তি কিম্বা মদ্যপানে তার নৈতিক চরিত্র কিছুমাত্র স্খলিত হয় না।

ওটাকে থানায় জমা দিয়ে এসোগে, যাও—হুকুম দিলো পেঙ্কো কনেষ্টবল,—শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বিখ্যাত ডন্‌জুয়ান। লোকটা নাকি তার কটা গোঁফ আর রক্তবর্ণ দুটো চোখের চাউনীর ঘায়ে যে কোন মেয়ের বুকে মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। হুকুম হলো আরিফি গিবলির উপর। আরিফি গিবলি পুলিসের সেপাই, নিটোল বলিষ্ঠ দুটো কাঁধ, সদাবিষণ্ণ গম্ভীর মুখ। লোকটি নির্জনতাপ্রিয়—পাখীর গান আর বই এই নিয়েই সারাক্ষণ থাকতে ভালোবাসে। বাচাল, ঘোড়ার-

গাড়ীর কোচোয়ান আর নারী—এ তিনের ঘোর বিদ্বেষী।

পলকে কোলে তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ আরফি থমকে দাঁড়ালো, তার পর শিশুর মুখের ঢাকা খুলে একটু ঝুঁকে একান্ত নির্ণিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ ওর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে অতি সন্তর্পণে হাত দিয়ে ওর গালটা একটু স্পর্শ করলো; পরক্ষণেই চোখ মুখ কুঁচকে জিভ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো। ইতিমধ্যে পল পুনরায় রুটীর টুকরাটি চুষতে আরম্ভ করে দিয়েছে; আরিফির ঐ অদ্ভুত শব্দ আর মুখভঙ্গীর প্রত্যুত্তরে পরম ঔদাসীন্যভরা দৃষ্টিতে ভ্রূ-যুগল ঈষৎ ঊর্ধ্বে তুলে একবার ওর মুখের পানে তাকালো; কিন্তু সে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে কোন ভাবের অভিব্যক্তিই পরিস্ফুট হয়ে উঠলো না।

আরিফি এতো জোরে হেসে উঠলো যে, তার গোঁফজোড়া প্রায় নাকের উপরে লাফিয়ে উঠলো আর কালো কুচকুচে বিরাট দাড়ির চাপ প্রবলভাবে আন্দোলিত হতে লাগলো। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সে ক্ষুদ্র পলের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলো!

ভবিষ্যৎ মানুষ, কি বলো?

প্রত্যুত্তরে সম্মতিসূচক ভংগীতে মাথা নেড়ে শিশু পল দুর্বোধ্য ভাষায় গাঁ-গাঁ করে উঠলো।

চা-হা! উ-ফি! ব্রু-ব্রু-ব্রু!—আরিফি গিবলি হেঁড়েগলায় শিশুটিকে আদর করতে শুরু করে দিলো, তারপর রাস্তার একটা আলোর নীচে পাথরের উপরে বসে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শিশুর মনে তার আদরের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলো। আরিফির দুর্বোধ্য ভাষায় বিরক্ত হয়ে শিশুটি বারবার মাথা নাড়তে লাগলো তারপর উদাস দৃষ্টিতে ভ্রূ-যুগল কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে তুলে তাকালো, কিন্তু মুখ থেকে রুটীর টুকরোটা ছেড়ে দিলো না।

প্রবল হাসির ধমকে আরিফি ফেটে পড়লো।

কিগো, পছন্দ হলো না বুঝি, হুঁ? ওরে ব্যাটা মশার ডিম!

হঠাৎ মশার ডিমের চোখ মুখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত; রুটীর টুকরাটি গলায় আঁটকে গেছে।

ক্ষিপ্র হস্তে, আরিফি ওর মুখের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে রুটীর

টুকরোটি টেনে বে'র করে উৎকণ্ঠা ভরা সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখলো যে, তার নখ লেগে শিশুটির মুখের ভিতরটা ছড়ে গেছে কিনা।

পল কাশতে শুরু করলো।

সস্ সস্—স্টিম ছাড়া ইঞ্জিনের মত আরফি একটা শব্দ করে উঠে দু'হাতে শিশুটিকে দোল দিতে লাগলো; ভাবলো, এতে করে বুঝি ওর কাশি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শিশুটির কাশি উত্তরোত্তর বেড়েই চল্‌লো।

আঃ তবেরে!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বিমূঢ় আরিফি অসহায়ভাবে একবার চারিদিক তাকালো।

নিঝুম নিস্তব্ধ পথ। দুধারের আলোগুলো মিটমিট করছে। বহু দূরের আলোর স্তম্ভগুলো মনে হচ্ছে যেন গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু তবুও সমস্ত রাস্তাটা ম্লান, তমসাচ্ছন্ন—যেন আকাশচুম্বী এক বিরাট কালো দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুমধুর হাসির ছটায় আকাশ উদ্‌ভাসিত করে মাথার উপরে তারাগুলি জ্বল জ্বল করছে।

চোখ নামিয়ে আরিফি দূরের ঐ কালো দেয়ালের ওপারে তাকালো। দেখা যাচ্ছে শহর—গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করা অসংখ্য কালো দেয়ালের স্তূপ, ম্লান আলোয় ঘেরা। ক্বচিৎ কখনও অস্ফুট কোলাহল জেগে উঠে পরক্ষণেই আবার অলস নিস্পন্দতায় ঝিমিয়ে পড়ছে।

ঘুমন্ত নগরীর পানে তাকিয়ে আরিফির গা ঘুলিয়ে উঠলো। বক্ষলগ্ন পলকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো।

এতক্ষণে পল প্রবলভাবে কাশতে শুরু করেছে; কাশতে কাশতে প্রায় সে কান্নার উপক্রম করে উঠলো।

নরক!—শহরের প্রতি তার অন্তরে জেগে ওঠা ভাবধারার একটা যুতসই অভিব্যক্তি প্রকাশ করে আরিফি উঠে দাঁড়ালো তারপর পরম যত্নে শিশুটিকে বুকের ভিতরে আঁকড়ে নিয়ে ঘুমন্ত পথের বুক বেয়ে চলতে শুরু করলো।

একটি রাস্তা ছেড়ে আর একটি রাস্তা, এ মোড় ছেড়ে আর এক মোড় —এমনি করে বহুক্ষণ ধরে সে চলতে লাগলো। কি এক অভিনব চিন্তার গুরুভারে ওর সবখানি অন্তর নিষ্পেষিত হয়ে উঠেছে; কোথাও বাঁক,

কোথাও বা সোজা, কোথাও দুটো পথ এসে মিলেছে এক চৌমাথায়—কিছুই তার খেয়াল নেই; চলতে চলতে এক সময়ে দেখতে পেলো, এসে পৌঁছেছে শহরের পার্কের কাছে। সে যে পার্কের কাছে চলে এসেছে তাও জানতে পারলো তখনই, যখন সামনে দেখতে পেলো পার্কের কৃত্রিম ঝরণাটা আর তার দু'পাশের দুটো আলোকস্তম্ভ। ঝর্ণাটা পার্কের মাঝখানে। আনমনে চলতে চলতে আরিফ থানা ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে এসেছে। নিদারুণ বিরক্তিতে একটা গাল দিয়ে উঠেই আরিফ ঘুরে দাঁড়ালো তারপর পুনরায় চলতে শুরু করলো। ওর কাঁধ বেয়ে ক্ষীণ আলোর রেখা বক্ষলগ্ন ক্ষুদ্র পলের মুখের উপরে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিগো, ঘুমোচ্ছ!—অনুচ্চ কণ্ঠে আরিফ বলে উঠলোঃ ওর দুটি চোখের অনিমেষ দৃষ্টি পলের ছোট্ট মুখখানির উপরে নিবদ্ধ। কি যেন একটা অস্বস্তিকর বস্তু বারবার ওর গলা বেয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছে; সেটাকে দমন করার অভিপ্রায়ে নীরবে সে একবার নাক ঝাড়লো।

বেশ হতো যদি শিশুরা তাদের জীবনের প্রথম দিনটি থেকেই নির্মম জগতের জটীলতার কথা উপলব্ধি করতে পারতো—আরিফ ভাবলো; যদি তাই হতো তা'হলে ওর বক্ষলগ্ন এই ভাবী মানুষটি এমন পরম নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে থাকতে পারতো না; নিশ্চয়ই তার সবটুকু শক্তি দিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিতো।

প্রৌঢ় বয়স্ক আরিফ গিবলি পুলিসের কাজে চুল পাকিয়েছে; জীবনে দেখেছে সে প্রচুর। খুব ভালো করেই জানে সে যে, যদি তুমি নিজেকে নিজে না প্রতিষ্ঠিত করতে পারো—অন্ততঃ একটিবার যদি চীৎকার করেও না ওঠো, তবে পুলিসের লোকেরাও তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না। যে কোনও রকমেই হোক, যদি না তুমি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারো তবে মৃত্যু অনিবার্য; কারণ, এ দুনিয়ায় একাকী কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। এই অবোধ শিশুটি যদি তার জীবনের সংকটতম মুহূর্তে এমনি করে গভীর নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকতো তবে নিশ্চয়ই ওকে মরে পড়ে থাকতে হতো।

কে আছো!—সদর দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে উচ্চ কণ্ঠে

আরিফি প্রশ্ন করলো।

কোথেকে আসছো হে?—অপ্রত্যাশিতভাবে একজন সহকর্মী এসে ওর মুখোমুখী দাঁড়ালো।

পাহারা থেকে...

আঙুলের ডগা দিয়ে পলের টুকটুকে গালের একটা মৃদু খোঁচা মেরে আগন্তুক হৃষ্টকণ্ঠে বলে উঠলো :

এটা আবার কি?

চুপ্ মূর্খ! দেখছ না একটা বাচ্চা।

আরে মলো যা! অমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছো কেন?

কে আছে এখন ডিউটিতে?

গোগোলেভ।

ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়ই?

ঘুমোচ্ছে কি হে, মরে আছে বলো!

মেরিয়া কি করছে?

করবে আবার কি, সেও ঘুমোচ্ছে।

হুঁ! তা অবশ্য ঠিক...জড়িত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বল্লো আরিফি। কেমন যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো,—গতি স্থির, স্তব্ধ, অচঞ্চল।

আমার ডিউটিও এক্ষুনি শেষ হয়ে যবে; আমিও তাহলে শুতে চল্লুম।—বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি চলতে আরম্ভ করলো।

একটু দাঁড়াও মিখেইলো।—হাত বাড়িয়ে আরিফি ওর জামার আস্তিনটা টেনে ধরলো, তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌লো: এখনকার মতো একে মেরিয়ার কাছে রেখে এলে হয় না...কি বলো?

তবেই হয়েছে আর কি!—পলের ঘুমন্ত মুখের পানে তাকিয়ে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে মিখেইলো হেসে উঠলো।—ব'লে নিজেরগুলো নিয়েই সে হিমসিম খাচ্ছে!

কেবলমাত্র এই একটা রাতের জন্যে...অনুরোধভরা কণ্ঠে আরিফি বল্‌লো।

আমার দিক থেকেতো কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু তুমিতো ওকে জানো —শেষপর্যন্ত আমাকে শুদ্ধ না লাথি মেরে দূর করে দেয়...আচ্ছা দাও, দেখি একবার চেষ্টা করে, কি করা যায়।

অতি সন্তর্পণে আরিফি ঘুমন্ত পলকে মিখেইলোর কোলে তুলে দিলো, তারপর তার কাঁধের উপর দিয়ে একান্ত আগ্রহাকুল দৃষ্টি মেলে ঘুমন্ত পলের মুখের পানে তাকাতে তাকাতে পা-টিপে পেছু পেছু এগিয়ে চললো। বারান্দার পাথুরে মেঝের উপরে মিখেইলোর ভারী বুটের শব্দে থেকে থেকে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অবশেষে ওরা এসে পৌঁছালো মিখেইলোর দরজার সামনে।

আমি এখানে দাঁড়াই—ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্‌লো আরিফি।

দরজা খুলে মিখেইলো ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলো। আরিফি নিশ্চল হয়ে চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে রইলো। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির গুরুভারে ওর অন্তর মথিত হয়ে উঠেছে। কোটের হাতা থেকে একগাছা সুতা ছিঁড়ে নিয়ে প্রথমে সে আঙুলের ভিতরে পাকালো তারপর সেটা ফেলে দিয়ে দাড়ির গোছার ভিতরে আঙুল ডুবিয়ে টানতে লাগলো; পরক্ষণেই দেয়াল থেকে নখ দিয়ে খুঁটে খানিকটা চূণ বালি তুলে নিলো; কিন্তু কিছুতেই মনের ভিতরে সাচ্ছন্দ্য ফিরে এলো না।

দোরের ওপাশ থেকে অনুচ্চকণ্ঠে ঝগড়ার অস্ফুট গুঞ্জন ভেসে আসছে।

খুব খানিকটা গালমন্দ করেছে বটে, কিন্তু রেখেছে শেষ পর্যন্ত দোর খুলে বাইরে এসে বল্‌লো, মিখেইলো! ওর দাড়িগোঁফ কামানো চাছাছোলা মুখের উপরে গর্বভরা জয়ের হাসির মৃদু আভা।

বেশ, বেশ, তা'হলেই হলো!—এতক্ষণে আরিফি গিবলি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো তারপর দু'জনে মিলে সদরের দিকে এগিয়ে চল্‌লো।

আচ্ছা ভায়া, আসি তবে এখন,—পাহারায় ফিরে যাচ্ছি।

এসো অন্যমনস্ক মিখেইলো জবাব দিলো তারপর একটা কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে কতগুলি খড় বিছাতে শুরু করলো অর্থাৎ শয্যারচনায় মন দিলো।

আরিফি সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে চল্‌লো। তৃতীয় ধাপে পৌঁছেই হঠাৎ ওর মনে হলো যেন পা দুটো সিঁড়ির পাথরের গায়ে গেঁথে গেছে। তেমনি করে বহুক্ষণ একই স্থানে স্থানুর মতন দাঁড়িয়ে থেকে ডাকলো: মিখ্‌?

হাঁ, কেন?

কাল দিয়ে আসছো ওকে?

উঁ? বাচ্চাটাকে? নিশ্চয়ই।

অনাথ আশ্রমে?

নাহে বোকারাম, ঐ কামারের ঘরে।

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপচাপ; কেবলমাত্র কোণের দিক থেকে মিখেইলোর খড়ের বিছানার খস্‌ খস্‌ শব্দ উঠছে। আরিফি ঘুমন্ত নগরীর পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকালো। নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রির নিকষ কালো অন্ধকারে মনে হলো যেন সমস্ত বাড়ীঘরগুলো লিপে মুছে একাকার হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র একটা বিরাট ধূসর দেয়ালে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। কালো, জনমানবহীন, বিসর্পিল পথ, ফাঁকা; শহরের শেষপ্রান্তে বাঁ-দিকে অনাথ আশ্রম; বিরাট একটা পাথুরে বাড়ী—ঠাণ্ডা, শাদা ভয়ংকর। জানালাগুলো বিরাট মুখব্যাদন করে হা করে রয়েছে, নেই পর্দা ঝুলানো; উঠানে নেই ফুলের বাগান।

ওখানে রেখে এলে নিশ্চয়ই মরে যাবে!—আরিফির কণ্ঠে অনুযোগ ফেনিয়ে উঠলো।

কে? বাচ্চাটা? খুবই সম্ভব তাই। ওখানে গিয়ে যারা মরে না তাদের সংখ্যা খুবই কম। পরিচ্ছন্নতা আর শৃংখলা...বলতে বলতে মিখেইলোর চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো—সে নাক ডাকতে শুরু করলো; পরিচ্ছন্নতা আর শৃংখলার ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে তার অর্ধপ্রকাশিত মন্তব্য আর কোনও বিশেষণে ভূষিত হয়ে সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার অবকাশ পেলো না।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে যখন পৌঁছলো তখন রাত্রির অন্ধকার ফিকা হয়ে এসেছে, বইতে শুরু করেছে প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়া।

প্রায় মাঠের মাঝখানে আরিফির কুটীর। হঠাৎ ওর মনে হলো বাড়ীটা যেন বড়ো বেশী নিরালা, নিঃসংগ—শহর থেকে বড়ো বেশী দূরে, বিচ্ছিন্ন, একা। আর কোনও দিন এমনি করে ওর মনে এ'ধরণের অনুভূতি জেগে ওঠেনি। কিন্তু আজ...

আরিফি দোরের সামনে পাতাবাহার গাছের ঝোপের ভিতরে অসমান বেঞ্চটার উপরে এসে বসলো। ওর বিরাট ধূসর দেহ অন্ধকার পটভূমিকায় মিশে গিয়ে যেন বিলীন হয়ে গেছে।

আরিফি ভাবতে লাগলো। ওর চিন্তার ধারা মন্থর, ভারী; বহুক্ষণ পরে ওর বিক্ষিপ্ত চিন্তার সূত্রগুলি এক হয়ে একটি প্রশ্নে রূপায়িত হয়ে উঠলো: লালন পালন করার যাদের ক্ষমতা নেই তাদের কি কোনও অধিকার আছে সন্তানের জন্ম দেবার?—ভাবতে ভাবতে আরিফি গিবলি তার প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধানে এসে পৌঁছলো: না, কোনও অধিকার নেই।

এতক্ষণে ওর মনটা যেন হালকা হয়ে এলো। একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস শূন্যে ছেড়ে দিগন্তের পানে বজ্রমুষ্টি উঁচিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে বলে উঠলো—যতো সব নোংড়া বেজম্মার দল!

সূর্য উঠলো। প্রভাত কিরণের অরুণ রেখা জানালার কাঁচের উপরে প্রতিফলিত হয়ে সোনালী আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো। জানালা দুটো মনে হলো যেন এক অতিকায় দৈত্যের সবুজ মুখের উপরের হাসিভরা বিশাল দুটো চোখ। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে দৈত্যটা আকাশের পানে তাকিয়ে ঊর্ধমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের উপরের গাছগুলো যেন ওর বিরাট মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল আর দরজার খাঁচাটা যেন ওর হাসির ধমকে কুঁচকে ওঠা কপালের সুগভীর বলিরেখা।

দুই

পরের দিন দুপুরবেলা আরিফি এসে বসলো মেরিয়ার ঘরে। মেরিয়ার সুঠাম বলিষ্ঠ গঠন, চোখ দুটি নীল; পরণের পোষাকটা ময়লা, ব্লাউজের হাতা গুটানো, তার প্রত্যেকটি ভাবভংগী চাল চলন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর—বুঝিবা অফুরন্ত শক্তির একখানি জীবন্ত কবিতা।

আরিফি গির্বালি ভেবেছিলো ওর সংগে অনেক কিছুই আলোচনা করবে; কিন্তু বেশী কথা বলতে অনভ্যস্ত স্বল্পভাষী আরিফির সবকিছুই ওর সামনে এসে কেমন যেন ঘুলিয়ে গেলো। একটা বিশ্রি অস্বস্তিকর ভাব ওকে আরও যেন সংকুচিত করে তুল্‌লো। আজীবন নারী বিদ্বেষী আরিফি কিছুতেই যেন তার সে বিদ্বেষ চেপে রাখতে পারছিলো না—অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে মেরিয়ার মুখের পানে তাকানো আর তার পরই মেঝেতে থুথু ফেলা—এ দুয়ের ভিতর দিয়েই যেন তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিলো।

একটা চওড়া বেঞ্চের উপরে ছেঁড়াখোড়া কাঁথাকম্বলের উপরে পল শুয়ে। শুয়ে শুয়েই সে একটা কসরৎ করে চলেছে।—দু' হাতে একটা পা তুলে বারবার মুখের ভিতরে পুরে দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অবাধ্য পা-টা বারবারই ওর হাত ফস্‌কে ছুটে যাচ্ছে; অবশ্য পল তাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ না হয়ে বরং ঐ ব্যর্থতার পৌনঃপুনিকতায় খুসী হয়ে উঠে আনন্দে গাঁ-গাঁ শব্দ করছে।

কি গো নাস্তিক, খবর কি? ওটাকে নিয়ে এখন কি করবে ভেবেছ? মুখ মুছতে মুছতে আরিফির সামনে এসে বসে মেরিয়া প্রশ্ন করলো।

আমি কিন্তু রাখতে পারবো না, তা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি। কিছুতেই না। ঐ কিত্যেভা বুড়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসো; মাসে মাসে ওকে দুটো করে টাকা ধরে দিলেই ও পুষবে'খন। এক মাসের উপরে বয়স হয়ে গেছে, বাচ্চাটার স্বাস্থ্যও ভাল, তাছাড়া শান্ত, কান্নাকাটি নেই; কোনও ঝঞ্ঝাটই পোহাতে হবে না ওকে নিয়ে। ওর কাছেই রেখে দিয়ে এসোগে।

হাঁ, তাতো বটেই, তারপর খেতে না দিয়ে মেরে ফেলুক আর কি!

খেতে না দিয়ে মেরে ফেলবে? কেন? কেন মেরে ফেলবে? —প্রত্যুত্তরে মেরিয়া বললো।

কেন? যেহেতু স্ত্রীলোক, তাছাড়া...

তবেরে গোমরামুখো ভূত! এক্ষুণি আমি ওকে নিয়ে গিয়ে তার কাছে রেখে আসছি। ব্যস্! এটা হবে তার একাত্তর নম্বর। হাঃ হাঃ হাঃ... না খাইয়ে মেরে ফেল্লেই হলো! বলি ছেলেপুলেদের পেলে পুষে মানুষ করে কারা?—তোমাদের মতন ভূতেরা নাকি? এই মেয়েরা, বুঝেছ! এই মেয়েরা! মেয়েদের অসীম শক্তি, তা জানো? তোমার মতোন ভূতগুলোকে কে অত বড়ো করে তুলেছে? ভেবেছ বুঝি কামারশালা থেকে তৈরী হয়ে একেবারেই অত বড়োটা হয়ে বেরিয়ে এসেছো, না? মুখেরতো আর টেক্স নেই, যা খুসী বল্লেই হলো আর কি!

আঃ! কেন অত বাজে বকছো?—আসল কাথাটা পাড়ার উদ্দেশ্যে আরিফি বলে উঠলো, কিন্তু মেরিয়ার চোখের দিকে তাকাতে ভরসা হলো না। ওর মনে হলো, মেরিয়া যেন কেমন একটা তাৎপর্যপূর্ণ তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

আদৌ আমি সে কথা বলিনি। ভাবছিলাম...

ঢের হয়েছে থামো! তোমাকে খুসী করার জন্য আমি তোমার মনরাখা কথা বলবো তা মনেও স্থান দিওনা, বুঝলে? ওঃ! কি আমার মানী লোক এলেন গো! কেন, আমার কথায় কি এতোই ধার যে শুনলেই তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে? ভেবেছো কি তোমাকে আমি খাতির করে কথা বলবো! তোমার মতন মানুষকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ধরে ধরে মার দেয়া উচিত, বুঝলে?

আচ্ছা আচ্ছা, এবার কাজের কথা বলো, ওকে নিয়ে এখন কি করা যায় বলো দেখি? তারপর আমি চলে যাচ্ছি; এখানে বসে বসে তোমার বকবকানী শোনা আর আমার বরদাস্ত হচ্ছে না। জানো হাঁদারাম! আমাদের মেয়েদের মন কতো নরম, কতো কোমল!

—এই কথা বলার সংগে সংগেই মেরিয়ার উদ্ধত ভাবভংগী কেমন যেন আপনা থেকেই শিথিল হয়ে এলো; মিইয়ে এলো ওর কণ্ঠের উগ্র ঝাঁজ।

কিন্তু ওর স্বভাব সুলভ চঞ্চলতা মুহূর্তের জন্যেও প্রশমিত হলো না। নানান্ কাজে ছোটাছুটি করে সে ছোট্ট ঘরখানি মুখর করে তুল্লো। কখনও উনুনের উপরের হাঁড়িতে একটু নাড়া দিচ্ছে, কখনও বসছে সেলাই নিয়ে; আবার পরক্ষণেই উঠে গিয়ে একটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। একটা বাচ্চাকে তুলে এনে শুইয়ে দিলো উনুনের সামনে, আর একটাকে পিছনে; পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে গিয়ে বিছানার ঢাকাটা টেনে দিলো; জানালা গলিয়ে মুখ বের করে মুরগীগুলোকে ডাকলো; তারপর আবার ফিরে এলো বাচ্চাগুলোর কাছে; কোনটার মাথায় একটা ঠেলা দিলো, কোনটাকে মারলো একটা চাঁটি—বাচ্চাগুলো তাড়স্বরে চীৎকার জুড়ে দিলো। অবশেষে মেরিয়া আরিফির কাছে ফিরে এসে তার মুখের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভংগীতে হাত উঁচিয়ে বলতে শুরু করলো শোন, প্রথম তুমি সার্জেণ্টের কাছে যাও; তাকে গিয়ে বলো যে ছেলেটাকে আমি নিলুম। তার পর একমাসের আগাম হিসাবে দুটো টাকা নিয়ে এসে আমাকে দাও, আমি কিত্যেভা বুড়ীর কাছে ওকে রেখে আসবো। হাঁ, ঐ সংগে আরও একটা টাকা এনো—বাচ্চাটার একটা জামা আর একখানা ছোট্ট কম্বল কিনতে হবে...তা ছাড়া আর যদি কিছু দরকার হয়। এখন সোজা চলে যাও দেখি,—আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও! তোমার গোমরা মুখ দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে—বুঝলে মুখচোরা ভূত!

আরিফি উঠে দাঁড়ালো, তারপর একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নীরবে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

বিকালে কিত্যেভা বুড়ী এলো মেরিয়ার সংগে দেখা করতে। বুড়ীর বাঁ-চোখটা কানা, মুখখানা শুট্‌কো মুলোর মতন; থুতনীর উপরে একগাছা লম্বা পাকা দাড়ি। কিত্যেভা ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁ-চিঁ করে কথা বলে, আর তার প্রত্যেকটা কথাই যে আভ্রান্ত সত্য সেটা প্রমাণ করার জন্য একটা দুটো কথার ফাঁকে ফাঁকেই ভগবানের দোহাই পাড়ে।

শুষ্ক গম্ভীর কণ্ঠে মেরিয়া ওকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্লো; তারপর কি কি করতে হবে না হবে সে সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে পরিশেষে তর্জনী উঁচিয়ে তাকে সতর্ক করে দিলো: খুব সাবধান মনে থাকে যেন!

খবর্দার বেশী বাড়াবাড়ি করোনা...সীমা রেখে চ'লো!

কিত্যোভা বুড়ী তার সমস্ত দেহটা কুঁকড়ে একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে তুল্‌লো তারপর মাথা নুইয়ে মেরিয়াকে অভিবাদন করে মুখে চোখে একটা দাস্যতার মৃদুহাসি ফুটিয়ে পরম আনুগত্যে প্রায় গড়াতে গড়াতে মেরিয়ার কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে শুরু করলো:

মেরিয়া টিমোফিয়েভনা! তুমিতো আমাকে জানো! অন্য কেউ হলেও না হয় একটা কথা ছিলো, কিন্তু, সেতো আর তোমার কাছে চলবেনা...

ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ী বলতে লাগলো তারপর অর্দ্ধ পথে এমন ভাবে থেমে গেলো যেন আরও অনেক কিছুই তার বলার ছিলো, কিন্তু, সে শক্তি আর তার নেই...

হাঁ, ঠিক তাই, মনে থাকে যেন! তোকে কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, বুড়ী বক-ধার্মিক!—কথাটা মেরিয়া এমন সুরে বল্‌লো যে সেটা ঠিক ঐ বৃদ্ধা নারীর পক্ষে খুব প্রশংসাসূচক বলে মনে হলো না।

এতক্ষণ পর্যন্ত পল তার বিছানার উপরে চুপচাপ শুয়ে ছিলো; কিন্তু যেইমাত্র কিত্যোভা বুড়ী ঈশ্বর দয়া করো বলে ওকে দুহাতে কোলে তুলে নিলো, সংগে সংগেই প্রতিবাদ ভরা কণ্ঠে একবার কেঁদে উঠে পরক্ষণেই আবার শান্ত হয়ে অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করে চুপ করে গেলো। রাস্তায় এসে পৌঁছানো পর্যন্ত পল তেমনি চুপচাপ ছিলো; কিন্তু চোখে রোদ লাগতেই ওর মুখখানি কুঁচকে উঠলো, মাথাটা এদিক ওদিক নাড়তে আরম্ভ করলো; কিন্তু তাতেও কোনও ফল হলো না; রৌদ্রের ঝাঁজ ওর কোমল চামড়া ভেদ করে গাল দুটোকে যেন পুড়িয়ে দিতে লাগলো, পল চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

আরে ক্ষুদে বজ্জাত! ওখানে ঘরের ভিতরে বেশতো চুপচাপ ছিলি যেন কান্নাকাটি কিচ্ছু জানিসনা, আর যেমনি বাইরে নিয়ে এলুম অমনি চীৎকার জুড়ে দিয়েছিস্‌! থাম্‌, থাম্‌ চুপ করে শুয়ে থাক!—বুড়ী বিড়বিড় করতে করতে পলকে দু'হাতে দোল দিতে দিতে রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চল্‌লো। এতাবৎকাল বুড়ী কিত্যোভার পোষ্য সংখ্যা ছিলো পাঁচটে—পাঁচটি ক্ষুধার্ত

কণ্ঠের তীব্র চীৎকারে মুহূর্তের জন্যেও নাকি বুড়ীর শান্তি ছিলো না।... হা ভগবান্! আরও একটাকে এনে জোটালুম—তা'হলে মোট হলো গিয়ে ছ'টা বুড়ী মনে মনে হিসাব করতে লাগলো: দারুণ ঝঞ্চাট; কিন্তু তবুও মন্দের ভালো এই যে, সুখে স্বচ্ছন্দে দুটো খেতে পরতে পাই আর নাই পাই, উপোস করে শুকিয়ে মরতে হচ্ছেনা, এই যা।

জানালার জীর্ণ সবুজ কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো তেরছা হয়ে এসে মেঝের উপরে পড়েছে। ভাংগা কাঁচের টুকরাগুলো আটা দিয়ে জুড়ে জুড়ে এক অদ্ভুত বিচিত্র নক্সায় রূপ নিয়েছে, ঘর দুটোর তীব্র দুর্গন্ধে বুঝিবা সূর্যের আলোও ম্লান, সংকুচিত হয়ে উঠেছে। ধোঁয়া আর ঝুল কালিতে ছাদের রং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, দেয়ালের চূণ বালি খসে খসে পড়েছে—যেমন নোংড়া তেমনি জীর্ণ; মেঝেটা ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে।

প্রথম ঘরটা বাচ্চাগুলোর। আসবাবপত্রের বালাই নেই; কেবল মাত্র তিনটা চওড়া বেঞ্চ; বেঞ্চগুলোর উপরে এক গাদা ছেঁড়াখোড়া কাঁথা-কম্বল চাপানো—যেমনি ময়লা তেমনি দুর্গন্ধ। ঘরটা এতো নোংড়া যে মাছিগুলো পর্যন্ত তার ভিতরে বেশীক্ষণ বসতে ভরসা পায় না। ভিতরে ঢুকে অল্প কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পরেই ওগুলোর দম আটকে আসে, তারপর প্রতিবাদ স্বরূপ ভন্-ভন্ শব্দ করতে করতে পাশের ঘরে উড়ে যায়, কিম্বা দোরে ময়লা তেলচিকে পর্দার ফাঁক দিয়ে হল ঘরের ভিতরে এসে ঢোকে।

মাঝখানে কাঠের বেড়া দিয়ে দ্বিতীয় ঘরটাকে বাচ্চাদের ঘর থেকে আলাদা করা হয়েছে; বেড়ার গায়ে ছোট্ট একটা দরজা; দরজার বিপরীত দিকে একটা বড় টেবিল। টেবিলের উপরে একটা কোণের দিকে রং চটা বড়ো একটা কেট্লী হুমড়ি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। কেট্লীটা প্রায় অকর্মণ্য—সর্বাংগ ক্ষতবিক্ষত, বিকারগ্রস্থ রোগীর মতন সর্বদা ফোঁস্ ফোঁস্ ঘড়-ঘড় শব্দ করে। কিত্যেভার গৃহস্থালীর যাবতীয় নোংড়া আসবাবপত্রের ভিতরে ওটা যেন চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে।

মনে হবে ঘর দুটো জনমানব হীন—কেউ কোথাও নেই। কেবলমাত্র মাছির ভন্-ভনানী আর উনুনের উপরে চাপানো জীর্ণ কেট্লীটার বিরক্তিকর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ছাড়া আর কোন কিছুর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু

দরজার [illegible] অন্ধকার কোণটার দিকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে দেখলেই এ ধারণা যে ভুল তা প্রতিপন্ন হয়ে যাবে। ওখানে ঐ অন্ধকার কোণে [illegible] কাঁথাটার উপরে কি যেন একটা জ্যান্ত পদার্থ নড়া-চড়া করছে; [illegible] বাঁকা মতন ঐযে—ওটা হচ্ছে একটা পা; খুব ভালো করে কান পেতে শুনলে একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ একঘেয়ে গোঙানীর শব্দও শুনতে পাওয়া যাবে।

পা'টার মালিক দেড় বছর বয়সের একটি শিশু; শিশুটির দুটো পা'ই অমনি বাঁকা; শীর্ণ অস্থি-চর্ম-সার; গায়ের রঙ সবুজ হয়ে উঠেছে। বুড়ী কিত্যেভা যখনই রেগে যেতো ওকে ডাকতো ঝাল-মুলো বলে। বুড়ী তার প্রত্যেকটি পোষ্যের এমনি এক একটি নাম করণ করে রেখেছে; 'ঝালমুলো' নামটি ঐ কংকালসার শিশুটির ঠিকই উপযুক্ত হয়েছে; অশীতিপর বৃদ্ধের মতন ওর গায়ের চামড়া সব কুঁচকে গেছে; রোগে ভুগে ভুগে শীর্ণ, বিকৃত, অস্থিচর্ম-সার। কালকুঞ্চিত মুখের উপরে কেমন যেন একটা নিদারুণ সংশয়-কুণ্ঠিত তিক্ত ভাব—যেন সব সময়েই খুঁজে ফিরছে যে, তাকে এমন জন্ম বিকলাংগ করে দুনিয়ার বুকে আনার জন্যে দায়ী কে? কে করেছে ওর সংগে এমন মর্মান্তিক নিষ্ঠুর পরিহাস আর করছেই বা কেন? যদিও মনে হবে যে, সেই নিষ্ঠুর অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু পরক্ষণেই আবার এটাও মনে হবে যে সে তার ঐ প্রচেষ্টার ব্যর্থতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ স্থিরপ্রত্যয় হয়ে গেছে; তাই সর্বদাই নিঝুম, মনমরা, বিষণ্ণ।

রাতদিন শিশুটি ঐ অন্ধকার কোণটিতে পড়ে থাকে আর একটির পর একটি করে তার বাঁকা পা দুটিকে তুলে তুলে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। ওর কোটরগত দুটি চোখের করুণ দৃষ্টি বেয়ে ফুটে ওঠে কেমন যেন একটা থম্‌থমে বিষাদময় ভাব।

শিশুটির রক্তশূণ্য পাণ্ডুর দুটি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দন্তহীন ফোঁক্‌লা মাড়ি আর হল্‌দে ছ্যাত্‌লা পড়া ছোট্ট জিভ্‌টুকু বেরিয়ে থাকে; হাত দুটো নাড়বারও ক্ষমতা নেই,—দুটো হাতই বেঁকে গোল হয়ে রয়েছে; কব্জি দুটো বগলের ভিতরে ঢোকানো। পা দুটো যদিও কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঠিকই আছে কিন্তু হাঁটুর নীচে থেকে বাকীটা ধনুকের মতন বাঁকা।

পা দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যখন ওর বিরক্তি ধরে যায়, তখন দুটি চোখের অসহায় দৃষ্টি মেলে উর্ধ্বে ছাদের পানে তাকায়। ছাদের গায়ে দেখতে পায় কম্পিত আলোকের ছোট্ট একটি বৃত্ত ঝিক্‌মিক্‌ করছে— জানালার পথে সূর্যের আলো বালতির জলে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে ছাদের গায়ে। কিন্তু ঐ আলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ভিতর দিয়ে বিশেষ কোন লাভ নেই জেনে পুনরায় সে তার দৃষ্টি সরিয়ে এনে পায়ের উপরে নিবদ্ধ করে। এটাই যেন ওকে আকর্ষণ করে সব চাইতে বেশী— আলোর প্রতি আদৌ কোন আকর্ষণ অনুভব করে না; কারণ হয়তো সে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে অদূর ভবিষ্যতে একদিন জগতের সব আলোই মুছে যাবে ওর চোখ থেকে—শেষ হয়ে যাবে ওর দেখা, শোনা, আর ভাববার ক্ষমতা; তারপর একদিন এই ধরণীর বুক ছেড়ে আশ্রয় নিতে হবে গিয়ে নীচে, মাটির তলায়।

দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে শিশুটি রয়েছে বুড়ী কিত্যোভার আশ্রয়ে; কিন্তু এতদিনের ভিতরে ওর দরুণ খরচের টাকা পেয়েছে সে মাত্র দু'মাসের। কিত্যোভা বুড়ী তাই অধৈর্য হয়ে উঠেছে; কতোদিনে ছেলেটা শেষ হয়ে গিয়ে ওর ঘর খালি করে দেবে তারই অপেক্ষায় গুণছে দিন।

একদিন কিত্যোভা ছেলেটার মায়ের ঘরে এসে হাজির হলো। মেয়েটি দরজীর কাজ করতো; রুগ্ন কংকালসার চেহারা, পান্ডুর রক্তহীন। বুড়ী এসে দেখলো, মেয়েটি মুমূর্ষু অবস্থায় একটা খাটের উপরে পড়ে আছে।

বলি হ্যাঁ গা মেয়ে, চলৎ-শক্তিহীন রোগ ক্লিষ্ট মেয়েটির খাটের পাশে বসে পড়ে কিত্যোভা বলতে আরম্ভ করলো—পেটে তো ধরতে পেরেছিলে খুব, কিন্তু এখন খাওয়াবার মুরদ নেই কেন? এ কিন্তু বাছা ভারী অন্যায়! তোমার পাপের ভোগ আমি ভুগে মরবো এমনতো কোন দাসখত দিয়ে আসিনি কারুর কাছে, হয় টাকা ফেলো নয় বাছা তোমার ছেলে ফিরিয়ে নাও। আমি তো আর রাজরাণী নই যে, এ্যাতো এ্যাতো টাকা রয়েছে আমার ঘরে! ভয়ে বেদনায় মেয়েটির ম্লান কতর দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

দিদিমা!—কান্নাভরা করুণকণ্ঠে মেয়েটি ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌লো; —দুদিন সবুর করো, দেবো আমি তোমার টাকা—শেষ পাইটি পর্যন্ত মিটিয়ে

দেবো। তোমার পাওনা টাকা আমি ফাঁকি দেবো না। গায়ের চামড়া কেটে বিক্রি করে দিতে হয় তাও দেবো। বেশ্যাবৃত্তি করবো...দয়া করে দুটোদিন সবুর করো; দয়া করো! দয়া করো! এই দুঃখিনী আর তার বাচ্চাটার উপরে একটু দয়া করো...ইঃ...ইঃ...ইঃ...দ-য়া ক-রো!

কিতোভা বুড়ী বসে বসে শুনলো ওর কাতরানি—করুণ মিনতি: দেখলো, ওর দুটি চোখ বেয়ে বড়ো বড়ো ফোটায় গড়িয়ে পড়ছে জল; গাল দুটি ভেঙে বসে গেছে, শীর্ণ বুকখানি তীব্র যাতনার দ্রুত নিঃশ্বাসে ওঠা নামা করছে।

খানকী মাগী! লজ্জা নেই তোর! তোকে ধরে আচ্ছা করে চাবকানো দরকার! হাঁ—বুড়ী খেঁকিয়ে উঠলো।

না গো দিদিমা, না! খুব ভালোবাসতো সে আমাকে; বলেছিলো, বিয়ে করবে...

থাম বাপু, থাম! ও পুরানো 'কেত্তন' আমি আর শুনতে চাই না! লক্ষবার শুনেছি আমি ঐ এক কথা!

কিন্তু মনে হলো, বুড়ী কিতোভা ঐ পুরানো 'কেত্তন' কেবলমাত্র কানেই শোনেনি, এক কালে নিজেও সে গেয়েছে ঐ গান। হঠাৎ কিতোভার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো, গলা খাঁকারি দিয়ে কাশলো দু'একবার; মাথাটা আপনা থেকেই নুয়ে পড়লো; বহুক্ষণ ধরে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে লুপ্ত স্মৃতির ভগ্ন স্তূপে কি যেন হাতড়ে বেড়ালো, তারপর রুগ্না মেয়েটির শীর্ণ গালে একটি চুম্বন করে জলদি ওকে সুস্থ হয়ে ওঠার হুকুম দিয়ে চলে গেলো।

কিন্তু অবাধ্য মেয়েটা ওর সে হুকুম অমান্য করে একদিন মরে গেলো। 'ঝাল মুলো' কিতোভা বুড়ীর আশ্রয়েই রয়ে গেলো। অনতিবিলম্বেই বুড়ী বাচ্চাটাকে নিয়ে ভীষণ বিব্রত হয়ে উঠলো। ওকে ঘরের একটা কোণে এনে ফেলে রেখে দিয়ে স্বাভাবিক পরিণতির অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলো। মনে মনে বুড়ী নিজের বিবেককে এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো যে—ওরতো হয়েই এসেছে, বাঁচবেই বা আর কতক্ষণ!

'ঝাল মুলো' ছাড়াও আরও আছে চারটি। তিনটির দরুণ বুড়ী নিয়মিত প্রতি মাসেই পেতো খরচ! আর চতুর্থটি বেরুতো ভিক্ষায়। ভিক্ষায় বেরিয়ে

সে যে পরিমাণ রোজগার করে নিয়ে আসতো, সেটা তার নিজের দরুণ বরাদ্দ খরচার চাইতে ঢের বেশী। এটির নাম, গুরকা বল। নাদুসনুদুস গোলগাল চেহারা, গালদুটো রক্তিম, বয়স ছ'বছর। ছেলেটা অসম সাহসী। কিত্যোভা বুড়ী ওকে ভালোবাসে সবচাইতে বেশী।

কালে তুই একটা একনম্বরের ডাকাত হবি গুরকা! —সেদিন সন্ধ্যায় ভিক্ষা থেকে ফিরে এলে পর প্রশংসাভরা তৃপ্ত কণ্ঠে বুড়ী বললো। ইতি-মধ্যেই সে ওর ঝুলি থেকে টেনে বের করেছে কতগুলো রুটী, কেট্‌লীর ঢাকনা, দরজার হাতল, নানারকমের খেলনা, ওজনের বাটখারা, হালকা কড়াই, দুএকখানা পুরানো বাসন ইত্যাদি।

দেখে নিও, বড়ো হয়ে আমি খুব মস্তোবড়ো ডাকাত হবো। সব কিছু চুরি করে আনবো, মায় ঘোড়া পর্যন্ত!

আর সেপাইরা ধরে যদি তোকে সাইবেরিয়ায় চালান দেয়, তখন? বুড়ীর কণ্ঠ স্নেহে গদগদ হয়ে উঠলো।

আবার পালিয়ে চলে আসবো!—গুরকা চট করে জবাব দিলো। সেদিন কিত্যোভা ওর হাতে সাতটি পয়সা গুঁজে দিয়ে ওকে খেলতে পাঠিয়ে দিলো।

বাকী তিনটির ভিতরে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। কোনটিই এখন পর্যন্ত কোন বিশেষ গুণের অধিকারী হয়ে উঠতে পারেনি। অনেকক্ষণ খেতে না দিলে ওরা গলা ফাটিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে, আবার পরিমাণে বেশী খাইয়ে দিলেও চীৎকার করে। যদি কিত্যোভা বুড়ী ওদের জল খাওয়াতে ভুলে যায় তাহলেও ওরা কাঁদে আবার যদি জোর করে জল খাওয়াতে যায় তাহলেও কাঁদে। এছাড়াও আরও অনেক সংগত অসংগত কারণে ওরা চীৎকার করে থাকে। কিন্তু সে কারণ কারুর ব্যক্তিগতই হোক আর সমবেতই হোক, কিত্যোভার কাছে আদৌ সেটা তেমন বড়ো কথা নয়; সঙ্গে সঙ্গে সেও এতো জোরে গলা ফাটিয়ে গাল পাড়তে শুরু করে দেয় যে, তিনটি শিশুর সমবেত কণ্ঠের চীৎকারও বুড়ীর সে গলাবাজির কাছে ডুবে যায়।

ছেলেগুলো ভারী শয়তান—রোজ রোজ খেতে চায়, পরতে চায়, চায় শুকনো বিছানা, জামা, কাপড়, চায় হাওয়া আলো, আরও কত কি! কিন্তু সব

পাওয়ার এখনও ওদের কোন অধিকার জন্মায়নি; কারণ এখনও ওরা যথেষ্ট বড়ো হয়ে ওঠেনি—বড়ো হতে আরম্ভ করেছে মাত্র। এসম্পর্কে কিতোভা বুড়ীর একটা নৈতিক মতবাদ আছে। কারুকেই সে এতটুকু প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। বরং সে চায় সবাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক—নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দের জন্য যা কিছু প্রয়োজন নিজেরাই সে সব সংগ্রহ করে আনুক।

কিতোভা বুড়ীর প্রাত্যহিক দিন শুরু হতো এমনিকরে: পাঁচটি শিশুর মধ্যে গুরকা বলের ঘুম ভাঙতো আগে। একমাত্র সেই শুতো কিতোভা বুড়ীর ঘরে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই গুরকা তার কাঠের বাক্সের উপরের বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে বালিশের তলা হাতড়ে একটা পাখির পালক বের করে অতি সন্তর্পণে—যাতে দরজা খোলার সময়ে এতটুকুও শব্দ না হয় এমনি করে, নিঃশব্দে বাচ্চাগুলোর ঘরে এসে ঢুকতো। পা টিপে টিপে ঘুমন্ত শিশুগুলির কাছে এগিয়ে এসে তার হাতের পালকটি দিয়ে ওদের নাকে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করে দিতো। বাচ্চাগুলো এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তো, বিকৃত হয়ে উঠতো ওদের মুখ, তারপর হাতের মুঠো দিয়ে দারুণভাবে নাক ঘসতে শুরু করে দিতো। উদ্গত হাসি চাপতে গিয়ে গুরকা রাঙা বেলুনের মতন ফুলে ফুলে উঠতো। অবশেষে কোনও একটি শিশু জেগে উঠে যখন চীৎকার জুড়ে দিতো, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিও প্রবৃত্ত হতো প্রথমটির অনুকরণে। 'ঠাকুমা' বলে প্রাণপণে চীৎকার করে একবার ডেকে উঠেই গুরকা সাপের মতন ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে বাচ্চাগুলোর নাকের ভিতরে ফুঁ দিতে আরম্ভ করতো। এমনি করে গুরকা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতো।

শুরু হতো সমবেত কণ্ঠের ঐক্যতান—যেমন তার সুউচ্চ সুর তেমনি বিচিত্র শব্দ সমাবেশ। হেঁচে, কেশে কেঁদে কোঁকিয়ে বাচ্চাগুলো এমন কাণ্ড জুড়ে দিতো যে মনে হতো যেন কেউ তাদের সবগুলোকে একসঙ্গে তপ্ত কড়ায় ছেড়ে দিয়ে ভাজতে শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু 'ঝাল মুলো'র পেছনে গুরকা কখনও লাগতো না। একবার ওর পেছনে লাগতে গিয়ে গুরকা দেখলো, সেই স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে বাচ্চাটা ওর মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে। ওর মনে হলো সে দৃষ্টি যেন শিশুর

দৃষ্টি নয়, পুলিসের সন্ধানী চোখের তীক্ষ্ন তীব্র দৃষ্টি। নানান্ কারণে গুরকা পুলিসের লোকদের তেমন বিশেষ পছন্দ করতো না; দৈবাৎ যদি কখনও কারুর সামনে পড়ে যেতো তবে সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে সট্‌কে পড়তো। স্কাল মুলোর কাছ থেকে গুরকা সরে এলো তারপর থেকে আর কোনোদিনও সে ঐ হাড় লিক্‌লিকে রোগাপট্‌কা শিশুটিকে ঘাটাতে যেতো না।

ওহঃ-ওহঃ-ওহঃ! রাক্ষসগুলো চীৎকার জুড়ে দিয়েছে...যেন ভিখ্ মাঙ্‌ছে দেখো না! চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে! মরুকগে ছাই, চাঁচাক!—এমনি ধরণে নানাবিধ মন্তব্য করতে করতে বুড়ী কিতোভা প্রত্যহ গাত্রোত্থান করতো। সঙ্গে সঙ্গে গুরকা মুখে চোখে একটা পরম গাম্ভীর্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে পাশের ঘরে সরে যেতো তারপর সেই বিরাট কেট্‌লীটাকে টেনে নামিয়ে টানতে টানতে হলঘরের মেঝের উপরে এনে অহেতুক গড়িয়ে গড়িয়ে শব্দ করতে শুরু করে দিতো; সাধারণতঃ এই আমুদে ছেলেটা গোলমাল, হৈ চৈ আর উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করে আনন্দ পেতো প্রচুর। উঠে এসে কিতোভা বুড়ী প্রথমেই বাচ্চাদের বিছানা থেকে ভিজা কাঁথাকম্বল তুলে ফেলতো।

চাঁচা, চাঁচা, ক্ষুদে শয়তানের দল! যতো খুসী চাঁচা, ব্যাঙের বাচ্চারা!

যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতো ততক্ষণ আর কিতোভা বুড়ী কথায় কথায় ঈশ্বরের দোহাই পাড়তো না; কারণ নিজেকে সে মনে করতো শহীদ গোছের একটা কেউ।

বাচ্চাগুলোর চীৎকার, গুরকার সৃষ্ট বিচিত্র শব্দ, কিতোভা বুড়ীর গালাগালি—সব মিলে এমন একটা সোড়গোল সৃষ্টি হতো যে পাড়াপড়সীর ঘুম ভেঙে যেতো, তারা বুঝতে পারতো, এতক্ষণে বেলা ছ'টা বেজেছে।

ঘণ্টা দুই ধরে এমনি সমানে চলতো গোলমাল, হৈঃ চৈঃ, চীৎকার—যতক্ষণ না কিতাভা ছেলেগুলোকে ধুইয়ে মুছিয়ে পরিস্কার করে খাইয়ে দিতো। তারপর সে বসতো চায়ের বাটি নিয়ে। ইতিমধ্যেই গুরকা তার চা খাওয়া শেষ করে ঝুলিটা টেনে নিয়ে টুপীর মতোন করে মাথায় পরে ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়তো।

চা খাওয়া শেষ করে বৃদ্ধা বাচ্চাগুলোকে তুলে এনে উঠানে বালুভর্তি বাক্সের উপরে শুইয়ে দিতো। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে—অর্থাৎ দুপুরের

খাওয়ার আগ পর্যন্ত ওরা রোদ আর তপ্ত বালুতে ভাজা ভাজা হতো। এই সময়ের ভিতরে কিত্যেভা ওদের কাঁথাকম্বলগুলো ধুয়ে শুকাতে দিতো, সেলাই করতো, তালি দিতো, খাওয়াতো আর সারাক্ষণ ধরে পাড়তো গাল; এমনি করে খেটে খেটে বুড়ী নাকি খান্ খান্ হয়ে যেতো।

কখনও কখনও কিত্যেভা বুড়ীর ঘরে তার দু'তিনটি বান্ধবী এসে জুটতো—বিভিন্ন আকৃতির দু'তিনটি স্ত্রীলোক; ওদের পেশা অবশ্য দুটো: একনম্বর, তোমাকে জেলের ভিতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম করে দেয়া, আর দু'নম্বর, আজ হোক কিম্বা কাল হোক তোমাকে হাসপাতালের আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়ার ব্যবস্থা করা।

ওদের সঙ্গে আসতো দু'তিনটা বোতল। অনতিবিলম্বেই রাস্তার হাওয়া আর প্রতিবেশীদের কর্ণকুহর 'ঠক জোচ্চোর'দের উদ্দেশ্যে চোখা চোখা মন্তব্যে আর তাদের গুণাগুণে মুখর হয়ে উঠতো। কিছুক্ষণের ভিতরেই শোনা যেতো পরস্পরের প্রতি বর্ষিত বিশেষ বিশেষ ভাষার প্রয়োগ; তার পরেই শুরু হতো আর্তনাদ: বাঁচাও! বাঁচাও! মরে গেলুম! রক্ষা করো! রক্ষা করো...

শেষ পর্যন্ত দুটোর একটা ব্যাপার ঘটতো: হয় কিত্যেভার বান্ধবীরা তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে চুল ধরে ছেঁচ্ড়ে টানতো, নয়তো কিত্যেভা আর তার একজন বান্ধবী মিলে তৃতীয়াকে দিতো বেদম প্রহার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল গিয়ে দাঁড়াতো একই—প্রথমে গভীর নিদ্রা তার পরে আবার গলাগলি, পুনর্মিলন।

এমনি দিনে ছেলেগুলো একা একা পড়ে থাকতো আর ফুসফুসের সবটুকু শক্তি এক করে গলা ফাটিয়ে করতো চীৎকার। যদি না কেউ সেই সময়ে এসে ওদের উদ্ধার করতো তবে হয় ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, নয়তো চীৎকার করতে করতেই মরে পড়ে থাকতো। পানোন্মত্ত বান্ধবীরা যখন ঝগড়া লড়াই মারপিট করে শ্রান্ত হয়ে উঠানের অন্ধকার কোণে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ে থাকতো, ঠিক সেই সময়ে পার্শ্ববর্তী একটি কুটীরের দোর খুলে একটি স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসতো বেরিয়ে। স্ত্রীলোকটির মুখময় বসন্তের কুৎসিত দাগ, স্তন দু'টি বিরাট—দুটো লাউয়ের মতন।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথমে সে হা-করে দু'হাতে খোলা মুখটা

ঢাকা দিয়ে ভাবলেশহীন দু'টি চোখের শূন্য দৃষ্টি মেলে ঊর্ধ্বে আকাশের পানে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো; তারপর ধীরে ধীরে বালুর বাক্স-গুলোর কাছে এগিয়ে এসে একটা বাক্স থেকে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঐ বাক্সটার উপরেই জাঁকিয়ে বসে ব্লাউজের বোতাম খুলে বাচ্চাটার মাথাটা বুকের ভিতরে টেনে নিতো। সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধার্ত শিশুর মুখ থেকে জেগে উঠতো চুক্‌চুক শব্দ। কিন্তু স্ত্রীলোকটির মুখাবয়বে কোনরূপ দয়া-মায়া, স্নেহ, কিম্বা করুণার অভিব্যক্তির চিহ্নমাত্রও ফুটে উঠতো না; বসন্তের কুৎসিত দাগে ভরা ভাবলেশহীন একখানি নির্বোধ মুখ।

একটি একটি করে তিনটি শিশুকে মাই দিয়ে অবশেষে সে ঘরের ভিতরে ঢুকে যেখানে 'ঝাল মুলো' নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতো; তারপর তাকে কোলে তুলে নিয়ে জানালার কাছে সরে আসতো। বার দুই এদিক ওদিক করে মাথানেড়ে শিশুটি আলোর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতো; ওকে কোলে করে বাইরে বেরিয়ে এসে পুনরায় বালুর বাক্সের উপরে বসে শিশুটির মুখে মাই গুঁজে দিতো। ধীরে ধীরে শিশুটি মাই খেতো আর স্ত্রীলোকটি ওর মাথায় মুখে গালে হাত বুলিয়ে দিতো। মাই খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পর ওকে একটা বালুর বাক্সের ভিতরে শুইয়ে দিয়ে কেবলমাত্র মাথাটা বাইরে রেখে ওর লিকলিকে হাড়সর্বস্ব ক্ষুদ্র দেহটি বালু দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দিতো, 'ঝাল মুলো'র আরাম হতো খুব; ওর দুটি চোখের সেই স্থির গম্ভীর দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়ে চোখ দু'টি খুসীতে চক্‌চক্‌ করে উঠতো। স্ত্রীলোকটির ভাবলেশহীন মুখখানিও উদ্‌ভাসিত করে ফুটে উঠতো মৃদু হাসির আভা; কিন্তু সে হাসিতে ওর মুখখানাকে আরও যেন কুৎসিত আরও যেন বিকৃত করে তুলতো। বহুক্ষণ ধরে শিশুটিকে নিয়ে হৈঃ চৈঃ করার পর যখন দেখতো রোদ আর তপ্ত বালুর তাপে ওর খুবই কষ্ট হচ্ছে তখন পুনরায় ওকে কোলে তুলে নিয়ে নীরবে দোল দিতে থাকতো। শিশুটি আরামে ঘুমিয়ে পড়তো; ওর ঘুমন্ত মুখের উপরে ফুটে উঠতো এক সুগভীর তৃপ্তির প্রশান্ত হাসি। তারপর ওর মুখে একটি চুমু খেয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট কোণটিতে শুইয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে আসতো। চলে যেতে যেতে আর একবার সে ঐ বালুর বাক্সে শায়িত

শিশুগুলোর দিকে তাকাতো। কোন কোন দিন ছেলেগুলো যদি না ঘুমিয়ে পড়তো তবে কিছুক্ষণ বসে ওদের খেলা দিতো তারপর আর একবার করে মাই দিয়ে উঠান পেরিয়ে নিজের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটির ভিতরে গিয়ে ঢুকে আধখোলা জানালার পথে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকতো। কোন কোন দিন যদি সন্ধ্যার পরেও কিত্যেভা বুড়ীর ঘুম না ভাঙতো তবে আবার ফিরে এসে ছেলেগুলোকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে যেতো।

কেউ অবশ্য যেন মনে না করেন, আমি কোনও পরীর গল্প ফেঁদে বসেছি। আদৌ তা নয়। স্ত্রীলোকটি, নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ে,—মুখময় বসন্তের দাগ, আর লাউয়ের মতন বিরাট দুটি স্তন। মূক... ও ছিলো এক মাতাল কামারের স্ত্রী। একদিন ওর স্বামী মাতাল হয়ে এসে এমন নিষ্ঠুরভাবে ওর মাথার উপরে আঘাত করলো যে দুপাটি দাঁতের ফাঁকে পড়ে ওর আধখানা জিভ কেটে দু'খণ্ড হয়ে গেলো। প্রথম প্রথম কামারের মনে খুবই অনুশোচনা হতো; কিন্তু কিছুদিনের ভিতরেই তার সে ভাব কেটে গেলো; তারপর থেকে সে ওকে 'বোবা রাক্ষুসী' বলে সম্ভাষণ করতে শুরু করে দিলো। এই হলো স্ত্রীলোকটির ইতিহাস।

গোটা গ্রীষ্মকাল এমনিভাবে কিত্যেভা আর তার পরিজনের দিন কাটতো; কিন্তু শীতের দিনে ব্যবস্থাটা হতো একটু অন্য ধরণের। উঠানের পরিবর্তে বালুর বাক্সগুলোর স্থান হতো উনুনের পাশে। কিত্যেভার ধারণা, শিশুদের শারীরিক উৎকর্ষের দিক থেকে বালু হচ্ছে একটা পরম উপকারী উপাদান।

লালন পালনের দিক থেকে কিত্যেভা বুড়ীর আশ্রয়ের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে পলের আদৌ কোন প্রভেদ ছিলো না। ব্যতিক্রমের মধ্যে কেবল মাত্র এই ছিলো যে, প্রায়ই দেখা যেতো বিরাট কালো-দাড়িওয়ালা একটি লোক পলের বাক্সটির উপরে ঝুঁকে পড়ে গভীর কালো দুটি চোখের একাগ্র দৃষ্টি মেলে ওর মুখের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম প্রথম পল ওর চাউনীতে ভয় পেতো; কিন্তু ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। এমনকি মাঝে মাঝে সে তার দুটি ছোট্ট ছোট্ট হাত লোকটির বিরাট দাড়ির গোছার ভিতরে ডুবিয়ে দিয়ে পরমানন্দে টানাটানি শুরু করে

দিতো। লোকটির দাড়িগোঁফের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়া চক্‌চকে দাঁতগুলোর ফাঁক দিয়ে যে অস্পষ্ট একঘেয়ে শব্দ বেরিয়ে আসতো তাতে পর্যন্ত পল আর ভীত হয়ে উঠতো না। কখনও কখনও দুটি বলিষ্ঠ হাতে সে পলের ক্ষুদ্র দেহটি তুলে এনে শূন্যে লোফালুফি করতো; যতক্ষণ লোফালুফি করতো, ভয়ে পল চোখমুখ কুঁচকে চুপ করে থাকতো; কিন্তু থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পরম উল্লাসে চীৎকার করে উঠতো।

একদিন সেই বিরাটকায় কালো মানুষটি হেকে উঠলো:

কৈ গো বুড়ী! শুনতে পাচ্ছনা নাকি?

এই যে, আমি এখানে, যাচ্ছি এক্ষুনি! বিরক্তিভরা তিক্ত কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বুড়ী কিত্যেভা বেরিয়ে এলো:

না না, খোকন, কিচ্ছু না! ওঃ...ওঃ...ওঃ! আঃ...আঃ...

ওরা অতো কাঁদে কেন? গম্ভীর কণ্ঠের বজ্রগর্জনে উঠান কেঁপে উঠলো।

কাঁদে গো কাঁদে। সবগুলোই অমনি করে দিনরাত চীৎকার করে কাঁদে —যতোগুলো আছে সব! —প্রত্যুত্তরে কৃত্রিম কম্পিত কণ্ঠে বেজে উঠলো ব্যঙের সুর।

ছেলেগুলোকে আদৌ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখোনা—সবগুলো কেমন নোংড়া ভূত হয়ে আছে—নিদারুণ উৎকণ্ঠায় গম্ভীর কর্কশকণ্ঠ খাদে নেমে এলো, আর কৃত্রিম কাঁপা কণ্ঠে নেমে এলো উদ্‌গত কাশির বেগ।

এদের জন্যে কি আর একটু ভালো ব্যবস্থা হতে পারে না? —গম্ভীর কণ্ঠ পুনরায় রুক্ষ হয়ে উঠলো।

তা পারে বৈ কি, নিশ্চয়ই পারে। খু-উব ভালো ব্যবস্থা হতে পারে —ঢের ঢের ভালো ব্যবস্থা!—বিদ্রূপ ভরা তীক্ষ্ন সুরে কৃত্রিম কণ্ঠ খন্‌ খন্‌ করে বেজে উঠলো।

তবে সে ব্যবস্থা করছো না কেন?—রুক্ষ কণ্ঠ খেঁকিয়ে উঠলো।

তা, বাছা কথাটা হচ্ছে এই, বুঝলে কিনা, আমি বুড়ো মানুষ, সহায় সম্বল হীন, গরীব অনাথা—এই যা একটু অসুবিধা!—কম্পিত কণ্ঠ কৃত্রিম আনুগত্যে মিইয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

আচ্ছা চল্‌লাম আমি এখন। কিন্তু সাবধান!—সুর সপ্তমে চড়লো।

তা আমি ওদেরকে খুব সাবধানেই রাখি গো, খুব সাবধানেই রাখি—কম্পিত কণ্ঠ নরম হয়ে এলো।

পরক্ষণেই ভারী বুটের আওয়াজ জেগে উঠে ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেলো।

তিন

চার বছর পর পল এলো আরিফি গিবলির ঘরে। ওর পা' দুটো খাটো, মাথাটা বড়ো, আর বসন্তের দাগে ভরা মুখ খানির উপরে গভীর কালো দু'টো চোখ।

পলও স্বল্প ভাষী—বেশী কথাবার্তা বলতো না; সব সময়েই চুপচাপ বসে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে দূরের পানে তাকিয়ে কি যেন দেখতো—একমাত্র ও নিজে ছাড়া সে বস্তু আর কারুর চোখেই ধরা দিতো না। সুতরাং পলের আগমণে পুলিস প্রহরীটির নীরবতা এতোটুকুও ব্যাহত হলো না।

এই চার বছরের ভিতরে আরিফি গিবলির চুল দাড়ি শাদা হয়ে গেছে; সে যেন আরও বেশী গম্ভীর আরও বেশী মৌন হয়ে উঠেছে; মহাপুরুষদের জীবনী সম্বলিত ধর্মগ্রন্থের প্রতি ওর আকর্ষণ আরও যেন প্রবল হয়ে উঠেছে।

পলের নিরালা দিনগুলি সুখে সচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ভোরের প্রথম আলোর ছোঁয়ায় জেগে উঠে ঘুম ভাঙানো পাখিগুলো যখন কলকণ্ঠে নূতন প্রভাতকে জানাতো অভিনন্দন, পলেরও ঘুম যেতো ভেঙে; উনুনের পিছনে তার ছোট্ট বিছানাটির ভিতরে শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ ধরে পল দেখতো কেমন করে খাঁচার দাঁড়ের উপরে পাখিগুলো লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে, জল ছিটোচ্ছে, দানা ঠোকরাচ্ছে আর প্রত্যেকটি তার নিজের নিজের সুরে গাইছে গান। পরম উৎসাহে পাখিগুলো উচ্চ কণ্ঠে গাইতো গান—কিন্তু সে গান আদৌ শ্রুতিমধুর হতো না। সবুজ পাখিগুলোর ঘেন্ ঘেনে সুর, সোনালি পাখিগুলোর একই সুরে অনবরত শিস্ দিয়ে চলা,

কাকাতুয়াটার বিচিত্র তীক্ষ্ন কণ্ঠ—সব মিলে এক অদ্ভুত ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়ে ছোট্ট ঘরখানিকে মুখর করে তুলতো।

আর ছিলো একটা খোঁড়া ময়না। জানালায় ঝোলানো একটা বড়ো খাঁচার ভিতরে ময়নাটা থাকতো একা; এক পায়ে দাঁড়টা চেপে ধরে ময়নাটা এদিক ওদিক দুলতো আর মাথা নাড়তো তারপর এক সময়ে হঠাৎ উঠতো শিস্ দিয়ে। ওর শিস্য়ের আকস্মিক তীক্ষ্নতায় হকচকিয়ে গিয়ে সংগীতরত পাখিগুলোর ঐক্যতান যেতো বন্ধ হয়ে, আর ওরা চারিদিক তাকিয়ে দেখতো, কোথা থেকে আসছে অমন অদ্ভুত সুর। পরক্ষণেই ময়নাটার প্রতিবেশী কাকাতুয়া রেগে টং হয়ে ফুলে উঠতো—বুকের লাল্‌চে পালকে ওকে দেখাতো যেন একটি ক্ষুদে সেনাপতি। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে কাকাতুয়াটা ময়নার দিকে মুখ বাড়িয়ে এমন-ভাবে গজ গজ, ফোঁস ফোঁস করে উঠতো আর ঠোঁট খুলে জিভ বের করে ভেংচি কাটতো যে সেটা আদৌ পাখিসুলভ নয়। কিন্তু কাকাতুয়াটার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে ময়নাটা দাঁড়ের উপরে বসে দুলে দুলে পরম দার্শনিকভাবে মাথা নাড়তো। ওকে কেবল মাত্র তখনই একটু চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা যেতো যখন কোন আরশুলা এসে ঢুকতো ওর খাঁচায়; অবশ্য সে চাঞ্চল্যও ক্ষণিকের। ময়নাটার চালচলন সব কিছু ঘিরে, বিশেষ করে ওর শিস দেয়ার ঐ অদ্ভুত ভংগীটির ভিতরে কেমন যেন একটা গভীর থম্‌থমে ভাব, একটা সংশয় ফুটে উঠতো যে, যেমন করে প্রবীন জ্ঞানী লোকের সারগর্ভ কথায় তরলমতি তরুণদের উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় তেমনি ওর প্রভাবে অন্যান্য পাখিগুলোর চঞ্চলতাও স্তিমিত হয়ে আসতো। কখনও কখনও ময়নাটা হঠাৎ ডানা মেলে খাঁচার ভিতরে লাফালাফি শুরু করে দিতো তারপর ঠোঁট দুটো মেলে এমন ভাব করে উঠতো যেন এক্ষুনি আবার শিস দিয়ে উঠবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিস না দিয়ে পুনরায় সেই দার্শনিক গাম্ভীর্যে নীরব হয়ে যেতো। ভাবখানা যেন এই যে, এখনও শিস দেয়ার উপযুক্ত সময় আসেনি; অথবা যেন স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেছে যে, ও যাই কিছু করুক না কেন তাতে করে জাগতিক পরিবেশের হবে না এতটুকু পরিবর্তন।

অন্যান্য পাখিগুলোর চাইতে পল ময়নাটাকেই পছন্দ করতো বেশী। কারণ ওর ভিতরে যেন সে তার আরিফি কাকার সাদৃশ্য খুঁজে পেতো। ওর আরিফি কাকাও ময়নাটাকেই বেশী ভালোবাসতো। তাই ময়নার খাঁচাটাকেই সে আগে করতো পরিষ্কার, বদলে দিতো দানাপানি।

ভোরবেলা আরিফি আসার আগ পর্যন্ত পল বিছানায়ই শুয়ে থাকতো। ওর কেমন যেন মনে হতো, বাড়ীটার উপরে আরিফি কাকার তেমন কোনও আকর্ষণ নেই। দিনে রাতে বেশীর ভাগ সময়ই সে কাটাতো বাইরে বাইরে। অতি সন্তর্পণে দোর খুলে মাথাটা দোরের পথে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আরিফি ডাকতো!

উঠেছ?

হাঁ, উঠেছি।—পল জবাব দিতো।

আরিফি তখন ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়ে কেট্‌লীটা উনুনের উপরে বসিয়ে দিতো। কেটলীটা পুরানো, স্থানে স্থানে টিনের রাং ঝালাই করা। হাতলের একদিকে তার দিয়ে একটা ঘোড়ার পায়ের নাল বাঁধা। উনুনে কেট্‌লীটা চাপিয়ে দিয়ে যতক্ষণ না জল ফুটে উঠতো, আরিফি পাখির খাঁচাগুলোকে মুক্ত করতো, ঘর ঝাঁট দিতো তারপর গলার সুর কোমল করতে গিয়ে অদ্ভুত গম্ভীর কণ্ঠে বলতো:

উঠে হাত মুখ ধুয়ে প্রার্থনা করে নাও!

পল উঠে হাতমুখ ধুয়ে প্রার্থনা করতো। এমন ধীর শান্ত গম্ভীর মুখে পল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতো, যেন মনে হতো সে একটি পূর্ণবয়স্ক লোক, কাজগুলোর অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আরিফির শিক্ষামত পল উঠে হাতমুখ ধুয়ে মাথা আঁচড়ে একটা কৃত্রিম করুণ কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করতো তারপর টেবিলে এসে কেট্‌লীটার সামনে বসতো, ইতিমধ্যেই ওর চেহারার বন্য আকর্ষণ অনেকখানি কমেছে; শক্ত খাড়া খাড়া চুলগুলি কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতো। তারপর দুজনে নীরবে বসে করতো চা পান। এমনি নীরবেই ওরা দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে দিতো।

চায়ের পর্ব শেষ করে আরিফি রান্না করতো। রান্নার আয়োজন সামান্য, শীতকাল হলে উনুনে আঁচ দিয়ে একটা হাঁড়ীর ভিতরে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে তাতে কিছু তরীতরকারী আর এক টুকরা মাংস ফেলে দিতো, তারপর খালি হাতেই হাঁড়ীটা ধরে উনুনের উপরে বসিয়ে দিতো; গরমের কাল হলে ঘরের পিছনের উঠানে আগুন জেবলে তাতে আলু পুড়িয়ে নিতো। পাছে রান্নার ব্যাপারে স্ত্রীজাতির অনুসরণ করে বসে তাই তার রান্নার পদ্ধতি ছিলো এমনি সাধারণ, আরম্বরহীন। অসুবিধা এবং শারীরিক বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আরিফি সাঁড়াসী, হাতা, খুন্তি প্রভৃতি যে সবগুলোর সাহায্যে মেয়েরা রান্নাবান্না করে থাকে, কখনও সেগুলো ব্যবহার করতো না; অথচ সবকিছুই মজুদ ছিলো ওর ঘরে। ডোরাকাটা পাজামা আর টক্‌টকে লাল সার্টটি পরে গম্ভীর মুখে একটা 'কেউকেটা' গোছের ভাব নিয়ে পল কর্মরত আরিফির আসপাশে ঘুরে বেড়াতো; কিন্তু কখনও মুখ খুলে আরিফিকাকাকে একটি প্রশ্নও করতো না, আরিফি এক অক্ষরের জবাব পলকে আদৌ উৎসাহিত করতো না তার সংগে বেশী বাক্যালাপ করতে। কিছুক্ষণ ঘরের ভিতরে থেকে আরিফির কাজকর্ম দেখাশুনার পর এক সময়ে নিঃশব্দে পল রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো। পিছন থেকে আরিফি ওকে ডেকে বেশী দূর যেতে নিষেধ করে দিতো।

শহরের শেষপ্রান্তে আরিফির কুটীর। জানালার সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ; মাঠের বুক বেয়ে খড়স্রোতা ছোট্ট নদীটি বয়ে গেছে। নদীর পরপারে আবার মাঠ। গ্রীষ্মের দিনে ঐ মাঠের বুক ভরে জেগে উঠতো সবুজের সমারোহ আর শীতের দিনে বরফ ছাওয়া রিক্ত ধূসরতা। আরও দূরে বন—দিগন্তের গায়ে পিঠ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় বনটাকে মনে হতো স্থির কালো, নিস্তব্ধ; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন অস্তগামী সূর্য ঐ বনের আঁড়ালে ডুবে যেতো ওর মাথার উপরে ছড়িয়ে দিয়ে যেতো মুঠো মুঠো নীল লোহিত আর সোনালী আলোর আবীর ধূলো।

দূরে ঐ নদীর পারে উইলো ঝোপের ভিতরে একটা পাথরের উপরে গিয়ে বসতো পল; তারপর শুকনো ডাল ভেঙে ভেঙে স্রোতের মুখে ফেলে দিয়ে দেখতো কেমন করে সেগুলো ভাসতে ভাসতে দূরে, বহুদূরে দৃষ্টির

অন্তরালে মিলিয়ে যায়। যখন আলো হাওয়ার ছন্দ লেগে নদীর বুকে জেগে উঠতো ঢেউয়ের নাচন, মুগ্ধ বিস্ময়ে পল তাকিয়ে থাকতো। কখনও বা প্রবাহমান স্রোতের কুলুকুলু শব্দে পড়তো ঘুমিয়ে।

বাড়ী থাকলে আরিফি গিয়ে ওকে তুলে নিয়ে আসতো তারপর দুজনে মিলে বসতো খেতে। খেয়ে উঠে পল আবার নদীর তীরে ফিরে যেত আর সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই কাটিয়ে দিতো। নদীর তীরে বসে হয় এক একা আপন মনেই করতো খেলা নয়তো খেলতো তুলকার সঙ্গে! তুলকা আট বছর বয়সের একটা ভিখারীর মেয়ে—মেয়েটা যেমন নোংড়া তেমনি দজ্জাল আর চোর। মেয়েটাকে আরিফি দুচক্ষে দেখতে পারতো না; কখনও যদি সে ওর ঘরে আসতো তবে তক্ষুণি হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে এনে বাইরে বের করে দিতো।

সন্ধ্যার দিকে পল ডুবন্ত সূর্যের পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকতো আর দেখতো কেমন করে ঐ সজীব সুন্দর বনরেখা ধীরে ধীরে মৃত্যুর গ্লানিমায় আচ্ছন্ন হয়ে গাঢ় তমিশ্রার কোলে ঢলে পড়ছে।

ঘরে ফিরে এসে পল সটাং বিছানায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়তো। যেদিন আরিফি ঘরে থাকতো, সেদিন ঘুমোতে যাবার আগে পল সান্ধ্য প্রার্থনা করে তবে শুতে যেতো; কিন্তু আরিফি ঘরে না থাকলে ওর কাপড় ছাড়া বা প্রার্থনা কোনটাই হয়ে উঠতো না। এমনি করে পলের একঘেয়ে শান্ত দিনগুলো কেটে চললো; চিরন্তন ধারায় দিনের মালা গেঁথে গেঁথে গড়ে উঠলো সপ্তাহ, মাস, বছর...

পল বড়ো হয়ে উঠলো। ক্রমে দিনগুলোও নানান্ সমস্যার ভিড়ে জটিল হয়ে উঠতে লাগলো। ঐ যে নিরন্তর ধাবমান নদী কোথায় কোন সুদূরে বয়ে চলেছে। ভেবে ওর অন্তরে জেগে উঠতো দারুণ বিস্ময়! কোন রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ বনানীর উপরে? কেনই বা ঐ বড়ো বড়ো মেঘখন্ড গুলি মুক্ত আকাশে ভেসে বেড়ায়, বাধা বন্ধ হীন? পাথরের ঢেলা উপরের দিকে ছুড়ে মারলে কেনই বা নেমে আসে নীচে ধরণীর বুকে? ওর ছোট্ট মনটুকু ভরে নেমে আসতো অজস্র প্রশ্নের ভিড়। অবাক হয়ে যেত পল এই ভেবে যে, ঐ যে শহর, যেখানে উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর ছাদ গায়ে গায়ে মেশামেশি করে

আছে কি হয় ওখানে, —কেনই বা দিনের বেলায় এই কলকোলাহল মুখরিত দুনিয়া রাত্রিবেলা হঠাৎ এমন নীরব নিস্তব্ধতায় ঝিমিয়ে পড়ে! কখনও পল আরিফিকে একটি প্রশ্নও করতো না। হয় তো মনে মনে ভাবতো, যে লোক এতো গম্ভীর এতো স্বল্পভাষী, সে নিশ্চয়ই কিছুই জানে না। আরিফির নীরব গম্ভীর সদা মৌনমুখ বালকটিকে কেমন যেন একটু বিহ্বল, একটু উৎকণ্ঠিত করে তুলতো। কখনও যদি মিখেইলো ওদের বাড়ী বেড়াতে আসতো, ঘরের একটি কোণে চুপচাপ বসে পল প্রাণভরে মিটিয়ে নিতো মানুষের কথা শোনার তৃষ্ণা। মিখেইলো কথা বলতো খুব বেশী আর এসেই প্রথমে শুরু করতো:

কি হে সন্ন্যাসী? বেঁচে বর্তে আছতো? বলি বিয়ে টিয়ে করার কথা ভাবছ কিছু? কিন্তু তবুও যখন একান্ত উপেক্ষা ভরা নীরব ওদাসীন্যে আরিফি চুপ করে বসে থাকতো, মিখেইলো অট্টহাস্যে ঘরখানি কাঁপিয়ে তুলতো। আরিফির নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে মিখেইলো এতটুকুও দমে যেত না। রুমাল বের করে গোঁফ দাড়ি কামানো চাছাছোলা মুখখানা বেশ করে একবার মুছে নিয়ে বেঞ্চের উপর আরাম করে জাঁকিয়ে বসে বহুবার বলা পুরানো কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলতো।

আজকের বুঝেছ ভায়া, খেলাম চমৎকার! মেরিয়া রেঁধে ছিলো জার্মানি গমের পায়েস; কি চমৎকার পায়েস!...দুধ আর কিসমিস দিয়ে...কি বলো, চমৎকার না? খুব সুন্দর! আর ভায়া রান্নার ব্যাপারে মেরিয়ার হাত দুটো যেন সোনা! আর কেবল রান্নার ব্যাপারেই বা বলি কেন, সব কাজেই—সেলাই ফোড়াই সব—সবকাজ জানে। আমার বৌটি যা হয়েছে, একটি রত্ন, বুঝলে! তুমিও যদি এমনি খাসা একটি মেয়ে মানুষ পেতে আরিফি, তা হলে বুঝতে, হুঁ! এমন খাসা বৌ আর হয় না!

ওটাতো কুত্তার মতন দিন রাত ঘেউ ঘেউ করে!—প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে কথাটি বলেই আরিফি কেট্‌লীটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলো, তারপর ডিসে গোঁফ ডুবিয়ে চায়ে চুমুক দিলো। অবাক বিস্ময়ে মিখেইলোর চোখ দুটো কপালে উঠলো।

কি বললে, ঘেউ ঘেউ করে? তাতে কি? ধর না হয় করলোই একটু?

জানতো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ও সব একটু আধটু হয়েই থাকে, নইলে সংসার চলে না। এর কোনও উপায় নেই। দু' জনার প্রত্যেকেই মনে করে সে হ'ল গিয়ে কর্তা—কেউ কারুর কাছে মাথা নোয়াতে চায় না। এই ধরো যেমন আমি, আমি কখনও ওর কাছে মাথা নীচু করি? রাম বলো, জীবনেও না! আমি যদি ওকে ডাকলুম, মেরিয়া!— আর ও যদি তক্ষুনি আমার কথা না শুনলো তবে...বুঝলে ভায়া, তক্ষুনি মুখের উপর একটি ঘুসী!

তার বদলে তখন সে দেয় তোমাকে দুটো। —আরিফি গিবলি কঠিন সুরে জবাব দিলো।

কি বল্‌লে, দুটো? বেশ, না হয় তাই দিলো!... সে যদি দুটো ঘুসিই দেয় তাতে এসে গেলো কি? সে আমার স্ত্রী না? নিশ্চয়ই তার অধিকার আছে আমাকে দু ঘা দেবার। কিন্তু তবু আমি হার মানি কখনও? তাকে ধরে তখনি এমন আচ্ছা করে ঠুকে দেই যে...

আর সেও তখন খুন্তি নিয়ে তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে; সেই যে সেবারের মতন—আচ্ছা করে তোমাকে শায়েস্তা করে দেয়...

—আরিফি ওর কোন কথায় আমোল আনে না। খু-ন-তি!... তুমি কি মনে করো রোজ রোজই সে আমাকে খুন্তি দিয়ে পেটে? অবশ্য পিটে ছিলো একদিন; ব্যস্‌। খুন্তি দিয়ে পিটবে! কেন তুমি আবার পুরানো কথা তুলছ?

মিখেইলো চুপ করে গেলো। নীরবে দু'বন্ধু চায়ের পাত্র নিঃশেষ করে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

যাক্‌গে ও সব, তোমার পাখিগুলোর খবর কি? বেঁচে আছে তো?

চোখ তো রয়েছে, দেখনা নিজেই।

তাইতো, বেশ পাখিগুলো—চমৎকার! আমিও কয়েকটা পাখি পুষবো মনে করছি।

হাঁ, তোমার বৌ তাহলে সেগুলোকে ভেজে খেয়ে ফেলতে পারবে—বিদ্রুপের সুরে আরিফি বল্‌লো।

কক্ষনো না! নিজেই সে খুব পাখি ভালোবাসে। এই তো সেদিন একটা রাজহাঁস কিনলো। আর কিনেছে কেমন করে তা জানো—মিখেইলো পুনরায়

উৎসাহিত হয়ে উঠলো—চালাক! ভীষণ চালাক মেয়ে মানুষ! সে দিন একটা মাতাল চাষীকে দেখতে পেয়ে তক্ষুণি তাকে ডাকালো। বল্‌লো—এই ব্যাটা, তুই মদ খেয়েছিস? জানিস আমি পুলিশের বৌ? এক্ষুণি ওঁকে ডাকছি, তোকে ধরে থানায় নিয়ে যাবে, কিরে ব্যাটা তাই চাস্‌ নাকি?—চাষীটা দারুণ ভয় পেয়ে গেলো, তারপর কেবলমাত্র ত্রিশটি পয়সায় সে তার রাজহাঁসটা ওকে বেচে দিয়ে গেলো। কি চমৎকার হাঁস! এই ইয়া মোটা, তাজা, আর কি তার চলার ভংগী! ঠিক যেন আমাদের সার্জেণ্টের মতন! বুঝলে ভায়া, বৌটি আমার একটি খাঁটি রত্ন। এমন একটি বৌ যদি তুমি পাও তবে সেটা তোমার পরম ভাগ্য বলে মানবো। তখন দেখো তোমাকে কেমন হাতের মুঠোটির ভিতর পুরে রেখে দেবে। মুখ খুলে আর ট্যাঁ-ফোঁটি করার জো থাকবে না!

তাতে কি এমন সুবিধা হবে? আরিফি প্রশ্ন করলো।

কি সুবিধা? একটি মেয়ে মানুষ! ঘরে যদি তোমার একটি বৌ থাকে তবে ঘরের চেহারাই বদলে যায়! এই একটা কথাই ধরো না, ঘরে বৌ থাকলে কেমন ছেলেপুলেতে ঘর ভরে যায়; ঘর দোর কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে; তারপর...

তারপর শুরু হতো স্ত্রী জাতির পরমাশ্চর্য সব গুণাবলীর অজস্র সুখ্যাতি। মিখেইলোর বর্ণনায় মেয়েদের দোষ ত্রুটিগুলোও অপূর্ব গুণাবলী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়ে উঠতো। নারী জাতিব প্রতি দুর্বলতা ওর অপরিসীম; এমন কি ভোজন সম্পর্কে ওর নিদারুণ দুর্বলতার চাইতেও ওটা অনেক প্রবল। নারী হচ্ছে ওর জীবনের সর্বস্ব—সিমেণ্টের মতন ওর দেহ মনের প্রত্যেকটি অংশ গেঁথে গেঁথে ওকে সুসম্পূর্ণ, পূর্ণাংগ করে তুলেছে। নারী ওর কাছে শক্তি—জগতের সব কিছু রূপ রস গন্ধের একমাত্র আকার। অনর্গল ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরম উৎসাহে সে মেয়েদের কথা আলোচনা করে যেতে পারে।

ওর কথার তোড়ে আরিফি ক্রমেই দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠলো; তার মাথাটা ক্রমেই নীচের দিকে ঝুলে পড়তে লাগলো;—যেন সে তার বন্ধুর বক্তৃতার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় টেবিলের নীচে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অবশেষে আরিফির ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো; মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে গর্জন

করে বলে উঠলো:

ঢের হয়েছে, থামো, এবার রেহাই দাও দেখি! তুমি দেখছি লোকের নাড়ী-পিত্ত সব টেনে বের করতে পারো!

ওর তিক্ত কণ্ঠের গর্জনে বক্তার কথার স্রোতে কিছুটা ভাঁটা পড়লেও একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো না।

ওহে, না! না!—একটু হকচকিয়ে গিয়ে মিখেইলো একবার ঘরের চতুর্দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকালো তারপর পুনরায় সেই পুরানো গানই গাইতে শুরু করলো:

এই দেখোনা, তোমার উনুন—কলি ফিরানো দরকার। নিজেই একবার দেখো দেখি কি অবস্থা হয়ে আছে! ছিঃ ছিঃ! কিন্তু ধরো ঘরে যদি তোমার বৌ থাকতো...

নিদারুণ অস্বস্তিতে আরিফি কেশে হাত পা নেড়ে তার বিরক্তি প্রকাশ করার প্রয়াস পেলো।

রাগ করো না ভাই, দুদিন সবুর করো; এখনো তো তোমার সময় বয়ে যায় নি! তোমার মতন একটা লোক এমন করে মিথ্যা নষ্ট হয়ে যাবে, তা কি কখনও সম্ভব!

মিথ্! চুপ্! আর একটি কথাও না!—টেবিলের উপর আরিফি সজোরে একটা ঘুসি মেরে উঠলো।

বেশ! তবে আর বলবো না। যাও গে তুমি জাহান্নামে!

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

ত'হলে এখন আসি ভাই, বাড়ী যাচ্ছি। এক্ষুণি আমার পাহারায় বেরুতে হবে। মেরিয়া নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছে। আঃ! কি খাওয়াটাই না আজ হবে! মাংসের কিমা ভরা শুয়োরের নাড়ীর কোপ্তা, গমের খাসা রুটি, চর্বি...সব মাংসের ঝোলে ভিজানো। একটি কামড় দাও মুখে যেন লেগে থাকবে! কি চমৎকার! আর তুমি কি খাও? যতো সব বাজে জিনিষ, অখাদ্য, ওকে কি আর খাওয়া বলে? কিন্তু ঘরে যদি তোমার...থাক্ থাক্ আর বলবো না; এই চুপ করলুম...এক্ষুণি চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি...বাবা নমস্কার! দূর হয়ে যাচ্ছি! এসো একদিন আমার বাড়ীতে। আরে পল

কোথায় গেলো? এই পল! কোথায় ক্ষুদে শয়তান? বোধ হয় ঘরে নেই। কেমন আছে সে? ভালো তো? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরেই বেড়ায় বোধ হয়? এই তো, ধরো, পলের জীবনটাই বা কাটছে কি ধরণে? কিন্তু যদি তোমার ঘরে স্ত্রী থাকতো...

অবশেষে মিখেইলো চলে গেলো। আরিফি কিছুক্ষণ আপন মনেই গজর গজর করলো। ও চলে যাওয়ার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত তার অস্বস্তির ভাব কাটতো না—কেমন যেন একটা তিক্ত অশান্তিকর আবহাওয়ায় ঘরের সমস্ত পরিবেশ ভারী হয়ে উঠতো।

মিখেইলো সব সময় একই ধরণের কথা বলতো। শুনে শুনে পলের এমন হয়ে গেলো যে, সে কথা বলতে শুরু করবার সংগে সংগেই পল বুঝে ফেলতো, শেষটা কি হবে। পল মিখেইলোকে তেমন পছন্দ করতো না। ওর গোঁফ দাড়ি কামানো তেল তেলে মুখ, রূপোর বোতামের মতন ম্যাট ম্যাটে ভাটার মতন দুটো চোখ, আত্ম-সন্তুষ্টি ভরা কণ্ঠ, সুউচ্চ অট্টহাসি, বেঁটে বেঁটে হাত পা, মোটা দেহের উপরে শক্ত ঘন চুলে ভর্তি বর্তুলাকার মাথা—সব কিছুই পল অপছন্দ করতো। মিখেইলোকে দেখে দেখে আর ওর প্রতি আরিফির মনোভাব বুঝতে পেরে পলও এই ভোজনবিলাসী লোকটাকে ঘৃণা করতে শুরু করলো। পারতপক্ষে সেও ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতো পলের মনে হতো, লম্বা দাড়ি, বিরাট শরীর আর ভয়ংকর গাম্ভীর্য থাকা সত্ত্বেও ওর আরিফি কাকা মিখেইলোর তুলনায় ঢের বেশী সুপুরুষ।

পল অবশ্য ওদের আলোচনা থেকে কোনও কিছু সিধান্তে পোঁছাতে পারতো না তবুও মনে মনে সে তার আরিফি কাকাকেই করতো সমর্থন। গল্পরাজ মিখেইলোর কথা আদৌ সে বিশ্বাস করতো না। ক্রমে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে পলের মনেও আরিফির ভাবধারা বদ্ধমূল হয়ে উঠলো। এমন কি একদিন সে তা তুলকার উপর দিয়ে প্রয়োগ করবার চেষ্টাও করে ছিলো। প্রথমটায় তুলকা খানিকটা অবাক হয়ে গেলো, তারপর ভীষণ রেগে গেলো; অবশেষে গালের উপরে নখের রক্তাক্ত আঁচড় আর মেয়েদের সম্পর্কে খানিকটা গোপন সমীহের ভাব নিয়ে পল বাড়ী ফিরে এলো।

গম্ভীর কণ্ঠে আরিফি প্রশ্ন করলো:

এ কী?

পড়ে গিয়েছিলাম একটা তক্তার উপর...জবাব দিতে গিয়ে পল লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

তাই তো...নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে উঠে আরিফি ওকে মুখ ধুয়ে আসতে পাঠিয়ে দিলো।

দিন কেটে যায়। পল আরও বড়ো হয়ে উঠলো।

ওর বয়স এখন ন' বছর। বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা, মুখ ময় বসন্তের দাগ ; গম্ভীর মৌনচারী। কিন্তু ওর দুটি চোখের দৃষ্টি মোটেই শিশুসুলভ নয়...স্থির অচঞ্চল, বুদ্ধিদীপ্ত। পল ও আরিফি পরস্পর পরস্পরকে চিনেছে গভীরভাবে; এমন কি নীরব ভাষায়ও ওদের কথোপ-কথন মুখর হয়ে উঠতো। আরিফি ওকে লিখতে পড়তে শেখালো। কিন্তু একটা দুঃখজনক পরিণতির ভিতর দিয়ে পলের গির্জার স্কুলের পাঠ সাংগ হলো। দশ দিনের বেশী সে আর সহপাঠিদের ব্যবহার সহ্য করতে পারলো না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর এগারো দিনের দিন ভোর বেলায় আরিফি এসে ওর ঘুম ভাঙালো: এই ওঠ্...ওঠ্...স্কুলের বেলা হয়েছে।

পল মাথাটা একটু তুলে নিদ্রাহীন দুটো রক্তচোখের তীব্র দৃষ্টি মেলে আরিফির মুখের পানে তাকালো তারপর বলতে শুরু করলো...ওর জন্মের পর থেকে পল এই প্রথম এক সঙ্গে এতোগুলো কথা বললো: আমি আর স্কুলে যাবো না...কক্ষণো যাবো না। কুত্তার চাইতেও বেশী খারাপ ব্যবহার করে ওরা আমার সঙ্গে। আমাকে বলে, বেজম্মা, বলে...কুড়ানো ছেলে তুমি যত খুসী শাস্তি দাও, কিছুতেই আমি স্কুলে যাবো না। বরং দিন-রাত ঘরে বসে থাকবো সেও ভালো তবু আর কখনও ওদের সংস্পর্শে যাবো না। কাউকে আমি দেখতে পারি না—একটা ছেলেকেও না। দেখতে পেলেই মারবো। পরশুদিন মাস্টারের ছেলেটার নাক ভেঙে দিয়েছি; এক ঘণ্টা মাস্টার আমাকে নাড়ুগোপাল বানিয়ে রেখেছিলো। আবারও ওকে মারবো। সবগুলোকে পিটবো ধরে ধরে।

ওরা যখন আমাকে মারে তখন কেউ কিছু বলে না। আমি চুপ করে

থাকি; কাউকে আর হাঁটু ভেঙে নাড়ুগোপাল হতে হয় না! কিছুতেই আমি আর যাবো না ওখানে, তাতে যা কিছুই হোক না কেন!

আরিফি পলের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। ওর বসন্তের দাগে-ভরা মুখখানি রাগে দুঃখে উত্তেজনায় আরও যেন বিচিত্র হয়ে উঠলো। যতক্ষণ পল বলছিলো আরিফি চুপ করে শুনছিল ওর কথা; কিন্তু বলা শেষ করে পুনরায় পল বালিশের ভিতরে মুখ গুঁজে গোঁজ হয়ে শুয়ে পড়তেই সে তার স্বভাব সুলভ স্বল্প ভাষায় বল্‌লো মাত্র দুটি কথা: না, তাহলে আর যেও না। কিন্তু ওর কণ্ঠের সেই অদ্ভুত কঠোর স্বরে জানালার কাঁচগুলো পর্যন্ত যেন ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠলো; পরক্ষণেই সে এমন একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে স্কুলটার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো যে, পলের সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, আস্তে আস্তে পল কম্বলের ভিতরে ঢুকে গিয়ে গুটি-সুটি মেরে চুপ করে পড়ে রইলো।

সে দিনের পর থেকে স্কুল সম্পর্কে কেউ আর কোন দিনও উচ্য-বাচ্য করেনি।

ঘরে বসেই শুরু হলো বিদ্যাচর্চা...কঠিন আয়াস সাধ্য প্রচেষ্টা। পড়া-শুনোর ব্যাপারটা পলের ঠিক তেমন পছন্দ হতো না। একটা অত্যন্ত কঠিন বিরক্তিকর কাজ হিসাবেই সে সকাল সন্ধ্যা বইপুঁথি খুলে বসতো। অবশ্য আরিফির একান্ত ইচ্ছা, যে পল লেখাপড়া শিখুক। কিন্তু কিছুতেই বইয়ের নির্জীব শুকনো অক্ষরগুলির ভিতরে পল প্রাণ সঞ্চার করতে পারতো না।

প্রত্যহ সকালে চা পানের পর চোখমুখ কুঁচকে পল তাকের উপর থেকে বইপত্র পেরে নিয়ে বসতো। হাঁটুর উপরে দুটো কনুইয়ের ভর রেখে দুহাতে মুখখানা ধরে অস্পষ্ট ভাষায় কি যেন পড়তে শুরু করতো। কিন্তু তাতে একটিমাত্র ফলই হতো যে খাঁচার ভিতরে পাখিগুলোর গান বন্ধ হয়ে যেতো। কেমন একটা উৎকণ্ঠাভরা দৃষ্টি মেলে পাখিগুলো পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতো। তারপর কাকাতুয়াটা শিস্‌ দিয়ে উঠে ইঙ্গিত করতেই সবগুলো এক সঙ্গে এমনভাবে কিচিরমিচির চীৎকার জুড়ে দিতো, যেন ওরা পড়াশুনার দিক থেকে ছেলেটির মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার শয়তানী উদ্দেশ্য নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছে। অচিরেই ওদের সাধু প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠতো।

বই থেকে চোখ তুলে পল প্রথমে কাকাতুয়াটাকে লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে শিস্ দিতে শুরু করতো; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অদ্ভুত শব্দ করে শিস্ দিতে দিতে কাকাতুয়াটাকে ক্ষেপিয়ে তুলতো। তারপর দুটো ছুরি নিয়ে একটা আর একটার উপর ঘসে ঘসে এমন কর্কশ শব্দ তুলতো যে পাখিগুলো উদ্‌ব্যস্ত হয়ে উঠতো। অবশেষে যখন ঘরময় একটা অবিশ্বাস্য সোড়গোল জেগে উঠতো, তখন পল বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে উঠে ময়নাটার পিছনে লাগতো।

ব্যাপারটা দাঁড়াতো এই:

পল ময়নাটার খাঁচার ভিতরে একটা সরু কাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে ওর ঠোঁটের উপরে ঠোকা দিতো; ময়নাটা এতে করে বরাবরই বিরক্ত হয়ে উঠতো আর কাঠিটাকে কামড়ে ধরার জন্য একপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে খাঁচাময় করতো ছোটাছুটি। অবশ্য যদি কখনও ধরতে পারতো তবুও সেটা বেশীক্ষণ ওর ঠোঁটের ভিতরে থাকতো না; অবশেষে কাঠিটার প্রতি একটা পরম ঔদাসীন্যের ভাব নিয়ে ময়নাটা চুপ করে বসে থাকতো। কিন্তু যদি আদৌ ধরতে না পারতো তবে ওর চীৎকার ক্রমান্বয়েই উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে উঠতো। এর পর খুসী মনে পল তার বইপত্রের কাছে ফিরে আসতো; কিন্তু বইয়ের দিকে না তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকতো; মনে হতো যেন ওর দৃষ্টি সম্মুখের দেয়াল ভেদ করে চলে গেছে বহু দূরে। ক্রমে মুখখানা গম্ভীর, চিন্তান্বিত হয়ে উঠতো। কিন্তু কি যে ভাবতো নিজেও তার কোনও হদিস পেতো না। এমন কতোগুলো রূপহীন, আকারহীন অশরীরী চিন্তা অনেক সময়ে আমাদের মনে এসে জুড়ে বসে...হয়তো ভাবি ইচ্ছা করলেই ঐ সব বাজে চিন্তা আমরা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি...কিন্তু সেটা তত সহজসাধ্য নয়। ঐ অশরীরী চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভীরুতা ও নির্বুদ্ধিতার জীবাণুও এসে মনোরাজ্যে হানা দেয়।

পাখিগুলোর একঘেয়ে নিরবচ্ছিন্ন কিচিরমিচির শব্দের ভিতরে পল অমনি করে ঘণ্টা দুই চুপচাপ বসে থাকতো, তারপর আরিফি ফিরে এসে ওর পড়া ধরতো। শান্তশিষ্ট হয়ে পল বেঞ্চের উপরে বসে থাকতো, কিছুক্ষণ পরে বইয়ের অক্ষরের নীচে আঙ্গুল দিয়ে পড়তে আরম্ভ করতো:

ইউ সিউ উইথ্ এ সিউ...

একটু দাঁড়াও! থামো...বাধা দিয়ে আরিফি বলে উঠতো...

ওরকম তো হতে পারে না।—বইটা তুলে নিয়ে মনে মনে সে একবার পড়ে নিলো।

ঠিক হয়নি! এসো, আবার পড়ো।

ইউ সিউ উইথ্ এ ছ এন্ড ইউ সিউ উইথ্ এ নিডল।

আচ্ছা হয়েছে এবার এগিয়ে এসো। এখানে বলেছে 'ছ', তাই না?—

বল্ তো 'ছ' দিয়ে আমরা কি করি?

'ছ'—ছাদের দিকে তাকিয়ে পল ভাবতে লাগলো...'ছ' দিয়ে আমরা গাছ কাটি।

তবেই দেখো, তুমি কি পড়ছিলে, 'সিউ', দেখছো না এটা 'এ', 'ই' নয়।

কিন্তু বইতে তো কাঠের কথা কিছু লেখা নেই!

আরিফি ভাবতে লাগলো কি কৌশলে ঐ কাঠের প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে ওকে শেখানো যায়। একটু পিছনের দিকে সরে বসে পল বলতে শুরু করলো:

এ সব কিছুইতো আমি জানি। আমরা সূচ দিয়ে সেলাই করি, কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটি, কলম দিয়ে লিখি...কিন্তু এই অক্ষরগুলো আমি পড়তে পারি না; এগুলো এতো ছোট আর এক একটা এক এক রকমের।

আরিফি নীরবে মনে মনে কি ভাবতে লাগলো; বইয়ের দিকে তাকিয়ে বার বার সে ঐ অতি সহজ বাক্যগুলো পড়তে লাগলো; ক্রমেই ওর মনে শিশুদের শিক্ষাদানের দিক থেকে ওগুলোর কার্যকারীতা সম্পর্কে সন্দেহ জেগে উঠলো। আর একটু পড়ার পরই সে লেখকের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ে গেলো; আরিফির স্থির ধারণা হলো যে লেখক নিজেও নিশ্চয়ই পলের মতনই 'ইউ সিউ উইথ্ এ ছ এন্ড ইউ ছ উইথ্ এ নিড্ল' এই সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলো।

এমনি করে পড়ার সময় অতিবাহিত হয়ে যেতো, আরিফি পলকে পুরানো পড়া অভ্যাস করতে দিতো তারপর উভয়ে বিদ্যাচর্চায় গলদঘর্ম হয়ে গিয়ে খেতে বসতো। খাওয়া-দাওয়ার পর আরিফি একটু গড়িয়ে নিতো; শোয়ার আগে পলকে বলে দিতো যে, যদি কোনকিছু হয় তবে যেন কাকে তুলে

দেয়। পল জামাকাপড় পড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো। রাস্তায় সাড়াক্ষণ মারপিট, দাঙ্গা, এই নিয়েই ওর কাটতো সময়। সমবয়সী ছেলেরা ওর গম্ভীর মনমরা ভাব আদৌ পছন্দ করতো না। পল কখনও কখনও সমবয়সীদের হৈ-হুল্লোড়, খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট হতো, আর মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিতও যে হয়ে উঠতা না তা নয়...কিন্তু কখনও তাদের সঙ্গে যোগ দেবার কোন চেষ্টাই করতো না। বহুবার ওর তরফ থেকে বন্ধুত্ব স্থাপনের বহু চেষ্টাই হয়েছে কিন্তু কোনও না কোন কারণে ওর সে প্রচেষ্টার শেষ পর্যন্ত দারুণ মারপিটের ভিতর দিয়েই হয়েছে সমাপ্তি। খুসীভরা হালকা মন নিয়ে পল কখনও ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলায় যোগ দিতে পারতো না। বয়ঃপ্রাপ্তদের মতন সবকিছুই কেমন যেন একান্তভাবে দেখাটাই ওর স্বভাব; ফলে ওর সমবয়সীদের মনে ওর প্রতি গড়ে উঠেছে একটা অবজ্ঞার ভাব। পল নিজেও সেটা অনুভব করতো...বুঝতো তারা ওকে চায় এরিয়ে চলতে।

একদিন সব ছেলেরা মিলে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে বনের ভিতরে গেলো। শান্ত বনানীর করুণ মর্মর ধ্বনি পলকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতো; কেমন যেন একটা কোমল আবেশে ওর দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠতো। সংগীদের অজ্ঞাতে পল একাকী অন্যদিকে সড়ে পড়লো তারপর আপন মনে বনের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আপনা থেকেই ওর মাথাটা নীচু হয়ে ঝুলে পড়লো যেন সে কি একটা হারানো জিনিষ খুঁজে খুঁজে ফিরছে। ক্রমে অনুচ্চ কণ্ঠে পল গুণ্ গুণ্ করে গান শুরু করলো; পচাপাতার গন্ধ, পায়ের তলায় ঘাসের সর্‌সর্ মৃদু শব্দ আর ঝিঁঝিঁর গান...সব মিলে ওর মন-প্রাণ এক অব্যক্ত আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো...

দূর থেকে হঠাৎ ওর কানে ভেসে এলো সংগীদের কণ্ঠ: আরে কুড়ানো ছেলেটা গেলো কোথায়? একজন বলে উঠলো।

তাকে দিয়ে আবার কি হবে? ভয় নেই ওছেলে হারাবে না...এমন সৌভাগ্য ওর হবে না...প্রত্যুত্তরে আর একজন বললো।

ছোঁড়াটা সব সময়েই যেন পেঁচার মতন ফুলেই আছে...ঠিক আরিফির মতন...কে জানে, হয়তো ঐ সেপাইটাই ওর বাপ!

ছেলেগুলো উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

পলের সমস্ত অবয়ব ঘিরে নেমে এলো নিকষ কালো অন্ধকার; নিজেকে দারুণ অপমানিত বোধ করলো, তারপর ক্ষোভে দুঃখে একান্ত সন্তর্পণে চুপি চুপি সে বন থেকে বেরিয়ে এলো। পরক্ষণেই ওর সেই তীব্র অপমান-বোধ দারুণ ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে উঠলো...প্রতিশোধ নেবার স্পৃহায় অন্তরে অন্তরে পাগল হয়ে উঠলো;

বনের শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎ পল ওর গলার সবটুকু শক্তি দিয়ে কৃত্রিম খুসী ভরা কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো:

ওরে, কোথায় তোরা সব! শিগ্গির ছুটে আয়! দেখে যা আমি কি পেয়েছি।

পলের ডাক শুনে দুটি ছেলে ছুটে বেরিয়ে আসতেই পল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আচ্ছা করে ঠুকে দিলো।

ফিরে আসার সময়ে সারাটা পথ ছেলেগুলো বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পলকে গালাগালি আর টিটকারী দিতে দিতে এলো। পল বলবান—শারীরিক শক্তি ওর ঢের বেশী; বহুবার বহু ঘটনার ভিতর দিয়ে ওদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সামনা-সামনি ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়া বিপজ্জনক।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পল বাড়ী ফিরে এলো। আরিফি ঘরে নেই। মৌন নিস্তব্ধ কুটিরখানি ঘিরে ধীরে ধীরে সায়াহ্নের ম্লান ছায়া এসেছে ঘনিয়ে। কেবলমাত্র সবুজ আর সোনালী পাখিগুলোর কিচিরমিচির শব্দে ঐ শান্ত নীরবতা থেকে থেকে বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলো। পাখিগুলোর দিকে পলের দৃষ্টি পড়লো। বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে খাঁচার ভিতরে পাখিগুলোর লাফা ঝাঁপি দেখলো তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে একটা চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে খাঁচার দোর খুলে দিয়ে খাঁচাটাকে কাত করে ধরলো। খোলা দোরের পথে পাখিগুলো উড়ে গেল। কিন্তু উড়ন্ত পাখিগুলোর পানে পল আর একটি বারের জন্যেও তাকালো না। ক্ষুব্ধ পল টেবিলের কাছে ফিরে এসে দু'হাতের ভিতরে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে রইলো আর মনে মনে কি জানি আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলো।

আরিফি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পল বলে উঠলো:

আমি পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছি...ওর কণ্ঠের সুর রুক্ষ, দুটি চোখের দৃষ্টি বেয়ে কেমন যেন একটা বন্য ঔদ্ধত্য ফুটে উঠলো।

আরিফি চারিদিকে একবার তাকিয়ে যে যেন দেখে নিয়ে পরে বললো: কেন?

অমনি!...ওর মুখচোখে তেমনি উদ্ধত ভংগী, কণ্ঠে উগ্র সুর।

বেশ...সে তোমার খুসী।

তুমি কেন আমাকে বকলে না...পলের কণ্ঠে বেজে উঠলো কান্না ভরা অভিযোগের সুর।

আরিফি অবাক হয়ে গেলো, তারপর স্নেহমাখা দুটি চোখের কোমল দৃষ্টি মেলে পলের পানে তাকালো।

আমি কি তোমাকে কোনদিন বকেছি?...আরিফির বুকের ভিতরটা কেমন যেন এক অজ্ঞাত ব্যথায় টনটন করে উঠলো; অস্থিরভাবে সে তার হাঁটুর উপরে হাত বুলাতে লাগলো।

সেটাই তো হচ্ছে বিপদ। তুমি ছাড়া আর সবাই বকে, গালমন্দ করে। হয়তো তোমারও করা উচিত।

আরিফি বেঞ্চের উপরে বসে উস্‌খুস্‌ করতে লাগলো...ও কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে। পলের চোখে রূঢ় বাস্তবের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার তিক্ত ছাপ।

ঘরময় কেমন যেন একটা গভীর কন্‌কনে নীরবতা পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। এমন কি পাখিগুলোও যেন পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষায় রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে; কিন্তু কোন কিছুই ঘটলো না; কেবলমাত্র পল পাদুটো বেঞ্চের উপরে তুলে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসলো।

ঝুলকালি মাখা অতি পুরানো দেয়াল ঘড়ীটার বিবর্ণ হল্‌দে মুখ থেকে টিক্‌ টিক্‌ শব্দে মুহূর্তগুলি টুপ্‌টাপ্‌ খসে পড়ে কালের অনন্ত স্রোতে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘড়ীটা নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে; গভীর শ্রান্তিতে দোলন দন্ডটা অলস মন্থর গতিতে চলেছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে; দোলার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠছে একটা অনুচ্চ কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ; দেওয়ালের গায়ে আরশুলাটা ঐ...ঐ শব্দের তালে তালে লম্বা গোঁফ

জোড়াকে অদ্ভুতভাবে আন্দোলিত করে চলেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে অস্তোন্মুখী সূর্যের রক্তিম রশ্মি জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে এসে মেঝের উপরে ঝিক্ মিক্ করছে।

পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিলে তা হলে...যাক্‌গে কি আর হয়েছে তাতে। মুক্তির জন্য যে পাখি খাঁচার গায়ে ডানা আছড়ায় তাকে ছেড়ে দেয়াই ভালো। কিন্তু যদি এমন ভাবে পোষ মেনে যায় যে খাঁচার ভিতরে থাকতেই ভালো লাগে, তবে থাক ; সেই সব পাখীর ভিতর আর পাখীত্ব থাকে না। সত্যিকারের পাখি সব সময়েই মুক্তি পাবার জন্য আকুলী-বিকুলী করে থাকে।

মুখ তুলে পল আরিফির পানে তাকালো।

একথা বলছ কেন?

ও কিছুনা...হঠাৎ মনে এলো বল্‌লাম। আরিফি কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। দাড়িগুলোর ভিতরে আঙ্গুল ডুবিয়ে আনমনে টানতে লাগলো। নিজেকে ওর কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হচ্ছিলো।

মানুষ যা ভাবে তা সব সময়ে প্রকাশ করে না। কখনও কখনও তুমি চিন্তার রাজ্যে ঘুরে বেড়াও...ঘুরতে ঘুরতে এক সময় দেখবে কখন সে চিন্তা হারিয়ে গেছে; সূত্রগুলি গেছে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে...আর যে সূত্র একবার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো, তা আর কখনও ফিরে আসবে না...

তারপর—প্রশ্ন করেই পল তার মাথাটা আর একটু এগিয়ে এনে উৎকর্ণ হয়ে আরিফির মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

তারপর আর কিছু নাই। ওঃ! কথা কওয়া বড্ডো কষ্ট, এসো পল আমরা সেণ্ট এ্যালেক্‌সিসের জীবনী থেকে খানিকটা পড়ি।

আচ্ছা।

ক্ষুণ্ণ মনে পল বেঞ্চের উপর বসে রইলো। আরিফির কথার ভিতর দিয়ে কি যেন একটা অভিনব অনুভূতির ইশারা জেগে উঠছিলো ওর মানে ; এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলা...এইটাই যে একটা নূতন ঘটনা!

আরিফি তাকের উপর থেকে একখানা জীর্ণ বই পেড়ে আনলো তার-পর খুলে একটা জায়গা বেছে বের করে টেবিলের উপর রাখলো। কিছুক্ষণের

ভিতরেই ওর গম্ভীর কণ্ঠের সুরে ছোট্ট ঘরখানি গম্ গম্ করে উঠলো। যতোই সে পড়ার ভিতর ডুবে যেতে লাগলো ততই তার গলার স্বর আরও গম্ভীর আরও ভারী হয়ে উঠে, অবশেষে কাঁপতে কাঁপতে উদারায় নেমে এলো। অন্যান্য সময়ে পল শুনতে শুনতে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে বইয়ের ভিতরের বিভিন্ন চরিত্রগুলোকে মনে মনে রূপ দিয়ে চলতো। ওর কল্পনায় ফুটে উঠতো মহাপুরুষদের ছবি...শীর্ণ, রোগা, বেঁটে, ছিপ ছিপে চেহারা; তীব্র দৃষ্টি আর উজ্জ্বল চোখ। ধর্মের জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের চেহারা আঁকতো...হৃষ্ট পুষ্ট গাঁয়ের কৃষকদের মতন...গায়ে আস্তিন গুটানো লাল রংয়ের সার্ট, পায়ে মস্মসে বুট; আর খৃষ্টানদের উপরে উৎপীড়নকারী সম্রাটদের চেহারা...বেটে পা, ভুঁড়ি মোটা জমীদারের মতন...সব সময়েই উগ্রমূর্তি ধারণ করে রয়েছে। ওর কল্প মূর্তিগুলো সবই বাস্তব থেকে নেয়া, যেমন গির্জার পুরোহিত, মাংসের দোকানের কেরাণী, সার্জেণ্ট গোগোলেভ, এই সব বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির লোকদের চরিত্র ও অবয়বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এমন ভাবে জুড়ে জুড়ে কল্পনায় পল ছবি এঁকে চলতো যে ক্রমান্বয়ে তাদের মানবিক মূর্তি অন্তর্হিত হয়ে এক একটি বিরাট আকৃতি দৈত্যে রূপান্তরিত হয়ে স্রষ্টাকেও ভীত করে তুলতো।

নিজের কল্পনায় গড়া ঐ সব মানস মূর্তির ভয়ে আঁৎকে উঠে পল শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে ঘরের চারিদিকে তাকাতো। ওর সামনে দেয়ালের গায়ে আরিফির উস্কখুস্ক অবিন্যাস্ত মাথাটার বিরাট কালো ছায়া; ঘরখানি জুড়ে তার থম্থমে কন্ঠের গম্ভীর প্রতিধ্বনি; পরিষ্কার স্পষ্ট উচ্চারণ থেকে থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাসে ভেংগে পড়ছে। মাঝে মাঝে পল কান পেতে শুনতো...কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতো না কেমন করে ঐ সহজ সরল শব্দগুলো ওর মনে এমন ভয়ংকর বিচিত্র সব মূর্তি ফুটিয়ে তোলে।

বুঝে উঠতে পারতো না কেন ঐ শব্দগুলো শোনার সংগে সংগে বইয়ের ভিতরের বর্ণিত চিত্রগুলি সে পরিষ্কার দেখতে পায় তার মানসপটে। ক্রমে দিবা-স্বপ্নে বিভোর হয়ে পল গল্পের খেই হারিয়ে ফেলতো, তারপর নিজস্ব চিন্তার ভিতরে ডুবে গিয়ে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তো।

পল আর আরিফি বসতো মুখোমুখী; কিন্তু আসপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে আরিফির আদৌ কোন খেয়াল থাকতো না। যখনই পড়তে বসতো, বইখানার সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে তবে ক্ষান্ত হতো। পড়া শেষ হয়ে গেলে পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত সে মলাটের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো বসে...যেন ঐ কালো মলাটের বুক থেকে আরও কোন অদৃশ্য লিপি পড়ে চলেছে। এমনি করে অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আরিফি শূন্য দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে তাকাতো, তারপর উঠে পলের কাছে এগিয়ে এসে পরম স্নেহে, একান্ত সন্তর্পণে, ওকে কোলে তুলে নিয়ে উনুনের পেছনে তার ছোট্ট বিছানাটিতে শুইয়ে দিতো।

পলের ঘুমন্ত দেহের উপরে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে পুনরায় আরিফি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বেঞ্চের উপরে বসে থাকতো।

বাইরে বেঞ্চের উপরে বসে বসে আরিফি নদীর পরপারের ঐ দূর বন-রেখা আর তারায় ভরা নীল আকাশের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখতো। কখনও বা কান পেতে শুনতো স্তব্ধ হয়ে আসা শহরের অস্পষ্ট কোলাহল; আবার কখনও বা পথচারিণী মেয়েদের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিমেলে তাকাতো। কখনও কখনও ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে গাল পেড়ে উঠতো, যদি তারা কেউ খুব বেশী শব্দ করে চালাতো গাড়ী: আস্তে চল শয়তান...অবশ্য তার সে গালাগালি কোন কাজেই আসতো না কিম্বা প্রয়োজনও হতো না; কিন্তু কোন কোচোয়ানই তার গাল না শুনে রাস্তা পেরিয়ে যেতে পারতো না। গাড়োয়ানদের সম্পর্কে আরিফির বদ্ধ-মূল ধারণা ছিলো যে ওরা কোনও দিন পরের ভালো তো করেই না, তাছাড়া ওরা হচ্ছে ভীষণ কুঁড়ে; ঘোড়াগুলোকে খাটিয়ে খাটিয়ে চিরদিন পরগাছার মতন খেয়ে পরে জীবন কাটায়। আরিফির মতে মনিবদের চাইতে ঘোড়া-গুলো ঢের বেশী সৎ, ঢের বেশী বুদ্ধিমান...অন্ততঃপক্ষে ওগুলোর মুখ থেকে আর যাই হোক, কুৎসিত অশ্লীল কথাতো আর বেরোয় না!

কখনও হয়তো আরিফির ঘরের সামনে দিয়ে ঝুমুর ঝুমুর শব্দে ঘুঙুর বাজিয়ে চলে যেতো এক্কাগাড়ী। কোচোয়ানের চীৎকার, মেয়েদের হুল্লোড়, পানোম্মত্ত পুরুষের অট্টহাসি, সব মিলে একটা বিরাট হৈঃ হল্লা করতে করতে

গাড়ীটা চলতো ছুটে; আরিফি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতো, তার ইচ্ছা হতো গাড়ীশুদ্ধ সবগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় টেনে তোলে। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ ধাবমান গাড়ীটার পানে রক্তচক্ষু মেলে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে থাকতো।

ছ'বছর বয়সে পল যখন প্রথম রাস্তায় খেলা করতে আরম্ভ করলো তখন থেকেই অন্যান্য ছোট ছেলেদের প্রতি আরিফির ব্যবহার হয়ে উঠলো রূঢ়। ক্রমে সে তাদের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। আরিফি কিছুতেই এটা বরদাস্ত করে উঠতে পারতো না, কোন্‌ সাহসে ওরা তার পলের সঙ্গে অমন বর্বর নিষ্ঠুর আচরণ করতে সাহস পায়। প্রথম প্রথম অবশ্য সে এতোটা বিশ্বাস করতে চাইতো না, কিন্তু হঠাৎ একদিন নিজের কানেই সে তার পালিত পুত্রের উদ্দেশ্যে বর্ষিত দু'চারটি ভাষা শুনতে পেলো আর সেদিন থেকেই তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, একমাত্র সে নিজে ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউই তার পলকে ভালোবাসে না।

নিজের অজ্ঞাতেই কেমন করে যেন আরিফি ছোট ছেলেদের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। রাস্তার উপরে ছেলেদের খেলাধূলা, হৈ-হুল্লোড় সে একেবারে বন্ধ করে দিলো, শিশুমনের উপরে এর প্রতিক্রিয়া হলো মর্মান্তিক। ক্রমে আরিফির স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে ওদের শিশুমন হলেও আদতে ওরা মোটেই শিশু নয়...বয়স্কদের সবকিছু কুসংস্কার, ইতরামো ইতিমধ্যেই ওরা বেশ আয়ত্ব করে বসে আছে।

এই ধারণার ফলে আরিফিকে প্রায়ই শহরের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে হতো। সেই সব সংঘর্ষের সময় পল সম্পর্কে তাকে আরও অনেক কুৎসিত মন্তব্য শুনতে হতো; ফলে, আরিফি আরও গম্ভীর হয়ে উঠতো; তার সমস্ত মুখখানা গভীর বিষাদের কালো রেখায় কুঞ্চিত হয়ে উঠতো; জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি বেয়ে ফুটে উঠতো বিক্ষুব্ধ অন্তরের অস্বস্তিকর অস্থিরতা। সমস্ত মুখখানা যেন দাড়ি, গোঁফ আর লোমশ ভ্রূ-যুগলের অন্তরালে অন্তহৃত হয়ে যেতো।

আরিফি যখন মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করতে শুরু করতো তখন সঙ্গে সঙ্গেই ওর গলার স্বর ভারী হয়ে উঠতো; কখনও বা আবার গলাটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে কেঁপে একটা রিণ্‌রিণে মিহি সুরে ভেঙে পড়তো।

কিন্তু পলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতো বরাবর ঠিক একই রকমের—তেমনি ভাষাহীন মৌন নীরবতায় চলতো দু'জনার কথোপকথন। স্বল্পভাষী আরিফি কথা বলতো খুবই কম আর তাও যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে; পলের বেলায়ও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো না। কেবল মাত্র ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান আর স্ত্রীলোক দেখলে পরেই ওর মুখ যেতো খুলে আর বেরিয়ে আসতো তীক্ষ্ম তীব্র কটুভাষা। কিন্তু ওর সাধারণ কথাবার্তার সুর ছিলো অন্য রকমের। ঐ সুরেই সে সার্জেণ্টের কাছে রিপোর্ট করতো, দারোয়ানদের দিতো হুকুম আর দিতো পথিকদের প্রশ্নের জবাব। অবশ্য খুব কম সংখ্যক পথচারীই তার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেতো। আরিফির বিরাট দেহ আর দাড়ি-গোঁফের ভিড়ের ভিতরে লুকানো গম্ভীর মুখের পানে তাকিয়ে কেউই আর তাকে কোন প্রশ্ন করতে উৎসাহ বোধ করতো না।

যতো দিন যেতে লাগলো ততই আরিফি আরও কম সময় ঘরে থাকতে লাগলো। এমনকি রাত্রে যেদিন ওর পাহারা থাকতো না সেদিনও সে বাইরে এসে পাতাবাহারের ঝোপের ভিতরের সেই বেঞ্চিটার উপরে চুপ করে থাকতো বসে। এমনি করে একভাবে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে ভোর পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়ে দিতো। কখনও বা সেইখানেই পড়তো ঘুমিয়ে। কিন্তু বেশীর-ভাগ সময়েই নদীর ওপারের মাঠের ভিতরের কোনও একটা নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো...মুহূর্তের জন্যেও অন্যত্র দৃষ্টি সরিয়ে নিতো না। হয়তো কখনও বা উঠে গিয়ে নদীর পারে একটা পাথরের উপরে বসে থাকতো; মনে হতো যেন সবটুকু প্রাণ মন দিয়ে সে কি একটা শুনতে চেষ্টা করছে। উপকূলের কানে কানে অতি মৃদু সুরে কি যেন গোপন কথা বলে নদী ছুটে চলছে দূরে,...বহু দূরে...কোন অজানা দূরান্তের পানে...

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পলও ধীরে ধীরে অন্তর্মুখীন হয়ে উঠতে লাগলো; তেমনি বিষাদভরা গম্ভীর মুখ তেমনি শান্ত মৌনচারী। সমবয়সীদের পক্ষে পলের সঙ্গে মেলামেশা করা শক্ত। অতীতের বহু প্রচেষ্টার দুঃখময় পরিণতির কথা স্মরণ করে পলও আর তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেনি কোন দিনও।

একবার অমনি এক প্রচেষ্টার পর পল ঘরে ফিরে এলো; রাগে, দুঃখে ওর মুখখানা থমথম করছে, চোখের নীচে পড়েছে কালশিরা, ঠোঁট কেটে ঝরছে রক্ত।

আবার বুঝি মারপিট করেছিস্...আরিফির কণ্ঠে স্নেহমাখা অনুযোগের সুর...দেখছি তুই মস্তোবড়ো একটা পালোয়ান হয়ে উঠেছিস...সব সময়ে লড়াই করেই বেড়াচ্ছিস!

পল চুপ করে বেঞ্চের উপরে বসে ক্ষত ঠোঁট চুষে চুষে থু থু ফেলতে লাগলো। জীবনে কখনও সে কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে কিম্বা কাঁদতে কাঁদতে আরিফির কাছে এসে হাজির হতো না প্রতিকারের জন্য। নিজের হাতেই সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে হিসাবনিকাশ চুকিয়ে তবে ফিরে আসতো ঘরে। পলের হাত থেকে কেউ পার পেয়ে যেতে পারতো না কিম্বা কখনও হেরে গিয়ে কেঁদেও ফেলতো না অন্য ছেলেদের মতন। আরিফি পলের এই স্বভাবটিকে খুবই পছন্দ করতো।

কার সঙ্গে লড়ে এলি এখন? কিরে, কথা কইছিস না যে? —অন্যান্য সময়ে আরিফি আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতো না; কিন্তু আজ কেমন করে যেন তার মনে হলো, পল যেন কি একটা কথা বলতে চাইছে, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না, তাই অন্তরে অন্তরে একটা তীব্র যাতনা অনুভব করছে। পলের মুখ থেকে কথাটা বের করার জন্য আরিফি সচেষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ পেড়াপিড়ি করতে হলো না। আপনা থেকেই পলের মাথাটা নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়লো তারপর ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো:

আমার মা বাবা কোথায়...

আরিফি উনুনের কাছে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করছিলো, হঠাৎ পলের প্রশ্ন শুনে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, যেন পল তার উপরওয়ালা—সার্জেণ্ট। ভীত বিস্ফারিত চোখে আরিফি ওর নমিত দেহখানির দিকে তাকালো। পল আরিফির চোখমুখের চেহারা কিম্বা ভাবান্তর কিছুই লক্ষ্য করলো না। উত্তরের আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো, কিন্তু আরিফির কাছ থেকে এলোনা কোনই প্রত্যুত্তর।

কেমন লোক ছিলো তারা?—মুখ তুলে পল আরিফির শঙ্কাকুল পান্ডুর মুখের পানে তাকালো; ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো এক বিচিত্র বাঁকা হাসির শীর্ণ রেখা—কিন্তু সে হাসি আদৌ শিশু-মুখের স্বাভাবিক হাসি নয়। এতক্ষণে আরিফি নিজেকে সামলে নিয়েছে।

তোর মা ছিলো একটা নচ্ছার আর বাপ ছিলো একটা পাজী, জোচ্চোর লোফার—ক্রুদ্ধ গর্জণে আরিফির কণ্ঠ ফেটে পড়লো, তারপর পলের বাপ-মার উদ্দেশ্যে এমন সব গালি পাড়তে শুরু করলো যে পল জীবনে কখনও আর তার মুখ থেকে অমন অশ্রাব্য ভাষা শোনেনি কিম্বা হয়তো শুনবেও না আর কোন দিন।

মাথা নীচু করে পল চুপ করে বসে রইলো।

আরিফিও এসে বসলো ওর পাশে। উনুনের উপরে হাঁড়ির মুখ বেয়ে ফুটন্ত জল উতলে জ্বলন্ত কাঠের উপরে চলকে পড়ছে কিন্তু সেদিকে তার আদৌ লক্ষ্য নেই। দুজনার মাঝখানে যেন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা এসে চেপে বসেছে।

অনেকক্ষণ পরে পল ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো:

তুমি তাঁদের চিনতে?

হাঁ...অস্পষ্ট কণ্ঠে আরিফি জবাব দিলো। তাদের না চেনার কি আছে! মোট কথা হলো এই, তারা তাদের বাচ্চা ছেলেটাকে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে যারা একাজ করতে পারে, তারা নিশ্চয়ই লোক ভালো ছিলো না।

এখনও কি বেঁচে আছে তাঁরা?

তা আমি জানি না...আমার তো মনে হয় এতো দিনে তারা মরে গেছে। মা-টা মরেছে তোর শোকে পাগল হয়ে, আর বাপটা মরেছে মদ গিলে গিলে কিম্বা ঐ ধরণের কিছু একটা কান্ড করে...আর সে-ও মরেছে খুব সম্ভব পথে পড়ে...কুত্তার মতন।

তুমি—দেখেছো তাদের?

না, কক্ষনো না—জীবনেও আমি কখনও ঐ সব নচ্ছার অমানুষদের মুখ দর্শন করিনি। আমি দেখবো ওদের মুখ?

পল বুঝতে পারলো, দৈবাৎ কোনও দিন যদি আরিফির সঙ্গে তার বাপ-মায়ের দেখা হয়ে যেতো তবে ব্যাপারটা খুব সুবিধাজনক হয়ে উঠতো না তাঁদের পক্ষে। পল সবকিছুই বুঝতে পারলো, তাই সেদিনের পর থেকে আর কোন দিনও ঐ প্রসংগের অবতারণা করেনি। কেবল আর একদিন কি যেন এক অদ্ভুত খেয়ালের বশবর্তী হয়ে আরিফি নিজেই পুনরাবৃত্তি করেছিলো ঐ কথার:

দেখো পল, মনে রেখো, তুমি কোনও সাধারণ লোকের ছেলে নও। তোমার মস্তিষ্ক, তোমার বুদ্ধি সেটাও খুব সাধারণ নয়—না মাটেই সাধারণ নয়।...

কি করে যে আরিফি এমন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছালো যে, পল একজন অসাধারণ মানুষের সন্তান, সেটা বলা শক্ত। পল নিজে অবশ্য তেমন কোন বৈশিষ্টের নিদর্শন দেখায়নি যা থেকে আরিফি ঐ রকমের একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারে। কেউ অবশ্য বুঝতে পারতো না যে আরিফি কতো গভীরভাবে পলকে ভালোবাসে; পলের প্রতি ভালবাসা ছিলো তার একান্ত গোপন সম্পদ।

ঐ একটিবার ছাড়া আর কোন দিনও আরিফি পলের বংশ পরিচয় সম্পর্কে একটি কথাও বলে নি।

পলও কি ভাবতো তার জন্ম বৃত্তান্তের কথা? হয়তো ভাবতো না। মানুষের কল্পনার পরিধি সুদূরপ্রসারী; শিশুর কল্পনাশক্তি অসীম, ব্যাপক, বাধাবন্ধনহীন; বয়ঃপ্রাপ্তদের তুলনায় শিশুমন ঢের বেশী বিচিত্র, অদ্ভুত, রহস্যময়—কারণ তারা সাংসারিক আবিলতার বহু ঊর্ধ্বে।

চার

একদিন পাহারা থেকে ফিরে এসে আরিফি দেখলো, ময়নাটা যেন কেমন কেমন করছে—হাবভাব কেমন যেন অস্বাভাবিক। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ে বসে থাকার পরেই ডানা ঝট্‌পট্ করতে করতে মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে গেলো। এমনি করে অনেকবার ময়নাটা জলের বাটির ভিতরে পড়ে গেলো তারপর আবার উঠে গা ঝেড়ে খাঁচার গায়ে ঠোঁটটা একটু ঘসে ডানা মেলে পুনরায় দাঁড়ে উঠে বসার চেষ্টা করলো। এক একবার পড়ে যাবার পর

অনেক চেষ্টায়, অতিকষ্টে পাখিটা আবার দাঁড়ে উঠে বসছিল; অবশ্য আগে ওর কষ্ট হতো না মোটেই, অনায়াসেই পারতো দাঁড়ে উঠে বসতে; দাঁড়ে উঠে বসেও কিন্তু ময়নাটা সেদিন আর তার অভ্যাস মতন দাঁড়ের মাঝখানে বসে থাকতে পারছিলো না—এক কোণে এসে বসছিলো খাঁচার গায়ে ভর দিয়ে।

খোঁড়াটা মরে যাচ্ছে হে—পাখিটার ভাবভংগী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে আরিফ পলের উদ্দেশ্যে বললো।

কক্ষনো না।—তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো পল। ময়নাটাকেই সে ভালোবাসতো সবচাইতে বেশী।

আমার তো যেন তাই-ই মনে হচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেছে...

থাক, তুমি ধরোনা, অমনি থাকতে দাও ওকে।

ব্যথাকাতর করুণ চোখে পল ময়নটার দিকে তাকিয়ে রইলো। দাঁড়ের উপরে বসে পাখিটা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

ওকে হাওয়ায় নিয়ে গেলে বোধহয় ভাল হয়, কি বলো?

আমারও মনে হচ্ছে তাই।

খাঁচাশুদ্ধ ময়নাটাকে ওরা বাইরে নিয়ে এলো।

ফাল্গুনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন; স্থানে স্থানে জমে ওঠা জলের উপরে সূর্যের আলোক প্রতিফলিত হয়ে রুপালী দীপ্তিতে চক্‌চক্ করছে; বরফ গলতে শুরু করেছে; মেঘমুক্ত দিগন্ত সুদূরপ্রসারী; শীতের পুঞ্জপুঞ্জ ধূসর মেঘের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। নদীর পরপারে গাঢ় বাদামী রঙের রাস্তাটার দুপাশের কাদা মাটির উপরে হয়েছে রৌদ্রলোকের কিরণ সম্পাত। প্রথম বসন্তের মেঘমুক্ত আকাশে নবজীবনের ইশারা।...

কিন্তু কিছুতেই ময়নাটাকে সজীব করে তুলতে পারলোনা। বাইরে বের করে ঘাসের উপরে বসিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে পল যেই মাত্র খাঁচার দোরটা খুলতে গেলো ঠিক সেই মুহূর্তেই ময়নাটা স্থির দৃষ্টিতে চারদিকে একবার দেখে নিয়ে মাথাটা নাড়তে নাড়তে অনুচ্চ কণ্ঠে একবার শিস দিয়ে উঠে পরক্ষণেই মুখথুবড়ে পড়ে গেলো।

ময়নাটা মরে গেলো।

চকিতে পল দুপা পেছিয়ে এসে মৃত্যুকালীন শেষ আক্ষেপে টান করে

ছরিয়ে দেওয়া ওর পা-টার পানে অনিমেষ করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শেষ বারের মতন পাখিটার সমস্ত শরীর একবার থর থর করে কেঁপে উঠে পরক্ষণেই যখন স্থির, নিশ্চল হয়ে গেলো, পলের দু'গাল বেয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় গড়িয়ে নেমে এলো চোখের জল। মৃত পাখিটাকে খাঁচার ভিতর থেকে বের করে এনে বারবার সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো; দুফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়লা পাখিটার ডানার উপরে...

তুইও তাহলে কাঁদতে পারিস! আমি মরে গেলেও কাঁদবি দেখছি।—নীচু হয়ে পলের মুখের পানে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে আরিফি বললো।

তার বলার সঙ্গে সঙ্গেই পল পাখিটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে দুহাতে আরিফির গলা জড়িয়ে ধরে বুকের ভিতরে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো। প্রবল কান্নায় পলের সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

শান্ত হ'...শান্ত হ'...কাঁদিস না! দুনিয়ায় এখনও দুএকটা সৎলোক আছে ...তুই বেঁচে থাকবি; তবে তোর পক্ষে সংসারে চলা একটু কঠিনই হবে, কারণ তোর স্বভাবটা বড্ডো কঠিন...কারুর কাছেই তো মাথা নোয়াতে পারবি না, এই যা বিপদ। অবশ্য একথাও ঠিক, সংসারে নীচু হয়ে চলাটা আরও খারাপ; তখন সবাই দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে। তবুও দেখবি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে, পড়াশুনা করা দরকার।

আরিফির গম্ভীর কণ্ঠের সান্ত্বনাভরা কথায় ক্রমে পল শান্ত হয়ে এলো, তারপর দুজনে মিলে ময়নাটাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলো। পাতাবাহারের ঝোপের ভিতরে গর্ত খুঁড়ে পাখিটাকে শুইয়ে দিয়ে তার উপরে ছোট ছোট কড়ি বিছিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিলো।

পাখিটার মৃত্যুতে পলের মনে গভীর আঘাত লাগলো; ওর কবরের উপরে একটা ক্রুশ পুঁতে দেবার জন্য আরিফির অনুমতি নেবার কোন প্রয়োজনই বোধ করলো না পল; ছোট্ট একটুকরা কাঠ নিয়ে আপন মনে ক্রুশ তৈরী করতে লেগে গেলো।

বেঞ্চের এক কোণে বসে আরিফি পলের ক্রুশ তৈরী দেখতে দেখতে কি যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো; কুঞ্চিত হয়ে উঠলো কপালের বলি-রেখা।

দেখ পল! মনে হয়, আমিও আর খুব বেশী দিন বাঁচবো না। মাঝে মাঝে শরীরটা ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ে। কাছে আয়, এই সময়ে তোকে কয়েকটা কথা বলে রাখি।

হাতের ছুরিটা টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে পল আরিফির কাছে এগিয়ে এলো তারপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথাগুলো শুনতে লাগলো:

শোন, মিখেইলোর কাছে আমার পাওনা আছে পঁয়ত্রিশ টাকা পাঁচ আনা। ধার নিয়েছিলো। আর আমার বাক্সে আছে সতেরো টাকা আট আনা! টাকাটা আমি তোর হাতে দেবো না...ডাকঘরে গিয়ে তোর নামে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসবো; তারা তখন একটা হল্‌দে বই দেবে। বইটা কিন্তু খুব সাবধান করে রেখে দিবি, হারাবি না। তারপর শিগ্গিরই আমি তোকে একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিয়ে আসবো। খুবই খারাপ লাগবে কিন্তু সেখানটায়...হাঁ খুব খারাপ। মানুষগুলো এতো খারাপও হতে পারে—কুত্তার মতন। মদ খায়, গালাগালি করে, ভীষণ লম্পট আর বদমায়েশ; একটুও আনন্দ পাবি না ওদের সংসর্গে। তোকে হয়তো ধরে ধরে মারবে গাল মন্দ করবে...সবাই। বলতে বলতে হঠাৎ অর্ধপথে আরিফি উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের গা'থেকে টুপীটা পেড়ে নিয়ে মাথায় পড়ে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলা।

পল পুনরায় মৃত ময়নাটার কবরের জন্যে ক্রুশ তৈরী করতে আরম্ভ করলো। আরিফির মৃত্যুর কথা মনে করে ওর মনটা দারুণ ভারী হয়ে উঠলো। গভীর রাত্রে যখন আরিফি ঘরে ফিরে এলো পল তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সেদিনের পর আর কোন দিনও আরিফি তার নিজের মৃত্যুর প্রসংগ আলোচনা করেনি।

আরও দুমাস কেটে গেলো। হঠাৎ পলের পড়াশুনা করার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিলো। সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত সে বই নিয়ে বসতে আরম্ভ করলো; কিন্তু বইয়ের লেখা ওর কাছে মনে হতো বড্ডো শক্ত। অতিকষ্টে গলদঘর্ম হয়ে হয়তো বই থেকে একটা শব্দ পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হয়ে দেখলো যে, শব্দটা সে বরাবরই জানে। এতে পল ভীষণ চটে যেতো, নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করতো এসব শব্দ বইতে লেখার কি মানে?

পড়তে পড়তে একদিন সে ভীষণ চটে গিয়ে আরিফিকে বললো যে, বইয়ের

ভিতরে যা তা সব আজে বাজে কথা লেখা, ওসব পড়ার কোনও মানেই হয় না।

তবে তুই কি পড়তে চাস...আরিফি প্রশ্ন করলো।

আমি?—পল কিছুক্ষণ চিন্তা করলো, তারপরে বললো: এই দেখোনা, এখানে লেখা রয়েছে—শিশুগণ বেলা হয়েছে; ঘড়িতে দুটো বাজতে দুমিনিট বাকী। তারপর আবার দেখো: পাহারা, রুজ্জু, দই, তার!—কি হবে আমার এসব পড়ে?

তা বটে, কিন্তু আরও পড়ে যাও।

পল পড়ে যেতে লাগলো কিন্তু কিছুতেই তার মন সন্তুষ্ট হতে পারলো না; ওর মনের ভিতরে জেগে ওঠা প্রশ্ন, সংশয় ইত্যাদির কোনও জবাবই সে বইয়ের ভিতর খুঁজে পেলো না। সেদিন পল দুটো গল্প শেষ করলো; কিন্তু গল্প দুটো শেষ করার পর তেমনি সংশয়ভরা অন্তরে নিজের কাছেই প্রশ্ন করলো:

...এ পড়ে কি লাভ হলো?

দূর থেকে ভেসে আসছে ক্রীড়ারত বালক কণ্ঠের উচ্চহাসির শব্দ; জানালার পথে সূর্যের আলো এসে ঘরের মেঝের উপরে পড়ছে ছড়িয়ে; কিছুতেই পল বইয়ের ভিতরে মন বসাতে পারছিলা না। ক্রমান্বয়েই সে চটে উঠতে লাগলো। খাঁচার ভিতরে পাখিগুলো জুড়ে দিয়েছে কলরব, লম্ফ-ঝম্ফ। আড়চোখে পল পাখিগুলোর দিকে তাকালো; তার মনে পড়ে গেলো কেমন করে একদিন সে ঐ পাখিগুলোকে দিয়েছিলো উড়িয়ে।

বহু দূর থেকে একটা গাড়ীর ঘড়-ঘড় আওয়াজ ভেসে এলো...একটা ঘোড়ার গাড়ী এগিয়ে আসছে। জানালার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পল বাইরের দিকে তাকালো; রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে এক রুটীওয়ালা। এতক্ষণে পলের খেয়াল হলো তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কেন যেন আজ আরিফির ফিরতে দেরী হচ্ছিলো।

ক্রমে গাড়ীটা ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো; এসে পৌঁছলো মোড়ের মাথায়। গাড়ীর ভিতরে একজন সেপাই, কিন্তু ওতো আরিফি নয়—মিখেইলো। 'কেন এলো মিখেইলো...পল মনে মনে ভাবলো।

বহু দূর থেকেই মিখেইলো পলকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। পল দেখলো.

মিখেইলোর চেহারা অস্বাভাবিক—উষ্ক-খুষ্ক; টুপীটা কাত হয়ে এক পাশে ঝুলে পড়েছে, কোটের বোতাম খোলা...পল বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।

শিগ্গির! জল্‌দি করে গাড়ীতে উঠে পড়!—মিখেইলো চীৎকার করে বলে উঠলো;—এই গাড়োয়ান! হাসপাতালে ফিরে চল! প্রবল উত্তেজনায় মিখেইলো গাড়োয়ানের পিঠের উপরে একটা খোঁচা দিলো।

কি হ-য়ে-ছে? কান্নার সুরে পল চীৎকার করে প্রশ্ন করলো। মুখখানা কাগজের মতন সাদা হয়ে গেছে। মিখেইলোর জামার হাতা ধরে জোরে একটা টান দিলো।

তা খবরটা খারাপ বটে! আরিফি পাগল হয়ে গেছে। ওর মাথাটা একদম বিগড়ে গেছে...বিলকুল! সার্জেণ্টের কাছে এসে বললো কিনা, 'আমায় মারো. শাস্তি দাও, পীড়ন করো...আমি খৃষ্টান্! মারো, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না কিম্বা কিছু করতে চাই না।' গোগোলেভ ওর মুখের উপরে একটি ঘুসী বসিয়ে দিলো কিন্তু তাতেও ওর ভ্রূক্ষেপ নেই; বলতে লাগলো,—'মারো, আরো মারো, তবুও অনাদি অনন্তকাল ধরে আমি খৃষ্টান্‌ই থাকবো।' হা ভগবান! কি সব অদ্ভুত কথা! তারপর আরিফি তাকের উপর থেকে সব জিনিষপত্র টেনে টেনে নামিয়ে দুপা দিয়ে মাড়াতে আরম্ভ করলো আর চীৎকার করে বলতে লাগলো: 'তোদের সব দেবদেবীর মূর্তিগুলো আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো।' অবশ্য তক্ষুণি সবাই মিলে ওকে ধরে শক্ত করে বেঁধে ফেললো তারপর পাঠিয়ে দিলো হাসপাতালে। মুখে কিন্তু তেমনি সব আবোল তাবোল বকেই যেতে লাগলো। হাঁ, এ হচ্ছে গিয়ে তোমার ঐ বই পড়ার ফল। লেখাপড়া শিখলে কেবল দুঃখ বাড়ে বৈ আর কোন লাভই নেই। যতোই তুমি চিন্তা করতে থাকবে ততোই যতো সব আজে বাজে চিন্তা তোমার মাথায় এসে বাসা বাঁধবে; ভাবতে শুরু করবে—কেমন করে হলো?—কিসের জন্য হলো?—কেন হলো? আরে ছোঃ! মাথাটা বিলকুল খারাপ হয়ে যাবে। সত্যি! এটা ভারী দুঃখের ব্যাপার হলো...অনেক কালের বন্ধু আমার আরিফি!...

পলের মুখ রক্তশূন্য, বিবর্ণ। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপ করে বসে সে শুনতে

লাগলো মিখেইলোর কথা। ওর মনে পড়লো, কালও সে দেখেছে আরিফিকে, দেখেছে পরশু, দেখেছে তার আগেও...কিন্তু সে সব দিন এখন অতীতের গর্ভে।

ইতিপূর্বে একটিদিনের তরেও পল আরিফির ভিতরে কোন পরিবর্তন, কোনও ভাবান্তর দেখতে পায়নি। ইদানিং কেবল কেমন যেন একটু রোগা হয়ে যাচ্ছিলো আর তার স্বাভাবিক বিষাদ মাখা গভীর দৃষ্টি মাঝে মাঝে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠতো—একটু বেশী রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠতো দুটো চোখ, খুব আনন্দ হলে পর যেমন হয়ে থাকে মানুষের। আবার কখনও কখনও এমনও মনে হতো যেন কি একটা ভয়ংকর মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে—এমন একটা শঙ্কিত ভয়ার্ত দৃষ্টি যেন চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতো।

একদিন...খুব বেশী দিন আগের কথা নয়...টাসকেণ্টের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে আরিফি পলের সঙ্গে করেছিলো আলোচনা...দেশটা কি রকম গরম, কি রকম বালুকাময় আর কি রকমের অসভ্য জাতি সেখানে বাস করে। বলতে বলতে তাদের কি একটা অপরাধের কথা উল্লেখ করে হঠাৎ আরিফি দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো...'ওদের ইঁদুরের মতন করে পিটে মারা উচিৎ।' কিন্তু বলার পরক্ষণেই সে চুপ করে গেলো; তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর একটি দিনের জন্যেও তার স্বাভাবিক অবস্থার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

আবার ভালো হয়ে উঠবে তো?—মিখেইলোর দার্শনিকতায় বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলো পল।

সে? তা-তাইতো মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। অবশ্য যদি ডাক্তারদের কথা বলো, ওরাই বা জানবে কি করে, কি হবে না হবে? কিচ্ছু না! কিচ্ছু না! ওরা পারে কেবল ঘা সারাতে—ব্যস্! তার বেশী কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু পারে না। ভালো কথা, ঘরে তালা দিয়ে এসেছো তো? এই গাড়োয়ান! রোকো, রোকো! তালা দিয়ে এসেছো তো, এ্যাঁ?

সত্যি করে বলো, ডাক্তারেরা বলেছে কিছু? বলো না, বলেছে কিছু? ও কী? গাড়ী থামালে কেন, জল্দি চলো! জল্দি চলো! মিখেইলোকাকা!

তার মানে? জল্দি চলো কি? ঘর খোলা রয়েছে না—কি ছেলেবাবা—

আবার বলছে কি না জল্‌দি চলো! গাড়োয়ান ঘুরাও গাড়ী। আরে ফিরে চল মূর্খ কোথাকার!

না, না, মিখেইলো কাকা, না। আগে আরিফি কাকার কাছে চলো। চুলোয় যাক্ ঘর—হতাশাভরা করুণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো পল।

অসম্ভব! কি অদ্ভুত ছেলেরে তুই? তাহলে আমি নিজেই যাচ্ছি, আমি নিজে...গাড়োয়ান চালাও! ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। আচ্ছা এসো তাহলে, যাও! পাগলাগারদ যেদিকটায়, সেখানে ওকে নিয়ে যাবে। আর শোন্—পল সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাস করবি যে...

ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ী ছেড়ে দিলো। কি জিজ্ঞাসা করবে তা আর পল শুনতে পেলোনা। অস্থিরভাবে পল গাড়ীর ভিতরে নড়াচড়া করতে লাগলো আর বারবার করে গাড়োয়ানকে তাড়া দিতে লাগলো—জোরসে চলো!

এই এক্ষুণি পৌঁছে দেবো—বলেই গাড়োয়ান ঠোঁটে একপ্রকার বিচিত্র শব্দ করে চাবুক উঁচিয়ে ঘোড়াগুলোকে চীৎকার করে গাল পেড়ে উঠলো:

এই-ও, কোন্ দিকে যাচ্ছিস? তোদেরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি?—গাড়োয়ান লাগাম টেনে ঘোড়া দুটোর মাথা প্রথমে ডান দিকে পরে বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিলো; লেজে ঝাপ্‌টা মেরে নাক দিয়ে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করে ঘোড়া দুটো বিরক্তি প্রকাশ করে উঠলো।

মিখেইলোর বয়ে আনা এই চরম বিপদের সংবাদে পলের মনে এতো-দিনের জমে ওঠা বিষাদের কালো মেঘ মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেলো। এই প্রথম মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো সে রূঢ় বাস্তবের সামনে—তাকে দেখলো, চিনলো, জান্‌লো। স্বভাবতঃ পল সাবধানী, সন্দিগ্ধ চিত্ত—কাউকে সহসা বিশ্বাস করতো না। সবটুকু শক্তি দিয়ে পল তার অন্তর মথিত করে জেগে ওঠা এই মর্মান্তিক দুঃখকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করতে লাগলো, এতক্ষণে মনে হলো সংসারে সে একা—অসহায় সঙ্গীহীন।

এই গাড়োয়ান, এই পথ, পথের বুকে ঐ যে অবিশ্রাম জনতার মিছিল—সবকিছুই কালকের তুলনায় আজ ওর কাছে নূতন, অপরিচিত। সবকিছু মিলে কেমন যেন একটা ভীতি,একটা বিপদের সঙ্কেত, একটা অবাঞ্ছিত ঘটনার পূর্বাভাষ—অন্তরে অন্তরে পল অনুভব করছে তারই একটা

অশরীরী কালো ছায়া। এমন কি ঐ যে রৌদ্র-স্নাত গ্রীষ্মের মেঘযুক্ত আকাশ, কালও যে নাকি বয়ে এনেছে আশা, আনন্দ, এনেছে আলিঙ্গন ভরা তৃপ্তি—আজ, এই মুহূর্তে তাকে মনে হচ্ছে যেন নিষ্ঠুর, নির্মম, উদাসীন—কোন দিনই পলের সঙ্গে যেন তার কোন পরিচয় ছিলো না।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় সে ভালো হয়ে যাবে?—গাড়ীটা মোড় ফিরে একটা তারের বেড়ার কাছে এগিয়ে আসতেই পল গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করলো। ঐ বেড়ার ওপাশেই হাসপাতালের হলদে বাড়ী—ঠান্ডা, নির্জীব, ভয়ঙ্কর।

হাঁ...হাঁ...সে ভালো হয়ে যাবে। বাঁয়ে—এই শয়তানের বাচ্চা, বাঁয়ে চল্! অপদার্থ!

কিন্তু শয়তানের বাচ্ছা বাঁয়ে মোড় ঘোরাবার আগেই পল গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে হলদে দেওয়ালের গায়ের কালো স্থানটার দিকে লক্ষ্য করে তীর বেগে ছুট চললো।

পল হাসপাতালের ভিতর এসে ঢুকলো। কিন্তু এখন কোনদিকে যাবে?

কি চাই খোকা?— কে একজন প্রশ্ন করলো।

কে প্রশ্ন করলো সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করেই পল তাড়াতাড়ি বলে উঠলো: একজন সেপাই—পাগল—আজ; আজ তাকে এখানে এনেছে—আমায় একটু দেখিয়ে দিন, সে কোথায়?

ওঃ! সোজা এগিয়ে যাও, সোজা, কে হয় তোমার? বাবা?

পল মুখ তুলে চাইলো। লাল সার্ট গায়ে একখানা চওড়া পিঠ তার আগে আগে চলেছে।

তোমার কে হয়? বাবা...চলতে চলতে লোকটি পলের দিকে না ফিরেই প্রশ্ন করলো তারপর এক সময়ে হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে থমকে দাঁড়ালো যে পলের মুখখানা এসে ওর পিঠে ধাক্কা খেলো।

এটি হচ্ছে, নিকোলাস নিকোলিয়েভিচ্...পুলিসের সেপাইটির ছেলে।

চশমা চোখে এক ভদ্রলোক পলের কাছে এগিয়ে এলেন, তারপর ওর চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরলেন।

কি চাই তোমার খোকা...শান্ত কোমল সুরে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন; অবাক হয়ে পল ভদ্রলোকের মুখের পানে তাকালো—মুখখানা শীর্ণ

ফ্যাকাশে, ছোট্ট।

বলো, কি চাই?

আমি তাঁকে দেখতে চাই...

তাতো হবে না, এখন দেখতে পাবে না।

পলের চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো...সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

তা হলে কেমন করে আমি...কাঁদতে কাঁদতে পল বলে উঠলো। কিন্তু ভদ্রলোকটি ততক্ষণে চলে গেছেন; সেখানে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র লাল সার্ট আর এপ্রোন পরা সেই লোকটি। সে এসে পলের সামনে দাঁড়ালো—দুটো হাত পিছনের দিকে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে পলের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো!

দেওয়ালের গায়ে মিশে গিয়ে পল ভীষণভাবে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

নাঃ! এসো আমার সঙ্গে। জলদি এসো! ডাক্তার আবার না দেখে ফেলে। চলে এসো...পলের হাতখানা ধরে সে ওকে বারান্দার শেষ প্রান্তে টেনে নিয়ে এলো।

দেখো...পলকে পিছন থেকে তুলে ধরে দরজার গায়ে আঁটা একটা গোল কাঁচের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে ওকে দেখতে বললো।

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আরিফির গম্ভীর উচ্চ কণ্ঠ ভেসে আসছে; একটা লম্বা সাদা গাউন পরে আরিফি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে; তার হাত দুটো পিছ মোড়া করে বাঁধা; মাথার উঁচু টুপীটা পিঠের দিকে হেলে পড়েছে। আরিফি চুল, দাড়ি, গোঁফ সব পরিস্কার করে কামানো; ফলে, কান দুটো মনে হচ্ছে যেন বেজায় বড়ো; গাল দুটো হলদে—ভেঙে, চুপসে, বসে গেছে, গালের হাড় উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু কালো হয়ে গর্তের ভিতর ঢুকে গেছে। একটা চোখের নীচে ছোট্ট একটা লাল আঁচিল; বাঁ গালের উপরে লাল তারার মতন ক্ষুদ্র একটি ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে নেমে এসে জামার কলারের ভিতরে মিলিয়ে গেছে। আরিফিকে মনে হচ্ছে ভীষণ লম্বা, রোগা, আর শীর্ণ।

তোরা গায়ের জোরে আমাকে আজ এই অন্ধকার কারাগারে বন্দী করেছিস

—আরিফি গর্জন করে উঠলো ; তার চোখ দুটো ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলছে। —ঈশ্বরের নামে এ দুঃখ আমি বরণ করে নিলুম— অনন্তকাল ধরে ভোগ করবো এই যন্ত্রণা; কিন্তু তবুও আমি তোদের পুতুল পূজা ধ্বংস করেছি —চূর্ণ করে দিয়েছি তোদের পূজার বেদী। এখনও যে তোরা আমার জিভ ছিঁড়ে নিস্‌নি তাই আমি তোদের অভিসম্পাত করছি, নারকীর দল! ঈশ্বরকে —সেই অবিনশ্বর পরম সত্যকে, সুন্দরকে, তোরা ভুলে গিয়েছিস আর ঘোর অন্ধকারে ঘুরপাক খেয়ে মরছিস। পৌত্তলিক! পৌত্তলিক! পৌত্তলিক! ভাবী বংশধরদের আত্মাও তোরা কলুষিত করেছিস, তোদের মুক্তি নেই—মুক্তি নেই, মুক্তি নই! কেন তোরা আমাকে মেরেছিস? কেন নির্যাতন করেছিস? আমার অন্তরে যে ঈশ্বর আছেন—সত্য আছে তারই জন্যে...

আরিফির গম্ভীর কণ্ঠ কখনও বজ্র নিনাদে গর্জে উঠেছে। আবার পরক্ষণেই মৃদু হ'তে মৃদুতর হয়ে কেঁপে কেঁপে ভেঙে পড়েছে। দারুণ ভয়ে জ্বরগ্রস্ত রোগীর মতন পলের ক্ষুদ্র দেহখানি প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করলো। কে যেন তাকে দুহাত দিয়ে ঠেলে ঐ ছোট্ট ঘুলঘুলিটির সামনে থেকে বারবার সরিয়ে দিচ্ছে।

আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করে আছি, শোন্‌ পৌত্তলিকের দল!—মহিমা-মণ্ডিত গৌরবময় মৃত্যুর জন্য। কোথায় তোদের ঘাতক, কোথায় তোদের নির্যাতন কারীর দল? পৌত্তলিক...পৌত্তলিক...পৌত্তলিক...

ভয়ংকর বন্য চীৎকারে দরজা জানালা সব ঝন্‌ ঝন্‌ করে কেঁপে উঠলো; কেঁপে উঠলো ঘুলঘুলির কাঁচের আবরণ—যার ভিতর দিয়ে পল দেখছিলো আরিফিকে।

আচ্ছা হয়েছে। এখন শিগ্‌গির বাড়ী চলে যাও নইলে ডাক্তার দেখতে পেলে বিপদ ঘটাবে।

আরিফির সেই অমানুষিক চীৎকার শুনতে শুনতে পল বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো ; তার সেই ভীষণ চীৎকার, সেই ভয়ংকর ফিস্‌ফিসে কণ্ঠের হিম শীতল আর্তনাদ যেন পলের পেছু পেছু তাড়া করে ধেয়ে চলেছে। আরিফির হাড় বের করা হলদে মুখখানা যেন বিরাট বড়ো হয়ে এক ভীষণ আকৃতি ধারণ করলো— দুটো চোখ যেন ক্রমে বড়ো হতে হতে দুটো

বিরাট সূর্যের মতন হয়ে উঠলো—তেমনি উজ্জ্বল তেমনি ভাস্বর—কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য মলিন, মেঘাচ্ছন্ন। পরক্ষণেই আবার সেই বিরাট মুখখানা ভেঙে চুরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখে বিভক্ত হয়ে পলের চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো আর সহস্র সহস্র চোখের অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে পলের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে লাগলো গভীর হতাশা, গভীর দুঃখ, মর্মান্তিক শোক।

অতীতের বহু ছবি ভেষে উঠলো পলের মানস পটে—যখন আরিফি ছিলো সুস্থ, সবল ছিলো তার মুখভরা বিরাট দাড়ি-গোঁফের চাপ আর ছিলো সে স্বল্পভাষী, মৌন, গম্ভীর। একটা ছবি ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেলো, পরক্ষণেই ভেসে উঠলো আর একটা ছবি; সেটাও আবার মিলিয়ে গেলো। বালকের মনে জেগে উঠলো এক প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা। এইমাত্র যে ছবিটা ভেসে উঠলো, পরক্ষণেই এক অদ্ভুত অতলস্পর্শী অন্ধকারের ভিতর সেটা ডুবে গেলো—মিলিয়ে গেলো সেই ছবি, মুছে গেলো চিন্তা আবার অতীতের যতো স্মৃতি একটির পর একটি জেগে উঠতে লাগলো তার মনে—অসহনীয় বেদনায় অন্তর মুচড়ে উঠলো বার বার। আরিফির শোক, নিজের ভবিষ্যতের ভয়, সব কিছু একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে যেন একটা কঠিন পাথরে পরিণত হয়ে পলের মাথা, কাঁধ, বুক ছেঁচে দিতে লাগলো।

সামনে নদী। নদীর তলদেশ থেকে একটা কালো সনসনে হিম-প্রবাহ জেগে নৈশ অন্ধকারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেলো। মাথার উপরে আকাশ; আকাশের বুকে জমে উঠেছে থলো থলো ছিন্ন মেঘের সারি; ভাঙা মেঘের ফাঁকে দু'তিনটি তারা মিট মিট করছে; মনে হচ্ছে যেন সমস্ত আকাশ ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে, ভাঙা ভাঙা মেঘ আর তারার ঝিকিমিকির ছায়া ভরা নদীর স্বপ্নাতুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরপারে দিগন্তরেখা—কালো, শান্ত, নিস্তব্ধ।

পল ছুটে ঘরে ঢুকতে গেলো; ঘর বন্ধ, তালা দেওয়া। বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ধীরে নেমে এসে উঠানের ঝোপের পাশে শুয়ে পড়ে নৈশ আকাশের বুকের চলন্ত মেঘের পানে তাকিয়ে রইলো। ধীরে ওর দুচোখ ভরে নেমে এলো ঘুম—গভীর দুঃস্বপ্নভরা ঘুম...

পাঁচ

পিঠের উপরে একটা সজোর ধাক্কায় পলের ঘুম ভেঙে গেলো ; পল চোখ মেলে তাকালো, কিন্তু চোখের উপরে রোদ এসে পড়ায় পরক্ষণেই সে আবার চোখ বুজলো ঐ সময়টুকুর ভিতরেই সে দেখতে পেলো একখানা পরিচিত মুখ ওর শায়িত দেহের উপরে ঝুঁকে রয়েছে। চকিতে বিগত দিনের সমস্ত ঘটনা ওর মনে পড়ে গেলো।

এই ওঠ! ওঠ!—বেজে উঠলো নারী কণ্ঠের সুর। পল চট করে উঠে পড়লো; দেখলো মেরিয়া অনুকম্পা ভরা উৎসুকে দৃষ্টি মেলে ওর মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে! চল আমাদের বাড়ী। হায় রে অভাগা! দেখ দেখি কোথায় শুয়ে পড়ে ছিলি! রাত্রে আমাদের বাড়ীতে গেলিনি কেন? প্রত্যুত্তরে পল কোন কথা বললে না। মেরিয়াকে আদৌ সে পছন্দ করতো না ; কারণ, তার লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ, ঝগড়াটে স্বভাব, বাদামী চোখ, কর্কশ কণ্ঠ, পুরুষোচিত চালচলন, সদা সন্দিগ্ধ মন, সব কিছু মিলে পলের মনে জাগিয়ে তুলতো এক সুগভীর বিতৃষ্ণা।

এখন শোন দেখি, এমনি করে আত্মহত্যা করে লাভ নেই। দেখবি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, ঈশ্বর আছেন মাথার উপরে, আর সংসারে ভালো লোকও আছে—ভাবিসনা একটা না একটা উপায় হয়েই যাবে। শুধু কথা হচ্ছে খুঁজে নেয়া চাই। সব কিছুর উপরেই ভালো করে নজর রাখবি—বুদ্ধি খাটিয়ে দেখবি কোনটা কি আর কোনটা কেমন। সংসারে মানুষের মতন হয়ে কি করে বেঁচে থাকতে হয় সেটা শেখা দরকার—যদিও সেটা খুবই শক্ত কাজ। সব সময়ই সবদিকে লক্ষ্য রাখতে হয় নইলে আজীবন বোকার মতন ঠকতে হয়। এতোদিন আরফির কাছ থেকে তুই কি পেয়েছিস?—না একটু যত্ন আত্তি, না কোন শিক্ষা। একজন জোয়ান লোকের সঙ্গে যেমন লোকে ব্যবহার করে থাকে সে তোর সঙ্গে ঠিক তেমনি ব্যবহার করতো। আরে ছ্যা! ছোট ছেলেদের মানুষ করার ঐ নাকি ধরণ? অমন করতে আছে কখনও? তুই হলি গে এক ফোঁটা একটা কচি বাচ্চা, তেমনি ব্যবহার করতে হয় তো! আর যদি সত্যি কথা বলতে হয় তো বলি সে ছিলো আস্ত একটা গণ্ডমূর্খ—বুদ্ধিশুদ্ধি বলে আদৌ ঘটে কিছু ছিলো না। সংসারে

থাকতে হলে দশজনার একজন হয়ে বেঁচে থাকতে হবে তো। তা না কেবল বই আর বই—দিন রাত বই মুখে নিয়েই বসে থাকতো। এমনি করে রাত দিন বই নিয়ে থাকাটা আবার কোন দেশী বুদ্ধি? মানুষ হয়ে যখন জন্মেছিস তখন দশ জনার মত হয়ে চলবি তো। সংসারে শক্ত হয়ে চলা, পাঁচজন লোকের কাছে মান্যগণ্য হওয়া—বই নিয়ে বসে থাকার চাইতে সেটা ঢের বড় কাজ। এগারো বছর ধরে পুলিশে চাকরী করেছে, কিন্তু কি রেখে গেছে শুনি?

মেরিয়ার কথা শুনতে শুনতে পল মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। যখন মেরিয়া মূর্খ বলে আরিফিকে গাল দিলো, তখন আর সহ্য করতে না পেরে পল মরিয়া হয়ে উঠে ওর কাপড় ধরে, একটা টান দিলো—যেন সে তার অভিভাবকের প্রতি এ ধরণের অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য জোর করে থামিয়ে দিতে চায়। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে মেরিয়া বলেই চললো: জীবনে কাউকে বিশ্বাস করবি না, বুঝলি? কেউ যদি তোকে আদর করে, জানিস সেটা মিথ্যা, ভান মাত্র; যদি কেউ তোর খুব প্রশংসা করে সেটাও জানিস বাজে, মিথ্যা; কিন্তু যদি কেউ গালাগাল দেয় বুঝবি সেটাই খাঁটী—এমন কি যদি খুব ভীষণ ভাবেও গাল মন্দ করে তবুও। আসল কথা হচ্ছে সবার সম্পর্কেই সাবধান হয়ে চলবি। কেউ কিছু বললে আগে ভালো করে ভেবে দেখবি, সত্যিই লোকটার কোনও কিছু মতলব আছে কি না—কিছু ধোকা দিয়ে বাগিয়ে নিতে চায় কি না তোর কাছ থেকে। যখন ঠিক বুঝবি যে তা নয়, তখন একটু এগোবি; কিন্তু তবুও খুব হুঁসিয়ার, খুব সতর্ক থাকবি। নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপরেও সব সময় বিশ্বাস করতে নেই ; যেমন একটা অজানা অচেনা লোকের সম্পর্কে হুসিয়ার থাকতে হয় তেমনি নিজের সম্পর্কেও সময়তে সাবধান থাকতে হয়; কারণ মানুষ সব সময়ে বুঝে উঠতে পারে না, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। হয় তো ভাবলো এইটাই ঠিক কিন্তু দেখা গেলো সেটাই একটা মস্ত বড়ো ভুল—একটা দারুণ গোলমেলে সমস্যার সৃষ্টি করে বসে আছে।

নিজের যুক্তি, নিজের কথার তোরে—আত্মবিস্মৃত মেরিয়া ভুলেই গেলো যে সে কার সঙ্গে কথা কইছে; বলতে বলতে এমনি একটা বিশেষ স্থানে এসে পৌছালো যে হঠাৎ তার সেকথা খেয়াল হ'লো :

তাছাড়া মেয়েদের সম্পর্কে আরও হুঁসিয়ার হয়ে চলবি।—মেরিয়ার দৃষ্টি হঠাৎ তার শ্রোতাটির মুখের দিকে পড়লো, ছোট ছোট পা ফেলে পল মেরিয়ার পাশে পাশে চলেছে; কিন্তু ওর পুরুষালী ঢং-এ দ্রুত চলার সঙ্গে তাল রেখে চলতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। পলের গায়ে সেই লাল সার্টটি, পায়ে জুতা নেই, বসন্তের দাগে ভরা করুণ মুখখানির উপরে রাত্রের নিদ্রার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। মাথার চুলগুলি উষ্ক-খুষ্ক— সবমিলে মেরিয়ার শক্ত সমর্থ বিরাট শরীরের কাছে ওকে মনে হচ্ছিলো দারুণ অসহায়।

হঠাৎ একটা উদ্‌গত কাশির ধমকে মেরিয়ার বক্তৃতার স্রোতে বাধা পড়লো। বাকী পথটা সে আর একটি কথাও বল্লে না। থানার ভিতরে ঢুকতেই দেখলো মিখেইলো একটা হাঁড়ী হাতে করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

এতোক্ষণে এলে: চমৎকার! সেই কখন খাবার সময় হয়ে গেছে, কোথায় ছিলিরে তুই? —পলের দিকে ঘুরে মিখেইলো বলে উঠলো ; রাত্রে কোথায় ঘুমিয়ে ছিলি?

ওখানে...ঘরের সামনে।

কি অদ্ভুত ছেলে বাবা!—বলেই মিখেইলো চিন্তান্বিত মুখে ওদের পেছু পেছু এসে ঘরে ঢুকলো।

মেরিয়া ইতিমধ্যেই তার গায়ের কোটটা খুলে ফেলে উনুনের আগুন উষ্কে দিতে আরম্ভ করেছে।

খানিকটা টাটকা মাখন পাওয়া গেছে, কোথায় রাখবো, এ্যাঁ?

পেলে কোথায়?—খুসীতে মেরিয়ার মুখখানা চক্‌চক্ করে উঠলো। মিখেইলোর হাত থেকে হাড়ী একরকম ছিনিয়ে নিয়েই সে হাড়ীর মুখে নাক ডুবিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগলো।

বুঝলে হে, একটা চাষার কাছ থেকে—একটু সামান্য দয়া দেখিয়ে—মিখেইলো বিশদভাবে বর্ণনা করে তারপর চোখ ঠেরে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে উঠলো।

ওরে দাঁড়কাক! পরম আহ্লাদে গলে পড়ে মেরিয়া স্বামীর ঘাড়ের উপরে সাদরে একটা চিমটি কাটলো।

উঃ! কি মেয়ে বাবা! খুব গৃহিণী বটে! এছাড়াও আর আছে, কিন্তু

এসো আগে খেয়ে নি! খুব ভালো করে খাওয়াও যদি তবেই বলবো।

আঃ বলো না!—মেরিয়া আগ্রহভরা একটি চটুল কটাক্ষ মিখেইলোর মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে মিখেইলো কতকগুলি খুচরো পয়সা বাজালো আর সঙ্গে সঙ্গে ওর পরিস্কার কামানো তেল চক্‌চকে মুখখানার উপরে ফুটিয়ে তুললো কপট গাম্ভীর্য।

কতো বলো না গো?—খুসী ভরা গদগদ কণ্ঠে মেরিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠলো।

এক টাকা আট আনা আর এক ঝুড়ি শশা...

মাত্র এই! আর কিছু নেই?—হতাশার সুরে মেরিয়া বল্‌লো—বুধবার কিন্তু এর চাইতে অনেক বেশী হয়ে ছিলো।

আর সে দিন ছিলো বুধবার আজ হোলগে তোমার শুক্রবার। মেলা—রোজ রোজ মেলা যেন লেগেই আছে। তাছাড়া জানো না তো, আজ সার্জেণ্ট কেরপেঙ্কো আমাকে সন্দেহ করেছিলো। চুলোয় যাক্‌ ব্যাটা হারামজাদা! বিয়ে করে দোতালা বাড়ী আর এক কাঁড়ি টাকা পেয়ে ব্যাটা ধর্মপুত্তুর হয়ে উঠেছে—যেন সদ্য পাড়া ডিমটি, কোথাও এতটুকুও ময়লার দাগ নেই! আমারও অমনি একটা বিয়ে করাই উচিৎ ছিলো!

তবেরে কুকুর! দাঁড়াও তোমাকে এই চিমটার সঙ্গে বেঁদিচ্ছি!

পল দোরের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে শুনছিলো ওদের কথা। তার মনে হলো, এখানে যেন সে নেহাৎই অবান্তর, অনাহূত—কোন প্রয়োজন নেই ওদের তার পানে ফিরে তাকাবার। পল ভাবতে চেষ্টা করলো ভবিষ্যতের কথা—অতঃপর কি হবে?—কিন্তু পারলো না।...

হঠাৎ এক সময়ে স্বামী-স্ত্রীর রহস্যালাপে বাধা দিয়ে বলে উঠলো: এক্ষুণি কি যাওয়া হবে সেখানে।

কোথায়? কোথায়?—মুহূর্তে মিখেইলো পলের দিকে ঘুরে তাকালো।

হাসপাতালে।

হাসপাতালে? হাসপাতালে কেন আবার? তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি? ঐ বেঞ্চটার উপরে গিয়ে বোস! এক্ষুনি আমরা খেতে বসবো। তারপর

আমাদের ছেলেরা স্কুল থেকে এলে তাদের সঙ্গে বাইরে বসে খেলা করবি।

পল বেঞ্চের উপরে গিয়ে বসে পড়লো। গভীর শোকে ওর অন্তর বার বার মুচড়ে মুচড়ে উঠ্‌ছে। আসপাশে কি যে ঘটে যাচ্ছে কিছুই যেন ও দেখচে না, শুনছে না, বুঝে উঠতে পারছে না। ওরা যখন ওকে খেতে ডাকলো, পল গিয়ে বসলো টেবিলে, কিন্তু কিছুতেই একটি গ্রাসও মুখে তুলে দিতে পারলো না। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে হাত থেকে চামচটা নামিয়ে রাখলো।

ও কি!—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মেরিয়া প্রশ্ন করে উঠলো।

একটুও খেতে ইচ্ছা করছে না আমার—শান্ত কণ্ঠে পল জবাব দিলো।

পুনরায় উভয়ের মিলিত কণ্ঠের উপদেশ পলের উপরে বর্ষিত হতে লাগলো। কিন্তু তাতে চর্বির মোটা সর পড়া বাঁধা কপির ঝোলের বড়ো পাত্রটা দ্রুত নিঃশেষ হওয়ার দিক থেকে এতটুকুও বাধাপ্রাপ্ত হলো না।

'পৌত্তলিক'—কথাটা বার বার ওর কানের ভিতর অদ্ভুত সুরে বেজে বেজে উঠছে আর মানসপটে ভেসে উঠছে আরিফির সেই ভয়ংকর মূর্তি—গাল দুটো ভেঙ্গে বসে গেছে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি—একখানা উন্মাদ বিকৃত মস্তিষ্কের মুখ।...পলের মুখখানা মুহূর্তে ছাইয়ের মতন সাদা হয়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার লাল হয়ে উঠলো; গায়ে গায়ে মেশা বসন্তের দাগগুলো যেন রক্তবর্ণ ছিটায় রূপান্তরিত হয়ে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করলো।

এই! তুই বিড়বিড় করে কি বকছিস রে ক্ষুদে শয়তান?—মিখেইলো অকারণেই ধমকে উঠলো তারপর উঠে দাঁড়ালো।

আমি চল্‌লুম।—দৃঢ়কণ্ঠে পল বলে উঠলো।

কোথায়?—রুষ্টকণ্ঠে মেরিয়া ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

যাচ্ছি আমাদের বাড়ী।

সেখানে আবার কেনো? সে ঘরে একজন নূতন সেপাই এসেছে, সে তোকে চেনেনা—দেখলে পরে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেবে'খন। এখানে চুপ করে বসে থাক।

পল বসে পড়লো। মিখেইলো পর্দার ওপাশে ঢুকে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ওর দেহের ভারে খাটটা করুণ সুরে মস্‌মস্‌ করে উঠলো।

পাখিগুলো কোথায়?—খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পল প্রশ্ন করলো। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেরিয়ার মুখের পানে তাকালো। সে আমি উড়িয়ে দিয়েছি—মশারির ভিতর থেকে মিখেইলো জবাব দিলো।—তাছাড়া ওখানকার সবকিছুই আমি এখানে নিয়ে এসেছি; তবেই বুঝতে পারছিস ওখানে তোর যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন নেই।

বাক্সটা কোথায়?—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পল আবার জিজ্ঞাসা করলো।

কিন্তু, ইতিমধ্যেই মিখেইলোর নাক ডাকতে শুরু করেছে; জানালার পাশে গিয়ে বসেছে মেরিয়া কি একটা সেলাই হাতে করে। বেঞ্চের একটা কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে পল পা গুটিয়ে বসলো।

এখন আমার কি হবে?—সে ভাবতে লাগলো।

পলের চোখের সামনে ভেসে উঠলো নদীর ছবি; স্রোতের বুকে ভেসে চলেছে তৃণখন্ড; ভাসতে ভাসতে কতোগুলো এসে ঠেকেছে উপকূলের গায়ে —আটকে গেছে। মনে পড়লো, কেমন করে সে আবার ঐ আটকে যাওয়া তৃণখন্ডগুলিকে স্রোতের মুখে ঠেলে দিত; ভেসে যাওয়া তৃণখন্ডগুলি অমনি করে আটকে গেলে পল আদৌ খুসী হতে পারতো না। সে চাইতো, অবিরাম গতিতে বয়ে বয়ে নদী যেথায় গিয়ে পেঁছাবে তার পথের শেষে, ওগুলোও ভেসে যাক সেই সুদূর চলার পথের শেষে। নদী কোথায় বয়ে যায়? অন্য একটা নদীতে গিয়ে মেশে তারপর সেই মিলিত ধারা গিয়ে বিলীন হয়ে যায় সাগরের বুকে। আরিফি বলেছিলো ওকে— সমুদ্র বিরাট, মহান্, অপার অনন্ত তার জলরাশি। তীরে দাঁড়ালে চোখ ঠিকরে যাবে কিন্তু তবুও তার পরপার দৃষ্টিগোচর হবে না; একদিন কিম্বা দু'দিন দাঁড়িয়ে থাকো তবুও তুমি তার ওপার দেখতে পাবে না। একি নিছক আরিফির কল্পনা? আরিফি পাগল! বরাবরই কি পাগল ছিলো সে? বেঞ্চের কোণে বসে বসে পল ভাবতে লাগলো আরিফির কথা, সমুদ্রের কথা। তার সমস্ত ভাবনা সমস্ত চিন্তা শেষ পর্যন্ত একটি যায়গায় এসে পেঁছালো—একটি মাত্র প্রশ্নে রূপ নিয়ে দেখা দিলো—কাল থেকে কি হবে?

চাপা কণ্ঠের ফিস্ফিস্ শব্দে পলের চিন্তার সূত্র কেটে গেলো। ওকে দেখে

মনে হচ্ছিলো যেন ঘুমাচ্ছে। পর্দার ওপাশে স্বামী-স্ত্রী তখন কথা বলছিলো:

বাক্সটা কোথায় জিজ্ঞাসা করছিলো—মেরিয়া বললো।

তারপর?—চমকে উঠে মিখেইলো প্রশ্ন করলো—কি ক্ষুদে বজ্জাত বাবা! —পুনরায় মিখেইলো বলতে শুরু করলো: শিগ্গির শিগ্গির ওটাকে স্যাভেলিচের কাছে রেখে আসা দরকার। নিশ্চয়ই জানতো যে বাক্সে টাকা ছিলো; খুব সম্ভব জানতো সে কথা। মেরিয়া, কালই তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে বিদেয় করে এসো। হাঁ সেই ভালো।

চুপ, ঐ দেখো গা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। কালই? এতো তাড়াতাড়ির কি আছে? ও নিজেই ঘাবড়ে গেছে। তুমি অত ভয় পেয়ে গেলে কেন?

বুঝলেনা কথাটা, কাল যদি হঠাৎ বলে বাক্সে টাকা ছিলো? তবে কি জবাব দেবো তখন?

তুমি একটি আস্ত গোবর গণেশ!—বিদ্রূপের সুরে মেরিয়া বলে উঠলো। তারপর ওরা এতো নীচু সুরে আলোচনা করতে লাগলো যে পল আর কিছুই শুনতে পারলো না।

দম্পতী যুগলের আলোচনায় পলের মনে নূতন কোনও ভাবান্তর হলো না। আগেই বুঝতে পেরেছিলো সে যে, ওরা তার সর্বস্ব ফাঁকি দিয়ে আত্মসাৎ করার চেষ্টায় আছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে সে ছিলো সম্পূর্ণ নির্বিকার, উদাসীন; কারণ পল তখনও জানতো না সংসারে টাকার সত্যিকারের প্রয়োজন কি আর শক্তিই বা কতোখানি। তাছাড়া আরিফির এই শোচনীয় আকস্মিক পরিণতি ওর মনকে এতদূর ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলো যে এ সব কিছুই তার তুলনায় ছিলো নেহাৎ তুচ্ছ, অকিঞ্চিতকর। সর্বোপরি ছিলো সেই রহস্যময় আগামী কালের দুঃশ্চিন্তা— যে অনাগত আগামী কাল ওর এতোদিনের সমস্ত পরিচিত জীবনের দোর রুদ্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য।

কোন দিনই পল মিখেইলো আর মেরিয়াকে দেখতে পারতো না; কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার সেই অশ্রদ্ধা যেন সহস্রগুণ তীব্র হয়ে উঠলো। পল অনুভব করলো যে ওরা তাকে চায় না কিম্বা আদৌ পছন্দও করে না। খুব ভালো করেই জানতো সে যে এদের সংসারে তার স্থান হবে না। পলের মনে হলো আর একটি দিনও সে সহ্য করতে পারবে না ওদের সাহচর্য।

স্বামী-স্ত্রীতে পাল্‌লা দিয়ে নাক ডাকতে শুরু করলো। কিন্তু পলের মনে হলো ওদের এ নিদ্রা কপট—ভান মাত্র। ওদের প্রতি একটা নিদারুণ ঘৃণা আর অবিশ্বাসে পলের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠলো।

বেঞ্চের কোণে চুপটি করে চোখ বুজে বসে পল ভাবতে লাগলো আগামী কালের কথা—অজ্ঞাত রহস্যময় আগামীকাল...

পর্দার ওপাশ থেকে অবিশ্রান্ত নাকডাকার শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। এলোমেলো চুল, কুঞ্চিত কপাল আর ঘুম ভাঙা চোখ মুখ নিয়ে মিখেইলো বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ালো, তারপর পলের দিকে তাকিয়ে বল্‌লো:

কি রে ঘুমিয়ে ছিলি?

না।

ছেলেরা ফিরে এসেছে স্কুল থেকে?

না।

'না'—ঐ একটিমাত্র কথাই তোর মুখে লেগে আছে, না? শোন, আমার মনে হচ্ছে ওরা সব গাঁয়ের ভিতরে ওদের পিসীর বাড়ী গেছে। চায়ের জল গরম করার সময় হলো; এক্ষুণি আমাকে আবার কাজে বেরুতে হবে...

মিখেইলো বারান্দার অপর দিকে চলে গেলো।

অলস মন্থর পায়ে মেরিয়া বিছানা থেকে উঠে এলো তারপর চুল বাঁধতে শুরু করলো। চুলগুলি ঘন, বাদামী রংয়ের।

কতো অল্প বয়েস ওর, একটিও চুলও পাকেনি এখনও—পল ভাবলো—কিন্তু আরিফির সব চুলই সাদা হয়ে গিয়েছে।

কি ভাবছিস পল? এখন কি করবি ঠিক করেছিস?—পলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মেরিয়া প্রশ্ন করলো। চিরুণীতে জড়িয়ে গিয়ে কয়েক গাছা চুল ছিঁড়ে যেতেই মেরিয়ার মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠলো।

আমি জানি না।—পল মাথা নাড়লো।

তার মানে? কে জা-নে তা-হ-লে?—মেরিয়া টেনে টেনে বল্‌লো। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ করে গেলো। পলও আর কোনও জবাব দিলো না। উভয়ের ভিতরে নেমে এলো এক অস্বস্তিকর নীরবতা। ফুটন্ত চায়ের কেট্‌লীটা নিয়ে মিখেইলো এসে হাজির হল।

আচ্ছা তবে শোন!—তৃতীয়বার চায়ের বাটিটা ভরে নিয়ে অবশেষে মেরিয়া বলতে আরম্ভ করলো। এতক্ষণে সে বেশ খানিকটা গরম হয়ে নিয়েছে; শরীরের অনাবৃত স্থানে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শোন! কথাগুলো ভালো করে মনে রাখিস—একান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে মেরিয়া বললো, তারপর অর্থপূর্ণভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বলতে শুরু করলো:

কাল তোকে নিয়ে গিয়ে আমাদের জানাশোনা এক মুচির কাছে রেখে আসবো; তার কাছে তুই কাজ শিখবি। খুব ভালো হয়ে থাকবি কিন্তু; দিনরাত কেবল চৈ-চৈ করে বেড়াবিনা, বুঝলি? কাজকর্ম করবি, শিখবি, মনিবের কথা শুনে চলবি, ব্যস্। তাহলেই একদিন মানুষ হয়ে উঠতে পারবি। প্রথম প্রথম একটু একটু কষ্ট হবে, কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে—ক্রমে দেখবি সবই সয়ে গেছে। তোর মতন ছেলে, যার তিনকুলে কেউ কোথাও নেই...হাঁ, ছুটি-ছাটার দিন, এই ধর যেমন আমাদের কাছে এলি—মানুষ যেমন যায় আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছে—খেলি-দেলি থাকলি এক আধদিন...বুঝলি? পল বুঝলো এবং মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলো যে সে বুঝেছে সব।

হাঁ, কিন্তু ভুলে যাসনে যেন কারা তোর জন্য এতোখানি করলো,—মানে আমাদের কথা যেন ভুলে যাসনে কখনও!—মিখেইলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলো—যেমন করে গুরুমশাই অবোধ ছাত্রকে তালিম দেয়; তারপর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে পলের মুখের পানে তাকিয়ে ওর ভাবভংগী লক্ষ্য করতে লাগলো। পল চোখ তুলে তাকালো, যেন সে বলতে চাইছে যে, কেনো ভুলে যাবো না তোমাদের কথা? কিছুক্ষণ তেমনিভাবে তাকিয়ে থেকে সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। পলের হাবভাবে বিশেষ কোনো উৎসাহের লক্ষণ দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে মিখেইলো প্লেটের ঢালা চায়ের উপরে জোরে জোরে ফু দিতে লাগলো।

ঘরময় নেমে এলো নিস্তব্ধতা। কোঁচকানো ভ্রূর তলা দিয়ে পল দম্পতি-যুগলের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। হঠাৎ ওর মনে হলো এমন কিছু একটা করা দরকার যাতে করে ওরা বেশ খানিকটা বিব্রত, খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কিন্তু, কি করা যায় প্রথমটায় সে ভেবে উঠতে পারলো না; পরক্ষণেই

মনে হল বাক্সটার কথা।

বাক্সটা কোথায়?—আচম্বিতে পল প্রশ্ন করলো।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকলো।

বাক্সটা আমাদের কাছেই আছে। ওটার জন্যে তোর অতো ভাবনার কোন কারণ নেই। এখানে তোর বাক্সটা খুব নিরাপদেই থাকবে, খোয়া যাবে না। যখন তুই বড়ো হবি তখন এসে বলিস, আমার বাক্সটা দাও, তক্ষুণি আমি দিয়ে দেবো। ঐ দেখ, ঐ তোর বাক্স, কেউ ছোঁয়নি ওটা। হাঁ, হাঁ, আর সব জিনিষ পত্তরই ওটার ভিতরে আছে—ঠিক যেমনটি ছিলো, তেমনি; তোর প্যাণ্ট, সার্ট, সব...অবশ্য ইচ্ছা করলে সেগুলো এখনও তুই নিয়ে নিতে পারিস।

মিখেইলোর বক্তৃতা থামলো। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে চুপ করে গেলো তারপর দাঁড়িগোঁফ কামানো তেলতেলে মুখখানার উপরে একটা বিষাদের ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো।

মেরিয়া এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, সে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে ছিলো।

কিন্তু বাক্সে যে টাকা ছিলো সেগুলো কোথায় রেখেছো? ধীর শান্ত কণ্ঠে পল প্রশ্ন করলো।

টাকা?—মিখেইলো স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠলো; কণ্ঠে নিদারুণ বিস্ময়ের সুর; চকিতে ওর দৃষ্টি মেরিয়ার দিকে পড়লো:

ওগো, শুনছো? টাকা ছিলো নাকি? অ্যাঁ? বাক্সে টাকা ছিলো? কৈ আমি তো কোন টাকাকড়ি দেখিনি বাক্সের ভিতরে! না, কিছুতেই আমি বলতে পারবো না যে তোর বাক্সে টাকাকড়ি দেখেছি বলে! যদি দেখে থাকি তবে ঈশ্বর যেন—যেন আমাকে মেরে ফেলেন!

দিব্যি কাটছো কেন বেকুবের মতন! কি, হয়েছে কি? কেউ বলেছে নাকি যে তুমি মিছে কথা বলছো? বুড়ো হাবড়া কোথাকার! দেখেনি ব্যস্ দেখোনি—ফুরিয়ে গেলো! ঈশ্বরের দোহাই পাড়ছে, দেখো না!

আমি তো ঈশ্বরকে সাক্ষী মানলম শুধু! তাতে কি কোন দোষ আছে?

শাস্তরে বলে, মিছামিছি ঈশ্বরের নামে দিব্যি গালতে নেই—

কিন্তু এতো আর মিছামিছি নয়। আমি যা বলেছি তার প্রমাণ দেবার জন্যেই দিব্যি গেলেছি।

পল ওদের হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগলো, ওর প্রশ্নে মিখেইলো ভীষণ বিব্রত অবস্থার ভিতরে পড়ে গেছে; কি করে এই কঠিন অবস্থার ভিতর থেকে উত্তীর্ণ হবে, কিছুতেই যেন তার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। মেরিয়া পুনরায় তেমনি নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাব নিয়ে বসে রইলো।

দারুণ চটে গিয়ে পল বলতে আরম্ভ করলো:

বাক্‌সে সতেরো টাকা আট আনা ছিলো; তাছাড়া তোমার কাছে পাওনা আছে আরও পঁয়ত্রিশ টাকা, আরিফি কাকা আমাকে বলে গেছে আর খুব বেশী দিন আগেও বলেনি।

অবাক বিস্ময়ে পল দেখলো, দু'জনে একই সঙ্গে হোঃ...হোঃ...করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। প্রবল হাসির ধমকে মেরিয়ার মাথাটা পিছনে হেলে পড়েছে, পীনোন্নত বুকখানা দ্রুত তালে ওঠানামা করছে আর সর্বাঙ্গ পুরুষালী ঢঙে বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাসতে হাসতে মিখেইলোর গলা বুজে এলো। ওর কম্পিত দেহ মুচড়ে কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট আওয়াজ গলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। পল কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। অবাক হয়ে ওদের পানে তাকিয়ে রইলো; কেমন যেন একটা অপ্রস্তুত বোকা হাসি জেগে উঠলো ওর ঠোঁটের কোণে—যেন ওদের ঐ অট্টহাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে হেসে ওঠা উচিত কিনা সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না।

মাইরি! কি অদ্ভুত! ঐ আরিফি! পঁয়ত্রিশ টাকা! নিশ্চয়ই একটা মনগড়া হিসাব দিয়েছে!—প্রবল হাসির ফাঁকে ফাঁকে মিখেইলো বলতে লাগলো।

তুই দেখছি নেহাৎই একটা কচি খোকা! আরিফি বলেছে আর অমনি তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস তার কথা! কি আশ্চর্য!

পাগল! পাগল! সে যে পাগল হয়ে গেছে, তাও বুঝতে পারিসনি বোকা!—হাসি থামলে পর ঠাট্টার সুরে মেরিয়া বললো।

মিথ্যা কথা। দুজনেই তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। ভাবছো, তোমরা

বিছানায় শুয়ে শুয়ে যা বলেছ তা আমি শুনিনি, না? সব শুনেছি। চোর, তোমরা চোর! দুজনেই তোমরা চোর! বুঝেছি তোমরা চোর!—দারুণ উত্তেজনায় পল সজোরে টেবিলের উপরে একটা লাথি মারলো। মিখেইলো চমকে উঠলো— দারুণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো সে, তারপর ভীত বিস্ফারিত দুটো চোখের অসহায় দৃষ্টি মেলে মেরিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ধপ করে বেঞ্চটার উপরে বসে পড়লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মেরিয়া এমন এক কাণ্ড করে বসলো যে বোঝাগেলো মেরিয়ার উপস্থিত বুদ্ধি ঢের বেশী তীক্ষ্ম।

তবেই সেরেছে!—যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে এমনি একটা ভাব করে মেরিয়া এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। উত্তেজিত পল বিবর্ণমুখে পুনরায় তার নিজের জায়গায় বসে পড়লো; রাগে তার চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে।

হা আমার ঈশ্বর! এখনও তুমি চুপ করে বসে আছো বোকার মতন! শিগ্গির ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনোগে, যাও! যাও, ছুটে যাও! জল্দি! ছেলেটাও উন্মাদ হয়ে গেলো গো। দেখো, দেখো, ওর চোখ দুটো কিরকম লাল হয়ে উঠেছে—যেন জ্বলছে। হা ঈশ্বর! হা ভগবান! বিনা মেঘে এমন বজ্র পাতও হয়! নিশ্চয়ই এ কোন কঠিন পাপের শাস্তি। হায়রে অভাগা! বুঝিবা ছেলেটা আরিফির শোক সহ্য করতে পারলেন গো! পাগল হয়ে গেলো! ঘোর উন্মাদ!

প্রবল উত্তেজনা সত্ত্বেও পল বুঝতে পারলো, তাকে বোকা বানাবার একটা হীন অপকৌশল শুরু হয়েছে। রাগে, দুঃখে, হতাশায় সে কেঁদে ফেল্লো। হঠাৎ পলের মনে হলো, এই সংসার, এইসব লোক—এদের সঙ্গে কিছুতেইতো সে কোনদিনও পেরে উঠবে না।

সংসারের বুকে সম্পূর্ণ সংগীহীন, নিরাশ্রয় হবার পর, এই প্রথম ওর দুচোখ ছাপিয়ে নেমে এলো জলের ধারা।

পলকে ওরা ভয় দেখালো বটে, কিন্তু সত্যি সত্যিই কোন ডাক্তার ডেকে আনলো না। ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত দুজনে মিলে পলের পরিচর্যায় লেগে রইলো; যে কোণটিতে বসে পল সারাটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে সেই কোণেই বিছানা পেতে ওরা তাকে শুইয়ে দিলো। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে

পল শুনতে পেলো মেরিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে: যতোটা বোকা মনে হয়েছিলো, ছেলেটা ততো বোকা নয়; তাছাড়া জিভেও বেশ ধার আছে। অবশ্য সেটা খুবই ভাল সন্দেহ নেই—দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারবে...

পল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলো—ভয়ংকর ভয়ংকর সব দৈত্য চারিদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরেছে; বিরাট তাদের দেহ, বিকট মূর্তি, কুৎসিত কিম্ভুত-কিমাকারদর্শন। কতগুলো আবার রোগা লিক্‌লিকে বেঁটেখাটো চেহারা। দাঁতে দাঁত কড়মড় করে ওরা সব পলের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসছে; ওদের সেই বিকট অট্টহাসির শব্দে সব কিছু ঝন্‌ঝন্‌ করে কেঁপে উঠছে। নিদারুণ ভয়ে পলের অন্তর আত্মা শুকিয়ে উঠলো—কাঁটা দিয়ে উঠলো সমস্ত গায়ে। চোখ মেলে পল আকাশের দিকে চাইলো; কোথায় আকাশ? আকাশের পরিবর্তে এক বিরাট কালো মহাশূণ্য—আর সেই অসীম অনন্ত মহাশূণ্যের ভিতর থেকে কখনও দলে দলে কখনও একা একা সেই ভয়ংকরমূর্তি দৈত্যগুলো নেমে আসছে; বিভৎস মূর্তি, ভয়ংকর মুখ, তবু যেন ওরা মহোল্লাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে...

ভোরে পলের ঘুম ভাঙলো; মেরিয়া ওকে চা এনে দিলো তারপর চললো তার সেই পরিচিত মুচির কাছে। একান্ত নির্বিকারভাবে পল ওর সঙ্গে সঙ্গে চললো। কারণ, সে বুঝতে পেরেছিলো ভবিষ্যতের গর্ভে কোন সুখ, কোন আনন্দই সঞ্চিত নেই ওর জন্যে—সম্পূর্ণ নির্ভুল পলের এ অনুভূতি।

নীচু ছাদওয়ালা ছোট্ট একটা ঘরে মেরিয়া ওকে নিয়ে এসে হাজির হলো। ঘরের ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরে আছে আর তারই ভিতরে বসে চারটি লোক হাতুড়ী ঠোকার তালে তালে গুণ গুণ করে সুর ভাঁজছে। বেঁটে মোটা লোকটির সঙ্গে মেরিয়া কি যেন খানিকক্ষণ কথা বললো ; প্রত্যুত্তরে লোকটা দুলতে দুলতে বলে উঠলো:

এ জায়গাটা বুঝলে কিনা, কেবল মাত্র ভালো নয়, স্বর্গ...স্বর্গ! তাছাড়া খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা অতি চমৎকার...সবকিছুই চমৎকার...আচ্ছা এসো তবে নমস্কার!

মারিয়া চলে গেলো। পল মেঝের উপরে বসে জুতা খুলতে আরম্ভ করলো; কি যেন ঢুকেছে জুতার ভিতরে, লাগছে পায়ে। হঠাৎ ওর পিঠের উপরে

কি একটা বস্তু এসে পড়লো; এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো পুরানো জুতার একটা গোড়ালী ওর গায়ে লেগে ঠিকরে পড়েছে মেঝের উপর। দোরের পাশে ওরই সমবয়সী একটা ছেলে—কুৎসিত মুখ। ছেলেটা জিভ বের করে ভেংচি কেটে বলে উঠলো:

মুখ ময় দাগ আর খ্যাঁদা নাক
শয়তান ফেরে সাথে যেথায় সে যাক—

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো তারপর নিঃশব্দে আপন মনে জুতা খুলতে লাগলো।

এদিকে এস তো ভাই—একজন কারিগর ডাকলো পলকে। পল তার কাছে এগিয়ে গেল।

এইটা ধরো দেখি—লোকটি একখন্ড কালো মিসমিসে মোম মাখানো চামড়ার একটা দিক পলের হাতের ভিতরে গুঁজে দিলো; এমনি করে দোমড়াওতো খোকা! খুব জোরে!

গম্ভীর মুখে পল ঘরের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চামড়াটা দোমড়াতে লাগলো।...

এমনি করে পল মজুর দলে ভর্তি হয়ে গেলো। দোকানের মালিক মিরণ টোপোরকভ; মোটা সোটা গোল-গাল চেহারা, শুয়োরের চোখের মতন কুঁতকুঁতে ছোট্ট দুটি চোখ আর মাথাভরা বিরাট টাক। খুব খারাপ নয় লোকটা; নরম স্বভাব, জীবনটাকে হেসে খেলে কাটিয়ে দিয়ে এসেছে এতাবৎকাল। লোক চরিত্রের দোষ, ত্রুটি দুর্বলতা সে ক্ষমার চক্ষেই দেখে আর হাসি, ঠাট্টা, কৌতুক এই নিয়েই থাকে সব সময়। এককালে সে যে খুব ধর্মগ্রন্থ পড়েছিল সেটা তার কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু ইদানিং মদের বোতলের লেবেল ছাড়া ছাপার অক্ষরের সঙ্গে আর তার তেমন কোন যোগাযোগ নেই। একটু আধটু পান করার পরে কারিকরদের সঙ্গে সে ঠিক ইয়ার বন্ধুর মতনই ব্যবহার করে; কিন্তু যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে মেজাজটা তখন থাকে একটু মিঠে-কড়া গোছের। অবশ্য খুব কমই সে তার কর্মচারীদের অভিযোগ করার সুযোগ দিত আর খুব কম সময়ই থাকতো কারখানায়। বেশীরভাগ সময়ই কাটাতো মদের বোতল নিয়ে। কারখানার সমস্ত ভার ছিলো

ঠাকুর্দা উট্‌কিনের উপর। উট্‌কিন প্রাক্তন সৈনিক ; একটা পা কাঠের ; লোকটি যেমন স্পষ্টবক্তা তেমনি হুকুম আর আনুগত্যের দারুণ ভক্ত।

ঠাকুর্দা উটকিন ছাড়াও দোকানে আরও দুজন সহকারী কর্মচারী ছিলো —নিকান্ডার মিলোভ আর কোল্‌কা সিস্‌কিন। নিকান্ডার মিলোভের চুলগুলো ছিলো আগুনের মতন লাল আর স্বভাবটাও ছিল দুর্দান্ত—সব সময়েই সে মদে চুড়চুড়ে হয়ে থাকতো আর গাইতো গান। খুব ভালো করেই জানতো যে, যখন সে তার সবুজ চোখ দুটো তেরছা করে ভ্রূ-কুঁচকে তাকায় তখন তার মুখখানা সুন্দর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় সহকারীটি ছিলো রোগা, ফ্যাকাশে, ভগ্ন স্বাস্থ্য ; ওর স্বভাব চরিত্র যেমন নোংরা তেমনি জঘন্য। যখন সে খুব অন্তরঙ্গভাবে কারুর সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা বলতো, তখনকার মত সে তাকে পারতো স্ব-মতে টানতে; কিন্তু পরক্ষণেই অতি অপ্রত্যাশিতভাবে নিষ্ঠুর আঘাত করে তাকে দূরে ঠেলে দিতো। কাজে লাগার দ্বিতীয় দিন থেকেই পল কোল্‌কাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো। দোকানে আরও একটি ছেলে ছিলো, নাম আরটিউস্কা।

অনতি বিলম্বেই আরটিউস্কা পলের পেছনে লাগতে শুরু করলো। ক্রমে একদিন সেটা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরিণত হলো। পলের হাতে বেদম প্রহার খেয়ে আরটিউস্কা অবাক হয়ে গেলো। এক সপ্তাহ ধরে নানানভাবে সে ফন্দি আঁটতে লাগলো, কি করে প্রতিশোধ নেয়া যায়। কিন্তু যখন দেখলো যে তার সমস্ত প্রচেষ্টাই পলের নীরব ঔদাসীন্যের কঠিন আবরণের গায়ে লেগে পিছলে পড়ে গেলো তখন একদিন সে এলো ওর কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। আমি বলছিলাম কি—এই বসন্তের দাগওয়ালা—বুঝলি! আয় আমরা মিটমাট করে ফেলি—আরটিউস্কা বল্‌লো,—যা হবার তাতো হয়েই গেছে! তাছাড়া তুইতো আমাকে মেরেছিস বেশী; কারণ তোর গায়ে এখনও জোর আছে: কয়েক দিন থাক এখানে দেখবি আপনা থেকেই ঝরে গেছে; তখন আমিও তোকে ধরে খুব মারবো। কেমন? রাজী আছিস তো?—বলেই আরটিউস্কা পলের দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো; কোন কথা না বলে পল ওর হাতটা নিজের হাতের ভিতরে গ্রহণ করলো।

কিন্তু তবুও তোর জানা উচিৎ যে তুই এখানে সব চাইতে শেষের ভর্তি;

একথাটা কিন্তু তোর মনে রাখা দরকার। সবার চাইতে ছোট যখন তখন তোরই উচিৎ যতো সব নোংরা কাজগুলোর ভার নেওয়া। বুঝেছিস? রাজী তো?

পল ওর কুৎসিত মুখখানার দিকে নীরবে একবার তাকালো তারপর রাজী হয়ে গেলো ওর প্রস্তাবে।

বেশ, বেশ, এই তো চাই—বিস্মিত আরিটিউস্কা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। —এই তো লক্ষ্মী ছেলে! তাহলে কথা হচ্ছে, এখন থেকে তুই দোকানঘর ঝাঁট দিবি, জল গরম করবি, কাঠ কাটবি, উনুন ধরাবি আর বারান্দা পরিস্কার করবি, কেমন?

আর তুই কি করবি?

আমি? কি অদ্ভুত ছেলে রে তুই! আমার আরো ক-তো কাজ আছে! তোর চাইতে ঢের ঢের বেশী কাজ।

এমনি করে কাজের ভাগ করে নিয়ে আরটিউস্কা তার সমস্ত কাজের বোঝা পলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পাঁচদিন কেটে গেলো; হাসি মুখে আরটিউস্কা দেখতে লাগলো কেমন করে তার চালাকীর ফাঁদে পড়ে পল রোজ খেটে খেটে গলদঘর্ম হয়ে উঠছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠাকুরদা উট্‌কিনের দৃষ্টি এড়ালো না। আরটিউস্কাকে কাছে ডেকে জুতা তৈরীর সাজটা দিয়ে সজোরে ওর মাথার উপরে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বললো: ব্যাটা শয়তান! ভেবেছিস তুই বড্ডো চালাক, কিন্তু তা মোটেও না বুঝলি? পরে ওকে কাজ ভাগ করে দিয়ে পলকে ডাকলো। তাকে বোকা বেকুফ বলে খুব খানিকটা গাল মন্দ করে তাকেও দিলো নির্দিষ্ট কাজের ভার।

সে দিন থেকে পল ও আরটিউস্কার কাজ হলো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। যতো সব ছোট নোংড়া কাজের ভার পড়লো পলের ভাগে—যেগুলোর সঙ্গে মুচির ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই; আর আরটিউস্কার স্থান হলো চোঙের সামনে। ক্রমে সে জুতা তৈরীর রহস্য আয়ত্ব করতে লাগলো। ফলে, আরটিউস্কা পলের উপরে কর্তৃত্ব খাটাবার আরও বেশী সুযোগ পেয়ে গেলো যখন তখন উপরওয়ালার মতনই সে পলকে ধমকাতে আরম্ভ করলো।

অনেকদিন কেটে যাওয়ার পর পলের খেয়াল হলো কি ধরণের কাজের

ভাগই না করেছে ঠাকুর্দা উট্‌কিন। সবই রয়ে গেছে সেই আরটিউস্কার ব্যবস্থা মতন, তবুও বাহাদুরী করে ঠাকুর্দা বলতো—ব্যবস্থাটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব—মৌলিক।

আরিফির কুটিরের সেই শান্ত, নির্জন, নিস্তব্ধ পরিবেশের পরিবর্তে এখানকার হৈঃহল্লা, গালাগালি, হট্টগোল, তামাকের ধোঁয়া, চামড়ার দুর্গন্ধ—সব মিলে পলের ভীষণ অসহ্য মনে হতো। দিনভোর একা একা, নয়তো আরিফির নীরব সহচার্যের বদলে চার চারজন কারিগরের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে পলের অভ্যাস হতে লাগলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের গান গাওয়া আর এমন সব বিষয়ের আলাপ আলোচনা চলতো, পল যার আদৌ কোন মানেই বুঝে উঠতে পারতো না; পরক্ষণেই ওরা পরস্পরের দিকে চোখ ঠেরে শুরু করতো হাসা হাসি আবার পর মুহূর্তেই অশ্লীল অশ্রব্য ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে এমনভাবে করতো আক্রমণ যা শুনতে পেলে আরিফি তক্ষুণি সবকটাকে ধরে থানায় চালান করে দিতো। পল তার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের একটু ঈর্ষার চোখেই দেখতো। ওদের ভাষা, ওদের কথা তার হৃদয়ঙ্গম হতো না তাই আবার একটু ভয়ে ভয়েও থাকতো। পলের হাব ভাব দেখে ওরা হাসতো, ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। মাঝে মাঝে ওদের হাসি তামাশা এমন পর্যায় এসে পৌঁছাতো যে পলের দুটো চোখ ঠিকরে প্রতিহিংসার তীব্র শিখা চক্‌চক্‌ করে উঠতো; ওরা তাতে আরও মজা পেতো। ক্রমে পল ওদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে লাগলো।

প্রায়ই ওরা পলকে ডেকে কাছে বসিয়ে শোনাতো তার জন্ম বৃত্তান্ত কেমন করে বসন্তের দাগওয়ালা একটা ছেলেকে একদিন পথের ধারে বেড়ায় পাশে কুড়িয়ে পাওয়া গেলো। মালিকের কাছ থেকে ওরা শুনেছিলো পলের জন্ম-বৃত্তান্তের সেই কালো অধ্যায়। মাঝে মাঝে সেই কথা ওরা নানান অলংকারে ভূষিত করে এমনভাবে রং চড়িয়ে বলতে আরম্ভ করতো যে, পলের মনে হতো কে যেন তাকে হাত পা বেঁধে তপ্ত কড়ার ভিতরে ছেড়ে দিয়েছে। কখনও কখনও ওরা মানবজীবনের একান্ত গোপন একান্ত অনাবৃত অশংগুলি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে বলতো যে পল তাদের ঐ ইতর আলোচনায় মনে মনে দারুণ আহত হতো। ইতিপূর্বে আর কোন দিনও পল ঐ সব

বিষয়ের আলোচনা শোনেনি আর জানতোও না কোন কিছুই। যখন ওরা তার বাপ মার আকৃতি, প্রকৃতি, কাজকর্ম, প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণনা করতে আরম্ভ করতো পলের অন্তরে দারুণ আঘাত লাগতে—ছোট্ট বুকখানা মুচড়ে কান্না ফেনিয়ে উঠতো। বারবার ঐ একই প্রসংগের পুনরাবৃত্তিতে পলের অন্তরে বিক্ষোভ তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। কুৎসিত বসন্তের দাগে ভরা মুখখানা রাগে দুঃখে হিংস্র আকার ধারণ করতো। পলকে নিয়ে এমনি করে প্রাণভরে নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করার পর ওরা তাকে মুক্তি দিতো আর পর মুহূর্তেই ওর কথা ভুলে যেতো বেমালুম। কিন্তু যতক্ষণ ধরে ওকে নিয়ে চলতো নির্মম পরিহাস পল একটি কথাও বলতো না, কেবল অন্তরে অন্তরে একটা নিদারুণ বিজাতীয় বিদ্বেষ ধূমায়িত হয়ে উঠতো। ক্রমে পল আরও মৌন আরও নীরব হয়ে উঠলো। সব সময়েই ভ্রূ-যুগল কুঁচকে গম্ভীর হয়ে থাকার ফলে ওর কপালের মাঝখানে ফুটে উঠলো গভীর বলিরেখা। কপালের মাঝখানের ঐ সুগভীর বলিরেখা, সদা গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ, আনত মস্তক আর তীব্র দৃষ্টি—সব মিলিয়ে ওকে ওরা নাম দিলো অকালবৃদ্ধ। কেউই পলের উপরে খুসী ছিলো না। সবাই ভাবতো, পল ভীষণ স্বার্থপর। অবশেষে ওদের সন্দেহ হলো যে, নিশ্চয়ই পল একদিন সাংঘাতিক কিছু একটা করে বসবে।

নিকান্ডার একদিন মন্তব্য করলো যে, নিশ্চয়ই 'অকালবৃদ্ধ' এর আগে কখনও কাউকে খুন করে থাকবে এবং আবারও খুন করার জন্য মনে মনে মতলব আঁটছে। আর তা যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই রাঁধুনী সিমেনোভনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কোলকা সিস্‌কিন তার এ মন্তব্য সমর্থন করলো। সে বললো যে, 'অকালবৃদ্ধ' আসলে হচ্ছে একটা ভীষণ অহংকারী ছেলে; নিয়ম করে কিছু-দিন ধরে রোজ ওকে চাবকাল তবে ঠিক হবে। আরটিউস্কা বাৎলালো আর একটা দাওয়াই। সে বললো—অকালবৃদ্ধের পায়ের গোড়ালী চিরে তার ভিতরে খানিকটা শোরের কুঁচি ঢুকিয়ে দাও দেখবে তাহলে দিনরাত ও কেমন মনের আনন্দে নৃত্য করতে থাকবে।

ঠাকুর্দা উট্‌কিন ওদের সব মন্তব্য শুনলো তারপর ধমকে উঠলো:

তবে রে কুত্তার দল! ছেলেটা আপন মনে কাজ করে যায়, কেন তোরা ওর পেছনে লাগিস? ও যদি দিনরাত তোদের মতন বাজে বক্‌বক্‌ না করে তো

তোদের তাতে কি? কি ক্ষতিটা হচ্ছে তোদের শুনি? ছেলেটা গম্ভীর প্রকৃতির, সাচ্চা ছেলে।

তারপর উট্‌কিন তার রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের গল্প বললো, সেও ছিলো অমনি অল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির লোক; কেমন করে একদিন মাছের কাঁটা গলায় আঁটকে সে মারা গেলো...

এক সপ্তাহের ভিতরেই সব ক'টি কারিকরের মনে পলের সম্পর্কে একটা বিশ্রি বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো। পলও যে সেটা অনুভব করতে পারলো না তা নয়, কিন্তু সে জানতো যে, এমন কিছুই তার করবার নেই যাতে করে তার সম্পর্কে ওদের ঐ ধারণা বদলে দিতে পারে। বস্তুতঃ সেটা ছিলো ওর সাধ্যাতীত।

পলকে যা কিছুই করতে বলা হতো, নীরবে সুচারুরূপে তক্ষুণি সে কাজটি সুসম্পন্ন করতো। দৈবাৎ কখনও যদি ওরা কেউ অহেতুক অনুকম্পা-বসতঃ ওর সঙ্গে একটু সহানুভূতির সুরে কথা বলতো, কেবলমাত্র তখনই পল জবাব দিতো দু'একটা কথার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ফল হতো এই যে ওরা তাতে আরও অসন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় ওকে ঠাট্টা বিদ্রূপে অতিষ্ঠ করে তুলতো। ক্রমে পল বুঝতে পারলো যে ওদের দরদমাখা কথার অর্থ হচ্ছে ওকে ফাঁদে ফেলে আরও বেশী করে ঠাট্টা বিদ্রূপের ক্ষেত্র তৈরী করা। তার পর থেকে পল ওদের প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে আরও সন্দিহান হয়ে উঠলো।

এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। ক্রমে পলের মনে ধারণা হলো যে, সে সবার চাইতে স্বতন্ত্র; কারণ, তার সঙ্গে ওদের ব্যবহার সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। ক্রমে পলের মনের সন্দেহও ফিকা হয়ে এলো। কারখানার সবাই ওর গম্ভীর নীরবতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলো; ওর প্রতি তাদের নির্মম আচরণের সুতীক্ষ্ণ খোঁচাও ধীরে ধীরে ভোঁতা হয়ে এলো; কিন্তু তবুও ওর অবস্থার কোনই পরিবর্তন হলো না।

নীরব নত মুখে পল কাজ করে চলে। গালমন্দ, মার, কিল, চর, লাথি, সব কিছুই সমানভাবে ওর উপরে বর্ষিত হতে লাগলো; পলও ক্রমে ওদের এই ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। ঐ নোংরা ধোঁয়াটে ঘর আর দুর্জন

প্রকৃতির ঐ সব লোক—এদের কাছ থেকে অন্য কোন রকম ব্যবহারই পল কখনও কল্পনাই করতে পারতো না।

রবিবার ছুটির দিন। একখানা কালো রুটী জামার পকেটে লুকিয়ে নিয়ে পল বেরিয়ে পরতো। বারতিনেক শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখার পর শহর সম্পর্কে পল আর কোনও আকর্ষণ অনুভব করতো না। তারপর থেকে সে যেতো টোপেরকভয়ের পরিত্যক্ত বাগানে। ঐ বাগানের ভিতরে স্নানের ঘরের পিছনে ছিলো চমৎকার একটা খাদ। খাদের তলায় পুরু ঘাসের কোমল আস্তরণ। নীচে নেমে গিয়ে পল সেই ঘাসের উপরে চিত হয়ে শুয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো। গাছের পাতায় পাতায় জেগে উঠতো বাতাসের মর্মর ধ্বনী—থলো থলো ফুটন্ত বনফুলের বুকে লুব্ধ মৌমাছির অবিশ্রান্ত গুন্‌গুণানী। এখানথেকে পল শিখলো চিন্তা করতে।

কারখানা পলের কাছে অর্থহীন—যেন একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। এত-টুকুও আগ্রহ নেই ওর সেই প্রহেলিকার রহস্য ভেদ করার। এইখানে এই খাদের ভিতরে এলে পরে ওর কারখানা জীবনের প্রত্যেকটি দিনের খুঁটিনাটি ভিড় করে এসে ভেসে উঠতো ওর মানসপটে—সোম থেকে শনি এই ছ'টি কর্মব্যস্ত দিনের প্রত্যেকটি ঘটনা। এমনি একদিন কারখানা জীবনের কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ ওর মনে একটি প্রশ্ন রূপায়িত হয়ে উঠলো: আচ্ছা, এসবের প্রয়োজন কি? কেন আমরা অন্যের জন্য জুতা তৈরী করবো আর নিজেরা চলবো খালি পায়ে? কেনই বা আমরা ঠাকুর্দা উটকিনের মতন মদ খেয়ে খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকবো? কোল্‌কার মতন খেলবো জুয়া? কেন আমরা ঘুরে বেড়াবো মেয়েদের পেছু পেছু? তারপর নিকান্ডার মতন সোমবার এসে তিক্ত পরিহাসের সুরে গল্প করবো, কোনও একটি মেয়ের সঙেগ রোমাঞ্চকর মিলনের কাহিনী কিম্বা মেয়েটির সংগী অথবা পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে আসার চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত? কেনই বা আমরা কাজ করি আর উপার্জনের পয়সা তাড়ি-মদ খেয়ে উড়িয়ে দেই? কেন?

পল ভাবলো, যদি আরিফি ভালো থাকতো, নিশ্চয়ই সে তার প্রশ্নের সমাধান করে দিতে পারতো। কিন্তু আরিফি পড়ে রয়েছে হাসপাতালে।

ইতিমধ্যে পল দুবার গিয়েছিলো হাসপাতালে আরিফিকে দেখতে; প্রথম-বার কর্তৃপক্ষ ওকে হাসপাতালে ঢুকতে দেয়নি; পরের বার তারা ওকে জানিয়ে দিলো যে, কোন দিনও আরিফির আর ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই; সুতরাং পলের পক্ষে বার বার তাকে দেখতে ছুটে আসার কোনই প্রয়োজন নেই বরং এলে পরে সেটা রোগীর পক্ষে আরও ক্ষতিকর হতে পারে। অবাক হয়ে পল শুনলো তারপর বিস্ফারিত শূণ্য দৃষ্টি মেলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ডাক্তারের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো—আর কোন প্রশ্ন করার কথাও সে সম্পূর্ণ ভুলে গেলো। ভরাক্রান্ত হৃদয়ে পল ফিরে এলো।

পল মনে মনে স্থির করলো আর কোন দিনও সে মিখেইলোর বাড়ী যাবে না; কারণ সেখানে ওর জন্য এমন কোন বস্তু সঞ্চিত হয়ে নেই যেটা ওর পক্ষে আনন্দদায়ক।

পলের একঘেয়ে দিনগুলো গড়িয়ে চললো। দুঃখ করারও কিছু নেই আবার আনন্দ করার মতনও কোন প্রেরণা পায় না সে কোথাও। কেবলমাত্র কতগুলো ধূসর চিন্তার মেঘে ওর চিত্তাকাশ ভরাক্রান্ত করে তোলে। সময় সময় ঐ চিন্তার ধারা এমন সব অবাস্তব রূপ নিয়ে এসে হাজির হয় যে বাস্তব জীবনের সংগে কোথাও তার এতোটুকু মিল, এতোটুকুও সংগতি থাকে না।

আপন গতিপ্রবাহে জীবন বয়ে চলে; একটি একটি করে অতিক্রান্ত হয়ে যায় মানুষের দিন, সাবলীল সচ্ছন্দ বেগে। উচিৎ ছিলো এমনি হওয়া; তা হলেই হতো ভালো। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রায়ই পল শুনতে পেতো তিক্ত মন্তব্য—'অভিশপ্ত জীবন!' 'কুত্তার জীবন!' তবুও ওর মনে ঐ সব তিক্ত মন্তব্য আদৌ কোন রেখাপাত করতো না; কারণ রতিদিনই সে শুনতে পেতো ঐ ধরণের কথা; তাছাড়া কুত্তার জীবন—ওর কাছে সেটা খুব খারাপ বলেও মনে হতো না; কুকুরকে তো করতে হয় না কোন কাজ—ওরা স্বাধীন, ওরা সুখী; লোকে ওদের কতো আদর করে যত্ন করে, কোলে তুলে নেয়, ভালোবাসে।

প্রথম প্রথম পল তার মনিব আর কারিগরদের হাবভাব, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করতো। কিন্তু ওর প্রতি তাদের ব্যবহার ওকে নিরুৎসাহ করে দিলো; ক্রমে তাদের সম্পর্কে পলের ব্যবহারও হয়ে উঠলো যান্ত্রিক। পল তার চলা ফেরা, ব্যবহার প্রভৃতির চারপাশে একটা বিশেষ ধরণের গন্ডী টেনে দিয়ে সপ্তাহের কাজের দিনগুলি নির্দিষ্ট ধারায় কাটিয়ে দিতো। নিজেকে পল এমন একটা যন্ত্রে পরিণত করে তুললো যে জঙ ধরার বা ভেঙে পড়ার আগ পর্যন্ত যেন তার এ গতির আর বিরাম নেই।

পলকে সবাই ভাবে বোকা, ভাবে নির্বোধ। অবশ্য তারাও যে খুব ভুল করে কিম্বা অন্যায় করে তাও নয়। ওর ধীরে ধীরে চলা, এক কথায় সংক্ষেপে জবাব দেয়া, তাছাড়া যে সব জিনিষে অন্য দশজনকে আকৃষ্ট করে, উৎসাহিত করে তোলে সে সব সম্পর্কে ওর চরম ঔদাসীন্য নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ছাড়া আর কি!

রবিবার খাদের ভিতরে শুয়ে শুয়ে পল অদ্ভুত অদ্ভুত সব কল্পনার জাল বুনে চলতো; তারপর হঠাৎ এক সময়ে আপন মনেই প্রশ্ন করে উঠতো: কেন ঐ সূর্য পুলিসের প্রহরীর মতন নীল আকাশের বুকে প্রতিদিন একই নির্দিষ্ট পথে ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়ে? পলের প্রায়ই মনে হতো যে যদি তার ক্ষমতা থাকতো তবে সূর্যটাকে অন্য রঙে দিতো রাঙিয়ে কিম্বা একই সময়ে একই সঙ্গে চাঁদ আর সূর্য দুটোকেই ছেড়ে দিতো ঐ নীল আকাশের বুকে। কি মজাটাই না হতো তাহলে!

দু'বছর পরের কথা। রোগা ছিপ্‌ছিপে হয়ে উঠেছে পলের চেহারা; মুখের বসন্তের দাগগুলো যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বালক ভৃত্য আরটিউস্কা শিক্ষানবীশিতে উন্নীত হয়ে নিকান্ডারের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। কি যেন একটা তুচ্ছ অপরাধ নিকান্ডারের হয়েছে তিন মাসের কারাদন্ড। কোল্‌কা ভাবছে, এবার বিয়ে করে নিজেই দোকান খুলবে। ঠাকুর্দা উট্‌কিন আরও বেশীকরে মদ খেতে শুরু করেছে আর হাঁপানীর বিরুদ্ধে অভিযোগও তার বেড়ে গেছে অনেক বেশী। কাজ করতে গিয়ে হাত কাঁপে। সব দেখে শুনে দোকানের মালিক বাইরের পরিবর্তে ঘরে বসেই মদ খেতে শুরু করেছে। কারণ, কয়েকটা ঘটনার ভিতর দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে

উট্‌কিনের দ্বারা কাজ কর্ম চালানো আর সম্ভব হয়ে উঠছে না।

ক্রমে পলও জুতা তৈরীর রহস্য আয়ত্ব করতে শিখলো। আরটিউসকার কড়া তত্বাবধানে পল শিখলো কেমন করে চামড়া জুড়ে জুড়ে জুতার তলি আর গোড়ালী তৈরী করতে হয়। কারখানার সমস্ত কারিগর এমন কি মালিককে পর্যন্ত অবাক করে দিয়ে একাজে পল অন্য সবার চাইতে তার নৈপুণ্য প্রমাণ করলো। ফলে ওর মর্যাদা অনেক খানি বেড়ে গেলো।

কিছুদিন পর সিসকিন কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো। আরটিউস্কার মজুরী বাড়লো। পল উন্নীত হলো আরটিউস্কার স্থানে। পলের জায়গায় ভর্তি হলো একটা নূতন ছেলে।

পলের মজুরী এখন মাসে তিন টাকা। আরটিউস্কার নিরবচ্ছিন্ন গান, ঠাকুর্দা উট্‌কিনের একঘেয়ে গজর গজর আর অভিযোগ, এর ভিতরে স্বভাব-সুলভ নীরবতায় মুখ বুজে পল কাজ করে চলতো। কাজ কর্মের চাপ খুব বেশী ছিলোনা বলে মালিক আর কোনও নূতন কারিগর ভর্তি করে নি। যখন বেশী কাজ জমে যেতো তখন সে নিজেই বসতো সেই কাজ নিয়ে। ফলে, তার আনন্দও যেমন বেশী হতো তেমনি আয়ও হতো বেশী আর মদ খাবার অধিকারও তেমনি বেড়ে যেতো অনেকখানি।

কি অদ্ভুত জীবন! —চামড়ার ভিতর দিয়ে মোম মাখানো সূতার ফোঁড় তুলতে তুলতে দোকানের মালিক বলে উঠলো,—কাজ করো আর মদ মারো! আরে ছ্যাঁ, একে কি আর বাঁচা বলে! এ যেন একটা প্রচন্ড ঠাট্টা!—কি বলছো তোমরা সব! কি হে, খাবার সময় হয়নি এখনও? মিশ্‌কা! সিমেনোভনাকে ব'লে দে টেবিল গোছাতে; আর এই নে ধর! ছুটে যা দেখি তাড়িখানায়—আধ বোতল আনবি। কি বলো ঠাকুর্দা কুলোবে তো আধ বোতলে?

হৃষ্ট চিত্তে ঠাকুর্দা তার গোঁফ জোড়া নাড়তে লাগলো।

মালিকের মুখে ফুটে উঠলো মুচকি মুচকি হাসি!

মিশকার বয়েস বছর দশেক, কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা চুল, দুষ্টুমী ভরা চঞ্চল দুটি চোখ। মিশ্‌কা ছুটি পেলে পথে যাকে পেলো তাকেই মুখ ভেংচি কাটতে কাটতে চল্‌লো।

এমনি ভাবে কেটে গেলো দশ বছর। পল বড়ো হয়ে উঠেছে। বলিষ্ঠ

গঠন, মুখে চোখে গাম্ভীর্যের ছাপ, লম্বা চওড়া চেহারা ঈষৎ ন্যুব্জ, পেশী বহুল দৃঢ় দেহ। আস্তিন গোটানো বাদামী রঙের বাহুর উপরে গ্রন্থী বহুল নীল শিরা। যখন কাজ করতে বসে, কোমল বাদামী চুলগুলোর ফাঁকে দেখা যায় ওর সতেজ গ্রীবা। বসন্তের দাগে ভরা গালের উপরে ঘন দাড়ির রেখা; উপরের ঠোঁটটা ইতিমধ্যেই ছোট ছোট নরম গোঁফে সমাবৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের ভিতরেও পল আর পাঁচ জনার মতন মিশুক হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক আগের মতনই সে কুঞ্চিত কুটীল ভ্রূর তলা দিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকায়; মুখের ভাব আরও যেন গম্ভীর আরও যেন বিষাদময় হয়ে উঠেছে।

দোকানে এখনও তেমনি সে 'অকাল বৃদ্ধ' নামেই পরিচিত আর তেমনি বোকা বলেই রয়েছে তার খ্যাতি। কারণ, অন্য সবার মতন সে মদও খায়না কিম্বা স্থান বিশেষে গিয়ে ফুর্তি করা বা ঐ ধরণের কিছু করতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। তবে অন্যান্য কারিগরেরা এখন আর ওকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে না—তারা ওর হাব ভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; অবশ্য সেটা কতকটা ওর সবল দেহের জন্যও বটে আর কতকটা এই ভেবে যে, কোন কিছুতেই ওর গায়ের পুরু গণ্ডারের চামড়া ভেদ করে আঁচড়টিও লাগরেনা।

কেউ ভেবেই উঠতে পারতোনা যে, ওর বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি। তাদের মতন কোন কিছুতেই পল যোগ দিতোনা। বুঝি বা নিজেকেও সে চিনতোনা। অবোধ, গম্ভীর, বুদ্ধিহীন—জানেনা কেমন করে হাসতে হয়, কেমন করে হয় কাঁদতে।

এতোদিনে দোকানের মালিকের চুল দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে; বয়সের দরুণ শরীরটাও ভারী হয়ে উঠেছে। পলের সম্পর্কে আলোচনা হতে হতে একদিন সে বললো: পল তো মরেই গিয়েছিলো, কিন্তু ঈশ্বরের প্রধান দূত যেদিন ঘোষণা করলেন যে, গোটা পৃথিবীটাই একদিন লয় হয়ে যাবে, তাই শুনে পল আবার বেঁচে উঠলো। সেদিন ওর ইচ্ছা থাক আর নাই থাক যখন মরতেই হবে, তখন যতোদিন সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পলও না ধ্বংস হয়ে যায় অথবা কেউ জোর করে ওকে বাধ্য না করে বাইরে বেরুতে ততোদিন আর পল এই কারখানার ঘর ছেড়ে এক পাও কোথাও নড়বে না—অচল অনড়

হয়ে এখানেই থ.কবে বসে।

পলের মুখের কাছে অবশ্য এর জুৎসই জবাব একটা এলো কিন্তু নীরবে একটু হেসে সে চুপ করে রইলো।

এর জন্য তোমাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি—অভিবাদনের ভংগীতে মাথা নুইয়ে মিরণ বল্লো। কাজের লোক হিসাবে মিরণ পলের উপরে খুবই সন্তুষ্ট; বোধ হয় মনে মনে পলকে সে একটু ভালোও বাসে। যখন মাতাল হয়ে পড়ে তখন বার বার সে একথা প্রকাশ করে; এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায়ও অন্য সবার চাইতে পলকে সে খাতির করে একটু বেশী। দোকানে আরও দুজন কারিগর ছিলো—মিশকা, বয়স বছর উনিশ; ছেলেটা চোর জোচ্চোর। আর ছিলো রাজহাঁস। রাজহাঁসের বয়েস চল্লিশ; একটা চোখ কানা, গলাটা সরু আর লম্বা। রাজহাঁস বলতো তার গলাটা এতো লম্বা আর সরু হওয়ার কারণ এই যে, ছেলেবেলায় সে খুব ভালো গান গাইতে পারতো আর নাকি ছিলোও একটা গানের দলে। এখন অবশ্য তার গলায় সুর বলতে কিছুই নেই—কেবল মাত্র আছে একটা কর্কশ ঘেন্ঘেনে আওয়াজ যা দিয়ে সে তার মনের ভাব ব্যক্ত করে থাকে; আর যাই হোক তাকে সুর বলা যায়না কোন মতেই।

আরটিউস্কা অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে মুচির কাজ। প্রথমে কিছুদিন সে ছোট খাটো বেচাকেনা করতো; তার পর তাতেও সুবিধা করে উঠতে না পেরে একটা মদের দোকানে 'বয়'এর কাজ নিলো। পরিশেষে আবার সে ঘুরে এলো মিরণের কাছে। তারপর একদিন একজোড়া নূতন জুতা চুরি করে সেই যে পালিয়ে গেলো আর তার দেখা নেই; এবার সে শহর ছেড়েই উধাও হয়ে গেলো।

বৃদ্ধ উট্কিনও নেই—অনন্ত কালের জন্য ছুটি নিয়ে সেও চলে গেছে। সেলাই করতে করতে একদিন হঠাৎ সে জোরে জোরে শ্বাস টানতে আরম্ভ করলো। রোজই অবশ্য সে জোর জোরেই শ্বাস টানতো তাই এটা ওর একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার বলে কেউ আর সেদিকে তেমন নজর দিলোনা। কিন্তু সেদিন অমনি শ্বাস টানতে টানতে হাতের চামড়া পেটা হাতুরীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উর্ধমুখে ছাদের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। তারপর বিশেষ কাউকে

উদ্দেশ্য না করে হঠাৎ বলে উঠলো:

পরুত ডাকবে না...না?

কিন্তু তবুও কেউ সে দিকে বিশেষ কান দিলো না; কারণ এটা ওর প্রতিদিনের পুরানো কথা। উট্‌কিনের ধারণা জন্মেছিলো যে, কেবল মাত্র একটি পুরোহিতের দ্বারা ওর অন্তোষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হবেনা। তাই আগে থাকতেই সে সবাইকে বলে রেখেছিলো যেন বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে করে ওর মৃতদেহ বিশপের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সে দিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর উট্‌কিন গিয়ে উনুনের পিছনে তার বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও যখন দেখা গেলো যে সে উঠছেনা তখন সবাই ওর বিছানার কাছে গিয়ে দেখলো উট্‌কিন মরে গেছে।

উট্‌কিনের এই আকস্মিক মৃত্যু পলের মনে গভীর রেখাপাত করলো। প্রশ্ন ভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বহুক্ষণ ধরে সে সবার মুখের পানে তাকাতে লাগলো কিন্তু বিক্ষুব্ধ অন্তরের জাগ্রত ভাবধারা ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে তেমনি নীরবে নতমুখে চুপ করে বসে রইলো।

উট্‌কিনকে সমাধিস্থ করার পর প্রায়ই পল বনফুল আর পাতাবাহারের গাছে ঘেরা সেই নিরালা অন্ধকার কোণে তার সমাধি স্থানটি দেখতে আসতো। ওখানে গিয়ে পাথরের দেয়ালের গায়ের এক ছিদ্র পথে দূরের পানে তাকিয়ে বসে থাকতো । দেখতো কুটীর, নদী, বন, আর মাঠ। ওর মনে পড়ে যেতো ছেলে বেলার কথা।

দুবছর হাসপাতালে থাকার পর আরিফির মৃত্যু হয়েছে। আরিফির মৃত্যু পলকে তেমন বিচলিত করতে পারেনি—অন্ততঃপক্ষে তেমন কোনও গভীর শোকের বহিঃপ্রকাশ কেউ দেখেনি পলের ভিতরে কোন দিনও।

রবিবার দিনের ভ্রমনের পরিধি পলের অনেকটা ব্যাপক হয়ে উঠলো। এখন আর সে সেই খাদের ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাকেনা। সমাধিস্থান ছাড়াও সে শহর ছাড়িয়ে দূরের ঐ পাহারের উপরে গিয়ে ওঠে। সেখান থেকে শহরটাকে দেখতে পেতো পরিস্কার যেন ওর হাতের চেটোর উপরে অবস্থিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে ঐ শহরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতো: অচল অনড় জনসমুদ্রের ভিতর থেকে ভেসে আসতো একটা অস্পষ্ট কোলাহল—

রাস্তায় চলন্ত পথিকের ছোট ছোট আবছা কালো ছায়া মূর্তিগুলো ওর চোখের সামনে চলা ফেরা করতে থাকতো...

মাঝে মাঝে প্রায়ই পল চলে যেতো বনের ভিতরে; তারপর একটা নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো।

কখনও বা চলে যেতো গ্রামে—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি জিনিষ দেখতে দেখতে চলতো পথ। কোনও দিন হয়তো পানশালায় ঢুকে এক বোতল বিয়ার নিয়ে এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো আর একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনতো সবার কথাবার্তা। কখনও কখনও দু একটা মাতাল ওর কাছে ঘেঁসার চেষ্টা করতো কিন্তু ওর সদাবিষণ্ণ গম্ভীর মূর্তি তাদের ভিতরে এমন একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলতো যে, তারা তখন পরস্পর বলাবলি করতো:

আরে ছ্যাঁ! ছুঁসনে ওটাকে! দেখছিস না শহুরে বাবু! লাগানা ধরে মার!—উপস্থিত পানরত মাতালদের উদ্দেশ্যে উচ্চৈস্বরে বলে উঠেই তারা তীব্র দৃষ্টিতে পলের দিকে তাকাতো। দাম চুকিয়ে দিয়ে পল নীরবে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসতো। একদিন বেরিয়ে আসতে আসতে পল শুনতে পেলো কয়েকজনে মিলে কানাঘুসা করছে: পুলিসের লোক বুঝলি! তারপর থেকে পল আর সেই গ্রামে যেতো না।

রাশিয়ান কোট, ঢিলা পাজামা, সার্টের উপরে রেশমী কোমরবন্ধ, উঁচু টুপী আর নিজের হাতে গড়া উঁচু বুট, এই পরে পল বেরুতো বাইরে। ওর লম্বা ঋজু দেহ, বলিষ্ঠ গঠন, আর গম্ভীর মুখ দেখে বোঝা খুবই কঠিন হতো যে ও মজুর; এমন কি সমাজের কোন স্তরের মানুষ তাও বলা খুব কঠিন হতো।

পলের মনিব ঠাট্টাকরে বলতো যে, পল হচ্ছে সেই জাতের লোক যে কিছু একটা ঘটলেই প্রতিপক্ষকে সোজা তুলে নিয়ে একটি আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ওরে জেল ঘুঘু, শুনছিস? —একদিন সকালে সেংকা এসে দোকানে ঢুকতেই মিরণ বলে উঠলো—আজ কেট্‌লীটা একটু পরিস্কার কর দেখি, তোর মুখের চাইতেও যে ওটা নোংরা হয়ে রয়েছে! আর পল শোন্‌ আজ

লেফ্‌টান্যাণ্ট সাহেবের বুট জোড়া শেষ করা চাই-ই কিন্তু।

আচ্ছা—গোড়ালীটা লাগাতে লাগাতে মনিবের মুখের দিকে না তাকিয়েই পল জবাব দিলো।

চোখে চশমা এঁটে রাজহাঁস সেলাইয়ের কলে জুতার উপরের দিকটা সেলাই করছিলো; কলের ভিতর থেকে একটা তীক্ষ্ম ঘড়্‌ঘড়ে আওয়াজ জেগে উঠে সমস্ত ঘরখানিকে মুখরিত করে তুল্‌লো।

জানালার পথে মিরণ বাইরের দিকে তাকালো; জোড়া জোড়া নরনারীর গতিশীল পা-গুলো ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। একটু করা চামড়া তুলে নিয়ে চোখের কাছে এনে পরীক্ষা করতে করতে প্রবীন লোকের মত ভারিক্কি কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলো: চমৎকার পড়শী এসেছে আমাদের—এখানেই বাসা নিয়েছে, এক জোড়া। ফুর্তিবাজ মেয়েমানুষ, বুঝলে হে ছোকরারা!

কারুর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। একটু থেমে পুনরায় মিরণ বলতে শুরু করলো:

পল এবার তুই ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নিস, বুঝলি! তাহলে অন্ততঃ তোর মুখটা খুলবে। শিখতে পারবি কেমন করে কথা বলতে হয়। আচ্ছা, তুই এমন সন্ন্যাসীমার্কা কেন বল দেখি? স্বশরীরে স্বর্গে যাবার মতলব আঁটছিস বুঝি, না? ওসব চেষ্টা করে কোন লাভ নেই হে ছোকরা! —মুচিদের তাঁরা স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে দেয়না। তাঁদের ওখানে তো জুতার তেমন প্রচলন নেই—সবাই খালি পায়েই চলে; তাছাড়া আবহাওয়াটাও খুবই স্বর্গীয় কিনা! হাঁ...

ঠা-ণ্ডা-মি-ঠা আ-ই স-ক্রিম্‌!—রাস্তার উপর ফেরিওয়ালার উচ্চ কণ্ঠের হাঁক জেগে উঠলো।

সুতরাং বুঝলি পল ঐ নূতন পড়শীদের সঙ্গে একটু ভাবসাব করে নে, দেখবি দুদিনেই ওরা তোকে কেমন গলিয়ে পুড়িয়ে নূতন মানুষটি বানিয়ে ছেড়ে দেবে। সোলেমন বলে গেছেন: নারীর পায়ে তোমার শক্তি বিসর্জন দিও না...কিন্তু ওকথাটা আমাদের জন্যে নয় হে! মেয়েরা হচ্ছে সুখের পায়রা; একবার ওদের স্বাধীনতা দিয়ে দেখো ওরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে পর্যন্ত

লণ্ডভণ্ড করে উল্টে ছেড়ে দেবে। প্রথম ধাক্কায়ই তো বিবাহিত মেয়েরা সব স্বামীদের তালাক দেবে তারপর এক, দুই, তিন করে পুরুষগুলোকে এমন বাঁদর নাচ নাচাতে শুরু করবে যে সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে উঠবে! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!

সেদিন মিরণ ছিলো খুব খোসমেজাজে। একটুও না থেমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে গল্প করে যেতে পারতো; ধার্মিক রাজহাঁস অবশ্য বলতো ওটা ওর কল্পপ্রবণতা। হাতের কাজটা শেষ করে রাজহাঁস ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো জুতার ডগার দিকটা কেমন উৎরেছে তারপর গম্ভীর চাপা কণ্ঠে ধরলো গান—'স্বর্গীয় পরম পিতা'...কিন্তু কেবলমাত্র সাপের মতন একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ ছাড়া তার গলা থেকে আর এমন কোন সুর বেরুলো না যাকে কোনক্রমেই সংগীত বলা যেতে পারে। লম্বা গলাটার উপরে হাত বুলিয়ে জোরে জোরে সে কয়েকবার কাশলো তারপর একবার এদিকে একবার ওদিকে থুথু ফেললো।

কি হে পল অত লাল হয়ে উঠেছিস কেন?—মিরণ জিজ্ঞাসা করলো—কপালটা যে ঘামে একদম ভিজে উঠেছে।

জানি না!—হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ক্লান্ত কণ্ঠে পল জবাব দিলো। হাতের কালি ওর কপালে লেগে গেলো।

শোন্‌, তাহলে আর কালি ঝুলি মাখিস না—গম্ভীর হয়ে দোকানের মালিক বললো।—তোর চোখ দুটোও লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। শরীর অসুস্থ মনে হচ্ছে নাকি?

হাঁ, শরীরটা তেমন ভালো নেই...আমি আর পারছি না...

তাহলে ওখানে বসে আছিস কেন। হাতের কাজ রেখে দে। আর কেউ ওটুকুন শেষ করে ফেলবে'খন। যা তুই শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম কর গে।

পল উঠে দাঁড়ালো তারপর মাতালের মতন টলতে টলতে দোরের দিকে এগিয়ে গেলো।

আমি গুদাম ঘরে শোবো; কারণ যদি কিছু...

কথাটা শেষ না করেই পল চলে গেলো।

উঠানের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ওর দুটো পা-ই ভীষণভাবে

টলছিলো। দারুণ ভারী হয়ে উঠেছে মাথাটা, ঘুরছে বোঁ বোঁ করে; চোখে লাল, সবুজ সব তারা দেখতে শুরু করেছে। গুদাম ঘরের হাওয়া ভারী, ভিজা স্যাঁতসেতে, মনে হয় ঘন বাষ্পে ভরা। গলার বোতাম খুলে পল চটের এপ্রোনটা খুলে ফেলে দিলো তারপর মাথার নীচে হাত দিয়ে খড়ের বস্তার উপরে শুয়ে পড়লো।

গুদাম ঘরের ভিতরটা অন্ধকার; দরজার ফাটলের পথে এক ফালি সূর্যের ক্ষীণ আলো ফিতার মতন সরু হয়ে এসে পড়ে ঐ জমাট বাঁধা অন্ধকারকে একটু ফিকা করে তুলেছ। মাথার দিকে পল শুনতে পেলো পায়ের শব্দ, মাথার ভিতরের তীব্র যন্ত্রণায় মনে হচ্ছে বুঝিবা ওর কপালটা খসে পড়বে;—কেমন মাতালের মতন লাগছে; শিরা উপশিরার ভিতরে যেন রক্ত ফুটছে টগ্‌বগ্‌ করে; নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে; কেমন যেন একটা তাজা রক্তের গন্ধ পাচ্ছে নাকে।

পলের চোখের সামনে ভেসে উঠলো অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল, সবুজ তারার মালা। কখনও সেগুলো এতোবড়ো হয়ে উঠছে যেন এক একটা বিড়ালের চোখ। মরক্কো চামড়ার টুকরার মতন বড়ো বড়ো কালো দাগগুলো যেন শরতের শুক্‌না ঝরা পাতার মতন হাওয়ায় দুলে দুলে উপর থেকে নীচে নেমে আসছে; কানের ভিতরে একঘেয়ে অবিশ্রাম ভোঁ ভোঁ শব্দে কি যেন বেজে চলেছে। বহুক্ষণ কেটে গেলো। মুহূর্তগুলো যেন অদ্ভুত মন্থর গমনে চলেছে ধুঁকে ধুঁকে। হঠাৎ খোলা দোরের পথে সূর্যের আলো এসে ঢুকলো; পল শুনত পেলা সেঙ্কোর পরিচিত তীক্ষ্ন কণ্ঠের সুর—'পল খাবে এস!'

আমি খাবো না—পল জবাব দিলো। অবাক হয়ে গেলো সে এতক্ষণে কেবলমাত্র মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয়েছে দেখে। ওর নিজের গলার স্বরও কেমন যেন অদ্ভুত মনে হলো নিজের কাছে—কেমন যেন বিশ্রি, ধীর। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে সে বেরিয়ে এসেছে দোকান থেকে।

আবার ঘরটা অন্ধকার হয়ে এলো। সূর্যের আলো ঘর ছেড়ে যেন লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। আবার প্রহরগুলো চলেছে তেমনি মন্থর গতিতে—তেমনি ধুঁকেধুঁকে। তেমনি দু' কানের ভিতরে ভোঁ ভোঁ করছে। পলের

মনে হলো কি যেন একটা ভিজা গরম পদার্থ ওকে শুষে শুষে খেয়ে ফেলছে। ওর চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এলো—প্রবল তৃষ্ণা আর হাওয়ার জন্য সর্বাঙ্গ জুড়ে জেগে উঠলো প্রবল আক্ষেপ...

দেখ, কে যেন একটা লোক শুয়ে রয়েছে হেথায়।

বোধ হয় একতলার ঐ মুচিটা। মাতাল হয়ে পড়ে আছে। অতি কষ্টে পল চোখ মেলে ঘার ফিরিয়ে দোরের দিকে তাকালো। আবার ঘরের ভিতরে আলো এসে পড়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে দুটি স্ত্রী লোক। এক জনে সিঁড়ির দরজা খুলছে, অপর এক হাতে একটা দুধের কলসী আর এক হাতে একটা মোড়ক নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে। তার আয়ত নীল চোখ দুটি শায়িত পলের দিকে নিবদ্ধ রেখেই পার্শস্থ বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছে। গলার স্বর সুস্পষ্ট, সতেজ, সাবলীল।

জল্‌দি কর ক্যাথারিনা!

আঃ! তা বলে ধাক্কা দিচ্ছিস কেন? খোল না তুই নিজে ভারী দরজাটার উপরে ধাক্কা দিতে দিতে রুক্ষ কণ্ঠে মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

দেখ, দেখ, মুচিটা কেমন বড় বড় চোখ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। উঃ!—প্রথম মেয়েটি বললো:

মনে হচ্ছে যেন আমাকে গিলে খেয়ে ফেলবে!

দেনা, দুধের কলসীটা ঢেলে দেনা ওর গায়ে।

বয়ে গেছে আমার দুধগুলো নষ্ট করতে!

জ্বরতপ্ত উজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে পল মেয়ে দুটির পানে তাকালো। ওর মনে হলো বহু দূর থেকে ঘন কুয়াসার ঢেউয়ের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ওরা এগিয়ে আসছে; তাই গলার সবটুকু শক্তি এক করে পল চীৎকার করে বলে উঠলো:

একটু জল দাও আমাকে—তবুও মনে হলো মেয়ে দুটি বুঝি বা ওর কথা শুনতে পাবে না।

কিন্তু তারা শুনতে পেলো। নীল নয়না মেয়েটি হাতের মোড়কটা মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে সেই হাতে স্কার্টটা তুলে ধরে পলের কাছে এগিয়ে গেলো। অন্য মেয়েটিও দু এক পা এগিয়ে এসে উৎসুক দৃষ্টিতে বান্ধবীর

কার্যকলাপ দেখতে লাগলো।

হাসি নয় কাটিয়া; এক মুঠো বরফ দে আমার হাতে—ওর জন্য আমি দুধগুলো মিথ্যা নষ্ট করতে রাজী নই।

পল শুনতে পেলো ওর কথা তারপর শুষ্ক কণ্ঠে পুনরায় চীৎকার করে বলে উঠলো:

শিগ্গির একটু জল...

পরক্ষণেই পল দেখতে পেলো দুটি আয়ত নীল চোখ ওর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে।

বুঝলি কাটিয়া, লোকটার মুখময় এমন বিশ্রি বসন্তের দাগ, উঃ! কিন্তু মাতাল নয় রে—মদের গন্ধ পাচ্ছি না তো, মাইরি! বিশ্বাস কর! মনে হচ্ছে অসুস্থ। গা-টা তেতে আগুনের মতন গরম হয়ে উঠেছে আর নিঃশ্বাস পড়ছে যেন ইঞ্জিনের মতন, উঃ! লোকগুলো কি ভীষণ বজ্জাত!—একটা রোগীকে কিনা ওরা এনে ফেলে রেখেছে এই গুদাম ঘরে! হারামজাদা, পাজীর দল! নাও নাও এই ধরো খাও। এখানে এমনি ভাবে পড়ে আছ কতক্ষণ ধরে? অ্যাঁ! তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই নাকি? তারা তোমাকে হাসপাতালেও দিয়ে আসতে পারেনি?

পলের সামনে হাঁটুগেরে বসে মেয়েটি দুধের পাত্রটা ওর মুখে তুলে ধরলো, কম্পিত হাতে পাত্রটা আঁকড়ে ধরে প্রবল তৃষ্ণার ধমকে পল চক্‌চক্‌ করে দুধটা চুমুক দিয়ে খেতে লাগলো। মেয়েটি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই চলেছে—ভুলেই গেছে যে দুধ খাওয়া আর কথা বলা, দুটা কাজ এক সঙ্গে ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

ধন্যবাদ!—পাত্রটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অবশেষে পল বলে উঠলো। পুনরায় ওর মাথাটা খড়ের বস্তার উপরে লুটিয়ে পড়লো।

এমন ভিজা স্যাঁতসেতে ঠান্ডা জায়গায় কে তোমাকে এনে ফেলে গেলো? তোমাদের ঐ দোকানের মালিকটা বুঝি? লোকটা দেখছি একটা আস্ত কুকুর!—পলের উষ্ণ কপালের উপর হাত রেখে রুক্ষ কণ্ঠে মেয়েটি বললো।

না, আমি নিজেই...পল বলতে আরম্ভ করলো; কিন্তু ওর স্থির দৃষ্টি মেয়েটির মুখের পরে নিবদ্ধ:

সাবাস্! খুব বুদ্ধি তো তোমার দেখছি! আগে আগেও এমনি এখানে এসে পড়ে থাকতে নাকি?

না, কেবল এই আজই...

মাগো! হয়তো হপ্তা খানেক ধরেই রোগের সঙ্গে লড়াই করে আসছো, শেষটায় তোমাকে কাবু করে শুইয়ে ফেললো।

—তাই না? ওঃ! এখন কি করি? ক্যাথারিনা! ওকে নিয়ে এখন কি করা যায় বলতো?

তোর কি মতলব বল দেখি? ওকে টেনে বরফের উপরে শুইয়ে দিবি না তোর নিজের বিছানায় নিয়ে গিয়ে তুলবি? ধর যদি এক্ষুনি ও চীৎকার করতে শুরু করে দেয়, তখন? বোকা মেয়ে! চল চল!

অতি কষ্টে মুখ ফিরিয়ে পল সিঁড়ির উপরে দাঁড়ানো অপর মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটির দৃষ্টি রুক্ষ, নিষ্প্রাণ তবুও কেমন যেন একটু কৌতূহল মাখা। ওর টানা টানা বাঁকা কথার ভঙ্গী পলের খুবই খারাপ লাগলো; একটা মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পুনরায় সে কাছের মেয়েটির মুখেরপানে তাকালো।

তুমি এখন এখানেই একটু চুপ করে শুয়ে থাকো—পলের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে কোমল সুরে মেয়েটি বললো:

আমি এক্ষুনি ভিনিগার, মদ, আর মরিচের গুড়া নিয়ে আসছি, বুঝলে?

দ্রুত পায়ে মেয়েটি উপরে উঠে গেলো। দরজা খোলা রেখে দুজনেই চলে গেছে। পল শুনতে পেলো কি নিয়ে যেন উভয়ের ভিতরে শুরু হয়েছে একটা তীব্র বাদানুবাদ।

হয়তো পল ভাবতে পারতো যে: এতক্ষণ সে যা কিছু দেখেছে, যা কিছু শুনেছে তার সবটাই বিকারের ঘোরে দেখা শুনা। কিন্তু এখনও যে তার মুখে লেগে রয়েছে দুধের মিষ্টি আস্বাদ; অনুভব করছে দুধ পড়ে জামার খানিকটা অংশ গেছে ভিজে। জ্বরতপ্ত কপালের উপরের সেই কোমল স্পর্শের স্নিগ্ধ অনুভূতি ধীরে ধীরে ওর গালে মুখে পেলব আলিঙ্গনের মতন ছড়িয়ে পড়ছে। ওর ফিরে আসার অপেক্ষায় পল অন্তরে অন্তরে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো। সমস্ত অসুস্থতা সমস্ত অস্বস্তি ছাপিয়ে

জেগে উঠেছে এক অদম্য অভূতপূর্ব কৌতূহল—যেন সে জানতে চায়, এর পরে আর কি আছে। কৈ এর আগে আর কোন দিনও তো ওর অন্তর ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞাত রহস্যের যবনিকা ভেদ করার জন্য এমন আকুল হয়ে ওঠে নি! দরজার দিকে পিছন ফিরে কাত হয়ে পল তার জ্বরতপ্ত অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুটি চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে উঠানের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো।

অনতি বিলম্বেই মেয়েটি ফিরে এলো; তার এক হাতে বাটি চাপা দেয়া একটা বোতল, অন্য হাতে খানিকটা ভিজা ন্যাকড়া।

ধরো, এই টুকু খেয়ে ফেলো দেখি—পল বাটিটার উদ্দেশ্যে হাত বারাবার আগেই মেয়েটি বাটির ভিতরের তরল পদার্থ টুকু ওর গলার ভিতরে ঢেলে দিলো। তরল পদার্থটি ওর গলা বেয়ে যতোই ভিতরে নেমে যেতে লাগলো ততই ওর মুখ গলা বুক যেন জ্বালিয়ে দিতে লাগলো। পল কাশতে শুরু করলো।

এতে খুব ভালো কাজ করবে দেখো—মেয়েটির মুখচোখে যেন একটা জয়ের উল্লাস দীপ্ত হয়ে উঠলো; তারপর হাতের ভিজা ন্যাকড়াটা দিয়ে ওর চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে সেটা ওর কপালের উপরে বিছিয়ে দিলো। একান্ত বাধ্য ছেলেটির মতন নীরবে পল নিজেকে ঐ সেবারত রমণীর হাতে ছেড়ে দিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

এখন বোধ হয় কথা বলতে পারবে, কেমন? তোমার ঐ মনিবটা হচ্ছে একটা আস্তো পশু। ব্যাটার নরকেও স্থান হবে না! মরুক গে' যাক্! কাল আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে আসবো। শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে, তাই না? একটু অপেক্ষা করো, দেখবে খানিক পরেই বেশ আরাম লাগবে। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে তোমার, না?

না, ঠিক হয়ে গেছে—এখন পারবো কথা বলতে।

না, না, এখন একটু মুখ বুজে চুপ করে থাকো। ডাক্তাররা সব সময়েই রোগীকে কথা বলতে বারণ করেন। চুপ করে শুয়ে একটু বিশ্রাম করো দেখি। —কথা বলার আর কোন প্রসঙ্গ খুঁজে না পেয়ে মেয়েটি এমন ভাবে নিজের চারিদিকে তাকালো, মনে হলো যেন সে দারুণ আঘাত পেয়েছে মনে মনে। তেমনি অচঞ্চল স্থির দৃষ্টিতে পল ওর মুখের পানে তাকিয়ে থেকে ভাবতে

লাগলো—ও কেন আমার জন্যে এতোখানি করছে; আমিতো নিতান্তই অপরিচিত ওর কাছে। এই মেয়েটিই বোধ হয় সেই নূতন ভাড়াটে—দোকানের মালিক তখন বলছিলো যার কথা। কি সব বাজে কথাই না বলছিলো সে। ভালো করে জেনে তবে তার বলা উচিত ছিলো।

তোমার...নাম...কি?—কোমল সুরে ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলো পল।

আমার নাম? নাতালিয়া ক্রিভ্স্টোভা। কেন?

এমনিই।

ওঃ! তাই—অনিশ্চিত কণ্ঠে বলে উঠেই মেয়েটি পলের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো তারপর কোমল মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলো: তোমার?

পল।

বয়েস কতো তোমার?

বিশ বছর।

তার মানে শিগ্গিরই তোমাকে ফোজে নাম লেখাতে হবে—বলেই মেয়েটি চুপ করে গেলো। তারপর আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলো:

তোমার কোন আত্মীয় স্বজন নেই এখানে?

না, আমি পথে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে—শান্ত কণ্ঠে পল জবাব দিলো। আবার ওর সর্বাঙ্গ ছেয়ে জেগে উঠলো সেই অসহনীয় তীব্র ব্যথা; নিদারুণ পিপাসায় শুকিয়ে উঠলো বুক। উঃ-উঃ-উঃ!—মেয়েটি পলের কাছে আরও খানিকটা সরে এলো।

ওর দুটি নীল চোখ ভরে জেগে উঠলো পরম বিস্ময়, যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেনা অমন একটা শক্ত সমর্থ জোয়ান মানুষ কেমন করে কুড়ানো ছেলে হতে পারে।

আর একটু জল দাও।

এই যে...এই নাও...ধরো—বলতে বলতে মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠলো: বাটিটায় দুধ ঢেলে ক্ষিপ্র হস্তে সে ওর মাথার পেছন দিকে হাত ঢুকিয়ে মাথাটা তুলে ধরলো তারপর বাটিটা ওর মুখের কাছে এগিয়ে এনে ফিস্

ফিস্ করে বলে উঠলো: সুস্থ হয়ে ওঠো। ভগবান তোমাকে আরোগ্য করুণ।

পল খেতে আরম্ভ করলো। বাটিটায় চুমুক দিতে দিতে পুনরায় সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো। এতক্ষণ ওর মুখখানা ছিলো স্বাভাবিক, কোন চিন্তা ভাবনার লেশমাত্র চিহ্নও ছিলো না সে মুখে; কিন্তু এখন ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা গভীর দুশ্চিন্তার কালো ছায়া, একটা ব্যথাভরা সমবেদনার করুণ ভাব। এই অভিব্যক্তি পলের একান্ত পরিচিত, বোধগম্য; ফলে তার কথা বলার স্পৃহা আরও বেড়ে গেলো।

দুধের বাটিটা নিঃশেষ হয়ে যেতেই হঠাৎ পল একটু উচ্চকণ্ঠেই ওকে প্রশ্ন করলো: বলতো কেন তুমি আমার জন্য এতোটা করছ ?

কি এমন করছি আমি?—মেয়েটি কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লো তার পর প্রশ্ন ভরা দৃষ্টিতে পলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কেন, আমার জন্য...এই যে এতো সব করছো...সব কিছু...কেন করছো এতোটা? অসাবধানে বলে ফেলেই পল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো; দেখলো মেয়েটি যেন একটু আঘাত পেয়ে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আমি জানি না, কেন। হয়তো এমনিই। তুমিও তো একটা মানুষ, তাই না? কি বলো? মানুষ না অন্য কিছু? সত্যি, অদ্ভুত লোক তুমি—বলেই মেয়েটি কাঁধে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে উঠলো।

পল অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়তে লাগলো তারপর দেয়ালের দিকে ফিরে চুপ করে শুয়ে রইলো। ওর রুগ্ন মস্তিষ্কের ভিতরে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভাবের উদয় হতে লাগলো। জীবনে এই প্রথম সে পেয়েছে দরদমাখা করুণার পরশ। আর কে সে? না, একটি নারী—আরিফির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আজীবন যাদের সে এসেছে অবজ্ঞা করে, ভয় করে। তাছাড়া, এই কিছুক্ষণ আগেও যে মেয়েটির সম্পর্কে কারখানা ঘরের ভিতরে অমন সব বিশ্রি আলোচনা হয়ে গেছে। কিছুদিন থেকেই পলের অন্তর মেয়েদের সম্পর্কে বেশ একটু উৎসুক হয়ে উঠেছিলো। অবশ্য ওর এ ঔৎসুক্য এমন একটা গোপনীয় বস্তু ছিলো যে সেটা তার নিজের কাছেও লুকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করতো। মাঝে মাঝে দারুণ চটে যেতো সে নিজের উপরে মেয়েদের সম্পর্কিত চিন্তা মনে আসার জন্যে। নারী—সে হচ্ছে অনাদি

অনন্ত কাল ধরে পুরুষের পরম শত্রু। এমন ভীষণ শত্রু যে একান্ত সংগোপনে তারা সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে চুপ করে বসে থাকে; তারপর যখনই বাগে পায় তখনই তারা পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রক্ত চুষে খায়। এতদিন ধরে এই কথাই সে শুনে এসেছে। কখনও কখনও হয়তো পল দেখেছে একটি সুন্দরী মেয়ে ভীরু বনহরিণীর ক্ষিপ্র লঘু পায়ে রাস্তা অতিক্রম করে চলে গেছে। তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে পল বহুদিন ভেবেছ: ঐ এক ফোঁটা একটি মেয়ে কেমন করে সে পুরুষের অমন ভীষণ শত্রু হতে পারে? অন্য সবাই যখন মেয়েদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতো, হয়তো কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে পল তার ঐ সঙ্কোচ ভরা কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলতো। তারপর মনিব ও দোকানের অন্য সব কারিগরদের কাছে দারুণ হাস্যাস্পদ হতো। প্রায়ই ওরা তাদের নিজ নিজ ইন্দ্রিয় পরায়ণতার জন্য কপট অনুশোচনা করতো আর পলের পবিত্রতার জন্য ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। পল বুঝতে পারতো—অনুভব করতো যে পুরুষের জীবনে নারীর একটা বিশেষ, একটা সর্বগ্রাসী অবদান আছে। যদিও ওর সে অনুভূতি ছিলো অগভীর, ভাসা ভাসা। কিন্তু কখনও সে তার এই নিজস্ব চিন্তাধারার সঙ্গে, "নারী পুরুষের পরম শত্রু" এই স্বতঃসিদ্ধ মতবাদের কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেতোনা। একদিন পলের মনিব তাকে উপদেশ ছলে বলেছিলো: কি রে পল! মেয়ে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস? কিন্তু খবর্দার ওদের খপ্পরে গিয়ে পরিস না যেন। তা হলেই জীবনটা খুব ভালো ভাবে কাটবে। যাকে খুসী জিজ্ঞাসা করে দেখিস, বলবে—মেয়েদের চাইতে ভারী শিকল দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। ওরা হচ্ছে গিয়ে, বুঝেছিস, লোভী জানোয়ার; চায় আজীবন কেবল সুখে সচ্ছন্দে থাকতে, কিন্তু কাজ করবেনা একটুও। বিশ্বাস কর আমার কথা! বাহান্ন বছর আমি এই দুনিয়ার বুকে বাস করছি, আর বিয়েও করেছিলাম দু'বার।

তবুও এই মাত্র যে মেয়েটি এখানে ছিলো—হয়তো ভয়ংকরী তবুও মধুর রহস্যময়ী। ওর জীবনে আজ প্রথম সে বয়ে এনেছে আনন্দের পরশ। পল—যে নাকি সদা বিষণ্ণ গম্ভীর, সবার সম্পর্কেই যার অপরিসীম ঔদাসীন্য,

সেও পেয়েছে ওর সুকোমল হাতের সেবা, যত্ন, স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ। সে এসে ছিলো ওর কাছে, বসে ছিলো ওর পাশে—যে নাকি দুনিয়ার বুকে সম্পূর্ণ একা, কেউ কোথাও নেই ত্রিসংসারে যার কাছ থেকে পেতে পারে একটু স্নেহ, একটু দরদ, একটু সৌহৃদ্য।

আচ্ছা, কি করছে সে এখন?—পল ভাবলো; তারপর অতি সন্তর্পণে পাশ ফিরে শুলো যাতে করে আর একটিবার সে দেখতে পায় ঐ মেয়েটিকে। মেঝের উপরে বসে মেয়েটি অর্ধোন্মুক্ত দোরের পথে উঠানের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। ওর মুখখানি সুন্দর, করুণমাখা; আয়ত সুন্দর দুটি চোখ ভরে নীল সাগরের রহস্যের ইশারা; ঠোঁট দুটি রক্তিম, নিটোল পরিপূর্ণ।

এতোখানি করার জন্য তোমায় ধন্যবাদ!—হঠাৎ মেয়েটির পানে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে পল বলে উঠলো।

মেয়েটি কেঁপে উঠলো, তারপর দুটি চোখের প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি মেলে পলের মুখের পানে তাকালো, কিন্তু ওর প্রসারিত হাতখানা গ্রহণ করলো না। ভেবেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। শোন এখানে আর তোমার এক মুহূর্তও থাকা চলবে না; এক্ষুনি তোমাকে এ জায়গা ছাড়তে হবে; ঘরটা ভীষণ স্যাঁতসেতে। ওঠো! চলো!

পল তখন পর্যন্ত তার প্রসারিত হাতখানি সরিয়ে নেয় নি; তেমনি ওর সামনে হাতখানা মেলে রেখেই পুনরায় বললো:

তোমার দয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ!

হা ঈশ্বর! আবার ঐ কথা! আচ্ছা, এমন ভীষণ কি করেছি বলো তো? দয়া টয়া কি সব বলছো...বাইরে বড্ড গরম তাই এখানটায় এসে খানিকক্ষণ বসলাম, এইমাত্র। এস, এস, এখন ওঠো দেখি।

পলের মনে হ'লো মেয়েটি দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

মেয়েটি পলকে ধরে তুলে বিছানার উপরে বসিয়ে দিলো তারপর মুখ খানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো; ভয় হচ্ছিলো পাছে আবার ওর সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে পড়ে।

পল উঠে দাঁড়ালো; ওর সমস্ত দেহের রক্ত যেন লাফিয়ে মাথায় চড়ে বসেছে; কানের ভিতরে আবার শুনতে পাচ্ছে সেই ভোঁ ভোঁ শব্দ...

ভালো হয়ে যাবে দেখো। শিগ্গির শিগ্গিরই তুমি পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বদলী হয়ে যাবে। তোমার যে অসুখ করেছিলো এটা একটা খুব ভালো লক্ষণ। টাইফাসটা হচ্ছে একটা পরমাশ্চর্য রোগ—দেহ, মন, সব শুদ্ধ করে দেয়। একটা লোক যতই খারাপ হোক না কেন—তার আত্মা যতোই হীন, জঘন্য পাপে কলুষিত হোক, কিন্তু একটিবার যদি সে টাইফাস্ রোগে ভুগে ওঠে ব্যস্! তার সব কিছুই পবিত্র হয়ে গেলো। তার কারণটা কি জানো? সেটা হচ্ছে গিয়ে তার ঐ বিকার আর প্রলাপ বকা। জানো, বিকারের সময়ে আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে তারপর চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর ছট্ফট্ করে, অনুতাপ করে। মাইরি বলছি! সত্যি কথা। তুমি হয়তো বলবে এ রোগে অনেকে তো মারাও যায়; সে কথা সত্য বটে। কিন্তু সেটা হচ্ছে তার অদৃষ্ট। বাইবেলে স্পষ্ট লেখা আছে একথা। জানোতো, কেবলমাত্র টাইফাসেই মানুষ মরেনা। বস্তু যখন ক্ষয়ে যায়—ঘসে ঘসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জীবন থেকে, তখন আত্মার নূতন পোষাকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে—দরকার হয় আর একটা নূতন ঘরের। তাছাড়া মানুষের কেবলমাত্র একটাইতো ঘর—এই পৃথিবী। হাঁ, সত্যি কথা! তোমার কোনও আত্মীয় মারা গেছে কি? যায় নি? ওঃ! আমার পরিবারের মারা গেছে এগারো জন। একজনকেতো জ্যান্তই মাটিতে গিলে খেলো। সে ছিলো নলওয়ালা। একদিন নল বসাতে গিয়ে হঠাৎ সে মাটি চাপা পড়ে গেলো, তারপর নিকোলাইকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না; পৃথিবী ঠিক যেন ওকে গিলে ফেললো, অনেক কষ্টে যখন মাটি খুঁড়ে তাকে বের করা হলো, তখন তার হয়ে গেছে, মাইরি বলছি ভাই তোমাকে! সব সময়েই মাটি আমাদের টানতে থাকে, কোথাও গিয়ে নিষ্কৃতি নেই, নদীর ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড় দেখবে তার তলায়ও মাটি; আগুনে ঝাঁপ দেও দেখবে সেখানেও তাই; মাটি সব সময়েই তার নিজের ধাঁধাঁয় আছে। দেখবে আমারও ডাক আসবে খুব শিগ্গিরই।

আনাসিস্ বন্ধু—সে ডাকবে: এসো আমার বুকে—কবরের তলায়! আর তক্ষুণি গিয়ে আমাকে শুয়ে পড়তে হবে। যতোকিছুই তুমি করোনা কেন যেতেই হবে একদিন ব্যস্! এই হচ্ছে নিয়ম, বুঝলে? তুমি পা আছড়ে বলতে পারো, আমি যাবো না; কিন্তু যেইমাত্র সে একটিবার তোমার বুকের

ভিতরে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেবে, তক্ষুণি তোমাকে গিয়ে তার পায়ের তলায় হাঁটু গেরে বসতে হবে; তার পরেই সব ঠিক। তোমার হয়ে গেলো। কিছুই আর বাকী রইলো না। দুনিয়ায় ততক্ষণ পর্যন্তই তুমি বেঁচে আছো, যতক্ষণ চলে ফিরে বেড়াচ্ছো এই মাটির ধরণীর বুকে।...

কখনও কখনও ঘন্টা দুই ধরে সমানে সে অনর্গল বকে যেতো। কেউ ওর কথা শুনলো কি না তাতে ওর কিছুই এসে যেতো না। কথা বলতে বলতে এক সময়ে যখন চোখ দুটো জল জল করে উঠে পরক্ষণেই এক অদ্ভুত ম্লান আভা ফুটে উঠতো ওর সেই বিষণ্ণ দুটি চোখের দৃষ্টি বেয়ে—যেন একখণ্ড হাল্কা মেঘ এসে ঢেকে ফেলেছে চোখের মনিদুটি—তখন ধীর ধীরে ওর কথা আসতো জড়িয়ে, খেই হারা অসংলগ্ন হয়ে উঠতো ভাষা, অবশেষে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কথার মাঝ পথেই থেমে গিয়ে উঠে পড়তো। একটা দারুণ আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠতো ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে।

আর্দালীর কথায় পলের মনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হতো না। কারণ সে ওর একটি কথায়ও কান দিতো না; নিজের চিন্তায়ই সম্পূর্ণ বিভোর হয়ে থাকতো। এক নবোদিত আশার আলোকে ওর অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—জেগে উঠেছে এক অপূর্ব অনুভূতি—যেন কি এক অপূর্ব বস্তু সঞ্চিত হয়ে আছে ওরই জন্যে ভবিষ্যতের অজানা গর্ভে, কিন্তু কি সে বস্তু তাও স্পষ্ট করে কিছুই ধারণা করে উঠতে পারছে না। অতি সামান্য যা কিছু আছে ওর সঞ্চিত ধন, তাই দিয়েই সে রচনা করে চলেছে আকাশসৌধ। জীবন সম্পর্কে পলের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র অন্যের কাছ থেকে শোনা কথার ভিতর দিয়ে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার ব্যাপার সে এরিয়ে এসেছে এতোটা বয়স পর্যন্ত। কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছে যেন কি এক অভিনব, মহান, অজ্ঞাত চেতনা ধীরে ধীরে ওর অন্তরের অন্তঃস্তল উদ্ভাসিত করে উঠেছে জেগে—অদূর-ভবিষ্যতে যা নাকি একদিন ওর সমস্ত জীবন, সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলবে।

বস্তুতঃপক্ষে এতাবৎকাল পল কোন কিছুই সঠিক সম্পূর্ণভাবে ভেবে উঠতে পারতো না; ওর ভাষার নেই প্রাচুর্য, নেই কল্পনার ব্যাপকতা; কিন্তু দীর্ঘদিন হাসপাতালে রোগশয্যায় সংগাহীন থাকার পরে যেদিন

প্রথম জ্ঞান ফিরে পেলো আর যখনই মনে পড়ে গেলো নাতালিয়ার ঘন নীল নিবিড় দুটি আয়ত চোখের কথা, ওর সবটুকু অন্তরজুড়ে জেগে উঠলো এক অভূতপূর্ব আলোড়ন—বোবা হৃদয়ের অতল কালো গহ্বর উদ্ভাসিত করে এক অপূর্ব আলোর ছটা পরিব্যপ্ত হয়ে পড়লো ; জেগে উঠলো এক নূতন চেতনা, নূতন অনুভূতির শিহরণ। তারপর আর্দালীর কাছে যখন শুনতে পেলো যে নাতালিয়া দুবার এসেছিলো হাসপাতালে ওর খোঁজ খবর নিতে তখন তার সেই অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে উঠলো।

দীর্ঘ বিশ বছরের ভিতরে একটি দিনের জন্যেও কেউ ওর মুখের পানে ফিরে তাকায়নি। কিন্তু তবুও তো সে মানুষ—মানুষের স্নেহ ভালোবাসা ছাড়া ওর পক্ষেও বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাছাড়া সাধারণ আর দশজনার চাইতে পল ছিলো স্বতন্ত্র—সে ছিলো একা, ভিতরে বাইরে উভয় দিক থেকেই ছিলো সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন, সাথীহীন একা। অন্য সবার চাইতে তাই স্নেহ ভালোবাসার প্রতি ওর বুভুক্ষা ছিলো আরও প্রবল আরও তীব্র। তার এ ক্ষুধা এ কামনা সংস্কারজাত,—অবচেতন মনের সুগভীর তলদেশ থেকে উদ্ভুত, পল জানতো না তার এই আকর্ষণের রূপ কি—কি ভাবে, কোথায় কেমন করে আসবে এর পূর্ণ পরিণতি; কিন্তু তবুও ওর অন্তর-আকাশে আজ এক নবপ্রভাতের অরুণোদয়। পল সবটুকু অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো এ হচ্ছে কেবলমাত্র সূচনা—অনাগত দিনের রহস্যময় গর্ভে ওর জন্য সঞ্চিত রয়েছে এক নূতন জগত, নূতন পরিবেশ, নূতন চেতনা।

কেন যেন এক অন্ধ পাশব কামনার বলে ওর রোগ জীর্ণ ভগ্ন স্বাস্থ্য দিনে দিনে সুস্থ সবল হয়ে উঠতে লাগলো; আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যময় ভবিষ্যতের ধূসর আবরণ উন্মোচিত করার অত্যুগ্র কামনাও তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগলো।

আর্দালী আনাসিসের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো যখন পলকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বদলী করার হুকুম হলো। তার একমাত্র শ্রোতাটিকেও কিনা সে হারাতে বসেছে। তাই বার বার করে সে এসে বলতে লাগলো যে পলকে বড্ডো অসময়ে বদলী করা হচ্ছে ; এখনও ওর মরে যাওয়ার আশঙ্কা আছে ; কারণ নাকটা এখনও তেমন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে নি।

একদিন পল হাসপাতালের কোট গায়ে বিছানার উপরে শুয়ে ছিলো। একটা আধো-তন্দ্রা, আধো-জাগ্রত অবস্থায় ছাদের গায়ে মাছিগুলোর দিকে শূণ্য দৃষ্টি মেলে নিজের চিন্তার ঘোরে বিভোর হয়ে রয়েছে; হঠাৎ ওর কানের কাছে বেজে উঠলো একটি অতি সুকোমল মৃদু কণ্ঠের সুর: পল!

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে পল যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠলো ; সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও কেমন যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লো।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি এখানে বদলী হয়ে আসতে পেরেছো। এই দেখো তোমার জন্য কি এনেছি...মেয়েটি ওর হাতের ভিতরে একটি মোড়ক গুঁজে দিলো, তারপর হঠাৎ একটু লাল হয়ে উঠে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে চারিদিকে তাকালো।

এক অপূর্ব পুলকের বন্যায় মুহূর্তে পলের সেই আচমকা ভয়ের ভাব অন্তর্হিত হয়ে গেলো ; ওর গালের উপরেও জেগে উঠলো ঈষৎ রক্তিম আভা।

ধন্যবাদ তোমাকে! অসংখ্য ধন্যবাদ! চিরকৃতজ্ঞ আমি তোমার কাছে! বহুৎ! খুব! দয়া করে বসো একটু এখানে—না, না, ওখানে নয়, এখানে, এখানে,...না, না, এখানেই এসো, বসে আরাম পাবে। ধন্যবাদ! এতো ভালো তুমি...ঠিক জেনো...

পল তোতলাতে আরম্ভ করলো। ওর দুচোখ বেয়ে এক অপূর্ব আলোর ছটা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগলো। মুহূর্তে পল যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল—হয়ে উঠলো অন্য মানুষ।

এই অতি অপ্রত্যাশিত সাদর সম্ভাষণে মেয়েটি আরও যেন হকচকিয়ে গেল ; তারপর ঘরের চতুর্দিকে তাকাতে আরম্ভ করলো ; প্রথমে তাকালো একটি রোগীর দিকে তারপর আর একটির—যেন ওর শঙ্কা হচ্ছে পাছে কোন পরিচিত মুখ বেরিয়ে পড়ে, আরসিটা একান্তই অবাঞ্ছিত ওর কাছে।

বেশ, এই বসলাম। না না তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, খুবই খারাপ হবে সেটা তোমার পক্ষে...সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মেয়েটি বলে উঠলো। সোৎসাহে পল ওকে অভয় দিয়ে বললো:

আরে না, না, কিছু ভেবো না তুমি। ওরা সব ভালো...... ঐ রোগীরা...... তুমি কথা বলো......তাতে ওদের কোনই ক্ষতি হবে না......ওরা ভদ্রলোক,

ভালো লোক...আঃ! তুমি এসেছো, কি আনন্দই যে হচ্ছে আমার।—প্রায় চীৎকার করেই পল বলে উঠলো।

ইতিমধ্যে মেয়েটি তার পর্যবেক্ষণ শেষ করে একটু করুণ মিষ্ঠি হাসি হেসে পলের মুখের দিকে তাকালো।

আমারও খুবই আনন্দ হচ্ছে যে তুমি ভালো হয়ে উঠেছ। জানো, আগেও আমি এসেছিলাম, তখন তুমি ছিলে অজ্ঞান অবস্থায়। তোমার জন্য এনেছি আমি...হাঁ, ডাক্তার অনুমতি দিয়েছে। খাও। —বলেই মেয়েটি মোড়কটা খুলতে আরম্ভ করলো:

বিশ্বাস করো তুমি আমার কথা, সত্যি তুমি একটি দেবী! স্বর্গ থেকে নেমে এসেছো তুমি আমার কাছে—ঈশ্বর সাক্ষী...

কি যে বলো তুমি, যা-ও! —মেয়েটি আবার একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো।

না, না, ঠিক তাই। আমি জানি না কেমন করে গুছিয়ে কথা বলতে হয়—কেমন করে বোঝাবো তোমায় আমার অন্তরের কথা! আজীবন আমি মৌন, মূক, ভাষাহীন; কিন্তু তবুও আমি বুঝি সব, দয়া করে আমায় বলে যেতে দাও, বাধা দিওনা। তুমি আমার কে?—কেউ নও, অপরিচিতা মাত্র; আর আমিও তোমার কাছে অপরিচিত, কিন্তু তবুও তুমিই এলে প্রথম......আর দেখো সেদিন—সেই গুদাম ঘরে...কোনই কারণ ছিলোনা আমার জন্য তোমার এতোখানি করার। জীবনের প্রথম দিনটি থেকে আমি একা—একটি দিনের জন্যও পাইনি আমি কারুর কাছ থেকে একটি মিষ্টি কথা, একটু দরদ ...সেটাই হচ্ছে মূল কথা...আঃ! কি সুন্দর কি চমৎকার!—প্রবল উত্তেজনায় পলের হাত দুটো কাঁপতে শুরু করলো।

স্থির হও, শান্ত হও, অমন করোনা। হয়তো তাতে তোমার খুবই ক্ষতি হতে পারে; তাহলে কর্তৃপক্ষ হয়তো আর আমাকে এখানে আসতেই দেবে না।...ওকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে মেয়েটি বললো, কিন্তু তখনও তার সেই বিব্রত ভাব সম্পূর্ণ কেটে ওঠেনি, বরং কেমন যেন আরও অস্বস্তি লাগছিলো ওর অসংলগ্ন উত্তেজিত কথায়। কিন্তু তবু সে খুব ভালো করেই অনুভব করলো যে একমাত্র ওরই জন্য পলের এই আনন্দ, এই সুখ, এই সুমধুর উত্তেজনা।

কি বল্লে? ওরা তোমাকে আসতে দেবে না এখানে?—ভী তারই মুখের পানে তাকিয়ে পল প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলো কে প্রতিবাদের সুরে বলতে আরম্ভ করলো : অসম্ভব! তু মতন। কিছুতেই ওরা তোমাকে এখানে আসতে বাধা দিতে বলেছে তোমাকে ও কথা? যতো সব বাজে কথা! আমার অধিকার তাহলে আমিও নালিশ করবো...

আঃ! তুমিতো দেখছি একটি অদ্ভুত লোক! কিসের জন্য নালিশ করবে? আমি সেকথা বলি নি, কি করতে চাও তুমি? একটা বিপ্লব বাধাতে চাও নাকি এখানে? সত্যি তুমি একটি অতি অদ্ভুত ছেলে!

এতক্ষণে সত্যি সত্যিই পল মেয়েটির কাছে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। মেয়েটিও ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না ওর এতোটা উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণ কি? কিন্তু তবুও নিজেকেই তার কারণ অনুভব করতে পেরে মনে মনে সে যেন একটু বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলো, খুসী হয়ে উঠলো। ক্রমে মেয়েটিও একটু একটু করে সাহসী হয়ে উঠতে আরম্ভ করলো; পলের উপরে বেশ খানিকটা কর্তৃত্বের ভাব প্রকাশ করতে শুরু করলো আর পলও স্বেচ্ছায়, সানন্দে সেটা স্বীকার করে নিলো। ওর কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করা পলের পক্ষে যেমন আনন্দের, পলের উপরে কর্তৃত্ব করতে পাওয়াটাও মেয়েটির পক্ষে ঠিক সমান আনন্দের। মেয়েটি জোর করে পলকে একটা কেক খাওয়ালো তার পর বালিশটা ঝেড়ে ঝুড়ে বিছানা ঠিক করে দিয়ে বেশ খানিকটা দাবীর সুরেই কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো।

মেয়েটির আদরে যত্নে আবদারে পল সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়লো; মেয়েটির মনপ্রাণও পূর্ণ হয়ে উঠলো এক অপূর্ব আনন্দে, অভাবনীয় বিস্ময়ে।

এতক্ষণে পল শান্ত হয়ে উঠলো। তৃপ্ত, আনন্দিত অন্তরে বিস্ময়ভরা দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে সে মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটি ওকে জানালো যে, শিগ্‌গিরই পল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে; তখন সে যেন যায় ওর কাছে; দু জনে মিলে ওরা তখন খাবে চা, বেড়াবে বনে বনে, নৌকায় চড়ে যাবে জল-ভ্রমণে; এক সুমধুর লোভনীয় ছবি সে মেলে ধরলো পলের সামনে।

কিন্তু সবটা খুব ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই দেখা করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো।

বিদায় বেলায় ম্লান দুটি চোখের করুণ দৃষ্টি মেয়েটির মুখের পরে বিছিয়ে দিয়ে পল পুনরায় তাকে আসার জন্য জানালো ব্যাকুল অনুরোধ।

আবার পল একা। চোখ বুঝতেই ওর মানসপটে ভেসে উঠলো মেয়েটির অপরূপ রূপ, সুন্দর মূর্তি: লঘু নিটোল দেহ, সুন্দর রং, গোলাপী গাল, উন্নত নাসা, নীল আয়ত দুটি চোখের আলিঙ্গন ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি; ওর পরণের ঘোর রংয়ের স্কার্ট আর ব্লাউজ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো নরম সোনালী চুল—সব ঘিরে একটা অনারম্বর সহজ সরল আনন্দময় ভাব,—স্নেহ, মায়া, দয়ার পবিত্র প্রতিমূর্তি। যখন সে কথা বলে তখন ছোট্ট ছোট্ট ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি পরিপূর্ণ নিটোল দুটি ঠোঁটের ফাঁকে চিক্‌চিক্‌ করে ওঠে; সব ছাপিয়ে ওর সুঠান সুন্দর তনুদেহখানি ঘিরে যেন ঝরে পড়ে বিগলিত করুণার স্নিগ্ধ প্রস্রবণ।

পল যতোই ওর এই মূর্তি মনে মনে ভাবতে লাগলো, ততোই তার ভিতরে যেন এক আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হতে লাগলো। অবাক বিস্ময়ে দেখলো যে, সে কতো তাড়াতাড়ি, কতো সহজে ওর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছে; আর এই অল্প সময়ের ভিতরেই কতোখানি প্রিয় কতোখানি আপনার হয়ে উঠেছে সে ওর জীবনে। পলের সমস্ত দেহমন ছেয়ে জেগে উঠলো এক কোমল পেলব অনুভূতির অপূর্ব শিহরণ; ধীর ধীরে পল গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো।

এক অনির্বচনীয় আনন্দের আমেজভরা হালকা কুহেলীকার ভিতরে পলের পরবর্তী দিনটি কেটে গেলো। পূর্বদিনের সুখস্মৃতির চিন্তায় বিভোর হয়ে মনে মনে পল বুনে চল্‌লো স্বপ্নের সোনালী ঊর্ণা; সহস্রবার আপন মনেই উঠলো হেসে আর অনুচ্চ কোমল কণ্ঠে বল্‌লো: ধন্যবাদ! ধন্যবাদ তোমাকে...শত শত বার...বারবার এই একটি কথার উচ্চারণের ভিতর দিয়ে যেন সে রূপ দিতে চাইলো ওর অন্তরের জেগে ওঠা বিভিন্ন ভাব ধারার। আগামী কাল আবার রোগীদের সঙ্গে দেখা করার দিন।

হয়তো সে আসবে কাল। একান্ত ঈপ্সিত সেই প্রতীক্ষাভরা মিলনের

কালটি নিয়ে আসবে কোন নূতন আনন্দ, নূতন বার্তা, পল মনে মনে তারই কল্পনার ছবি আঁকতে শুরু করলো আর কেমন করে কি কথায় জানাবে ওকে স্বাগত সম্ভাষণ মনে মনে তারই বাক্য রচনা করে চল্‌লো...কল্পনায় পল দেখলো, সে যেন সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠেছে; নদীর বুকে ভেসে চলেছে একখানা নৌকা আর তারই উপরে বসে পল ওকে বলে চলেছে আরিফির কথা।

এলো সেই বহু আকাঙ্খিত আগামী কাল। জ্বরগ্রস্থ রোগীর মতন বারবার পলের সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। সকাল থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না বেলা পড়ে এলো, প্রতি মুহূর্তে পল তার দুটি চোখের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি মেলে দোরের পথে তাকাতে লাগলো। আকুল প্রতীক্ষমানতায় পলের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠলো—যে কোন মুহূর্তে হয়তো সে এসে পড়বে তারপর সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ঘরের প্রত্যেকটি রোগীর মুখের দিকে তাকাবে, যেমন করে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলো সেই প্রথম দিন। পরে, এসে বসবে সে ওর পাশে, বিছানার উপরে আর তখন দু'জনার ভিতরে শুরু হবে কথা—নানান্‌ বিষয়ের আলাপন...

কিন্তু সময় বয়ে গেলো, সে আর এলোনা।

রাত্রে পল অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারলো না। ভাবতে চেষ্টা করলো, কেন সে এলোনা। ভোর বেলা তীব্র মাথার যন্ত্রণা নিয়ে ওর ঘুম ভাঙলো; পলের সমস্ত অবয়ব ঘিরে যেন নেমে এসেছে এক অলস করুণ হতাশার ছায়া।

পরের দিনও সে তেমনি চুপ চাপ পড়ে রইলো বিছানায়; একটুও নড়লোনা একটুও ভাবলোনা; কল্পনার কোন মোহময় রঙীন ছবিও আঁকলোনা তার মনে মনে; চাইলো না কিছু, প্রত্যাশাও করলো না কোন আকস্মিকতার।

তারপর অনেকে এলো সাক্ষাতের দিন, চলে গেলো—কিন্তু সে আর এলোনা...

বিছানায় শুয়ে শুয়ে পল মনে মনে ভাবতে লাগলো ওর সম্পর্কে যতো-কিছু শুনেছিলো খারাপ কথা। সব কিছু দিয়েই সে তার ঐ নব পরিচিতাকে চিত্রিত করতে লাগলো; কিন্তু কোনও কিছুতেই তার সেই মূর্তি মলিন হয়ে উঠলো না। পল কল্পনায় আঁকলো ওর ছবি: নোংড়া, মাতাল, চোর—

ওকে গালাগাল দিলো, অভিশাপ দিলো, করলো অপমান; কিন্তু তবুও সে তেমনি অম্লান, সুন্দর, করুণাময়ী মূর্তি নিয়ে তার অন্তর আকাশে ভাস্বর হয়ে ফুটে রইলো।

দিন গড়িয়ে চল্‌লো। পল একটু একটু করে বারান্দার উপরে হাঁটতে শুরু করেছে; জানালার সামনেই রাস্তা; জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল ভাবতো হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার কথা—

রৌদ্রকরোজ্জ্বল পথের বুকের উপর দিয়ে সুস্থ সরল কর্মব্যস্ত নর-নারীর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে ফিরে বেড়াবার আকুল আগ্রহে ওর অন্তর উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। কোনও একটি স্ত্রীলোককে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলে পরেই পলের মনে জেগে উঠতা এক অতি ক্ষীণ আশার কম্পিত আলোক শিখা। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বারান্দার শেষ প্রান্তে তাকিয়ে থাকতো আর দেখতো সে আসে কিনা। কিন্তু সে আসতো না। পল নিজেকে দারুণ প্রতারিত মনে করতো—নিবিড় ব্যথায় ওর অন্তর মুচড়ে উঠতো।

একদিন হঠাৎ পল শুনতে পেলো আর্দালীর গলার স্বর:

পল গির্বালিকে আফিসে ডাকছে।

প্রায় ছুটতে ছুটতে পল আফিসে গিয়ে হাজির হলো।

এই নাও! তোমার জন্য দিয়ে গেছে—গোঁফের একটা দিকে পাক দিতে দিতে একজন রোগা ছিপ্‌ছিপে সহকারী ডাক্তার বল্‌লো। তারপর কাগজের একটা মোড়ক সে পলের হাতে তুলে দিলো।

তা—তা—কে দিয়ে গেছে? কম্পিত হাতে মোড়কটা নিতে নিতে পল প্রশ্ন করলো।

একটি বুড়ো গোছের লোক; সে বল্‌লো...

কেমন যেন অসহায়ভাবে পল মাথা নাড়তে আরম্ভ করলো তারপর হাতের মোড়কটা ডাক্তারের সামনে রেখে দিলো।

তোমার মনিব। একটি স্ত্রীলোকও ছিলো তার সঙ্গে—মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মেয়েটির বয়স অল্প, যুবতী।

পলের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো; মোড়কটা পুনরায় হাতে তুলে

নিলো। তার মুখের উপর কি খুব বেশী ব্যাণ্ডেজ ছিলো—পল প্রশ্ন করলে।

খুব বেশী ব্যাণ্ডেজ ছিলো, তার মানে?

না, মানে আমি—না কিছুনা। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুণ! নিশ্চয়ই তার দাঁতে ব্যথা হয়েছিল।

হুঁ—সহকারী ডাক্তার মাথা নাড়তে আরম্ভ করলো—সম্ভব তাই, দাঁত-বেদনাই হয়েছিলো হয়তো। তারপর?

সে আমার কথা কিছু বলে যায় নি?—আগ্রহভরা বিনীত কণ্ঠে পুনরায় পল জিজ্ঞাসা করলো।

হাঁ বলে গেছে। বলে গেছে যে, তুমি একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ, তোমাকে যেন মাপ করা হয়। তা তুমি এখন যেতে পারো, আমরা তোমাকে ক্ষমা করেছি।

পল মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো। বুঝতে পারলো যে তার ঐ ধরণের আচরণের জন্য ওদের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছে। পলের মনে হলো ওর এতোদিন না আসার কারণ আগে থেকেই সে যেন মনে মনে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো। দাঁতের কষ্ট পাচ্ছিলো, কিন্তু যেই মাত্র একটু ভালো হয়েছে অমনি এসেছে ছুটে; কতোখানি করুণা!

এক হপ্তা পরে আবার পল এসে দাঁড়ালো আফিস ঘরে, সেই সহকারী ডাক্তারের সামনে। তখন সে কি একটা বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পড়ছিলো।

তোমার সব জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে এসেছ তো?—প্রশ্ন করেই সে পলের কাছ থেকে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই পুনরায় বলে উঠলো:

বেশ, তবে চলে যাও, নমস্কার।

তাঁকে প্রতি নমস্কার করে পল রাস্তায় নেমে এলো। আধ ঘণ্টা পরে রোদ্রে আর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পল যখন কারখানায় এসে ঢুকলো তখন ওর মাথা ঘুরছিলো, চোখে কেমন জানি ঝাপসা দেখছিলো।

আঃ! এসে গেছো দেখচি! লক্ষ্মী ছেলে...খুব রোগা হয়ে গেছোতো... যাক্‌গে, তাতে ক্ষতি নেই। হাসতেও শিখেছ দেখছি যে।

ঘরের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সত্যিই পল যখন কারখানার ভিতরে এসে দাঁড়ালো তখন ওর অন্তর মুখরিত করে জেগে উঠেছিলো এক স্নিগ্ধ

কোমল ভাব। এখানকার সবকিছুই যেন ওর মনে হচ্ছিলো সুন্দর, সবাই যেন ওর পরিচিত একান্ত আপনার জন; এমন কি ঝুল কালি মাথা জীর্ণ দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে ঐ যে সাদা দাগগুলো—একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কেমন করে ঐ জায়গাগুলো ঝুল আর কালির নোংড়া আস্তরণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে—পলের মনে হলো যেন ওগুলোও মৃদু হেসে ওকে জানাচ্ছে স্বাগত সম্ভাষণ। ঘরের কোণের দিকে পলের বিছানাটা ঠিক তেমনি রয়েছে—মাথার উপরে দুখানা ছবি টাঙানো—'শেষ বিচারের দিন' আর 'জীবনের পথে'।

মিশ্‌কা হা'করে এসে ওর সামনে দাঁড়ালো; তার কালো চঞ্চল দুটি চোখ পলের মুখের পানে নিবদ্ধ আর দৃষ্টিভরে ফুটে উঠেছে একটা সত্যিকারের আনন্দের আভা।

মিরণ টোপোরকভ বলতে শুরু করলো:

এসো, এসো, ভিতরে এসে বোসো, বিশ্রাম করো। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। মিশ্‌কা আর আমি দু'জনে মিলেই সব কাজকর্ম চালাচ্ছি। রাজহাঁস তো দারুণ মদ খেতে শুরু করেছে। আমি আর নূতন কাউকে রাখলুম না, ভাবলাম যে কোন সময়েই হয়তো তুমি এসে পড়বে। তা বেশ হলো এবার। এখন যতো ইচ্ছা সেলাই করা যাবে। ভালোকথা, আমি নিজেই আবার কাজ করতে আরম্ভ করেছি। অনেক দিন আর মদ খাইনা—অবশ্য একেবারে খাইনা যে তা নয় তবে বে-এক্তার হয়ে পড়ার মতন করে খাইনা আর।

পল যতোই শুনতে লাগলো ততই মনে মনে দারুণ খুসী হয়ে উঠতে লাগলো। কারণ প্রথমতঃ হচ্ছে এই যে মনিব খুব খুসী হয়ে খাতির করে কথা বলছে ওর সঙ্গে আর দ্বিতীয়তঃ তার বলার ভিতর দিয়ে কেমন যেন একটু অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠছে। দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো পল।

সত্যি কথা মিরণ, এবার আমাদের খুব ভালো করে কাজকর্ম শুরু করতে হবে—মনিবের কথা শেষ হতে না হতেই উৎসাহভরে পল বলে উঠলো। মিরণ ততক্ষণে এক টুকরা চামড়া তুলে নিয়ে একটা পুরানো জুতায় তালি দেওয়ার জন্য মাপ-জোখ করে দেখতে আরম্ভ করেছে।

সত্যি আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি হাসপাতালে আমার খোঁজখবর নিতে যাওয়ার জন্য। এটা আমার কাছে একটা মস্তো বড়ো ঘটনা; কারণ, দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই আমার আপনার জন...

হেঃ! থামো, থামো!—পলের কথায় বাধা দিয়ে মিরণ বলে উঠলো। তা হলে কথাবার্তা বলতেও শিখেছ এখন! কি হে ছোকরা! তাই তো বলি, মন্দেরও একটা ভালো দিক আছে। অসুখের আগে এতো কথা এক সঙ্গে বলতে হলে তো দম আটকে মরে যেতে। তা বেশ বেশ ভালো। সময়? খুব ভালো সময় পড়েছে এখন! হাঁ, আর একটা কথা—নাতালিয়ার সঙ্গে একটিবার তুমি দেখা করে এসোগে! যদিও মেয়েটা হচ্ছে গিয়ে তাই—তবুও ওকে তোমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসা দরকার। ধারণাও করতে পারবেনা তুমি, মেয়েটা তোমার জন্যে কতোখানি ভাবতো...সত্যি তোমার জন্য ভেবে ভেবে ওর ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। প্রায় প্রত্যেক দিনই একবার করে এখানে এসে তোমার খোঁজ খবর নিতো: গিয়েছিলে হাসপাতালে? দেখে এসেছ তাকে? কেমন আছে এখন?...বুঝেছ ভায়া মেয়েটার মধ্যে এখনও অনেক সৎগুণ আছে। সেও তো মানুষ, তাই অভিযোগ করে লাভ কি আছে। যাও হে যাও একবার তার সঙ্গে দেখা করে এসো গে! ভাবতে পারো ঐ জাতের একটা মেয়ে আর হঠাৎ কিনা...উঃ! কি চমৎকার বক্তৃতাই না দিয়েছিলো সেদিন, যেদিন তোমার আরোগ্য কামনায় আমরা তোমার স্বাস্থ্য পান করছিলাম। বিশ্বাস করো জীবনে আমি কখনও অমন সুন্দর বক্তৃতা শুনিনি।

"লোকে আমাদের মতন মেয়েকে কি চক্ষে দেখে?"—সে বললো আমার কাছে—"আমরা যেন অস্পৃস্যা, নোংরা, নেড়ীকুত্তার জাত, তাইনা?"

ঠিক কথা—আমি বল্লুম।

কিন্তু সে—নাতালিয়া বল্লো, মানে তোমাকে উদ্দেশ্য করে—সে যেন ঠিক আপনার জনের মতন, নিকট আত্মীয়ের মতন আমার সঙ্গে ব্যবহার করলো। তার মানে কি? বুঝেছ ঠাকুর্দা মিরণ?

হাঁ, আমি বুঝেছি, ভাই!—আমি বললাম।

হাঁ, আমিও তাই তার সঙ্গে ঠিক তেমনি ব্যবহার করে প্রতিদান দেবো।

—মনে হবে কথাটা খুবই সাধারণ, তাই না? কিন্তু তবুও অদ্ভুত! যেন বাস্তব জীবনের নয়। বাস্তব জীবনে এমনটি কখনও ঘটেনা। আমাদের পরিচিত জীবনে যা সচরাচর ঘটে এর সঙ্গে কোথাও যেন তার মিল নেই এতটুকুও...

মিরণ আর বেশী কিছু বলতে পারলো না; বলতে বলতে কি যেন একটা অজ্ঞাত বস্তু তার গলার ভিতরে আটকে গেলো, পল কিছুতেই তার হদিস পেলো না।

একটা খুসী ভরা একাগ্রতা নিয়ে সে বসে শুনছিলো মিরণের কথা। মিরণ তার অন্তরের জেগে ওঠা ভাবাবেগ ভাষায় ব্যক্ত করতে না পেরে অনির্দিষ্টভাবে কয়েকবার হাত নেড়ে চুপ হয়ে গেলো। তেমনি আগ্রহভরা একাগ্র দৃষ্টি মেলে পল তখনও ওর মুখের পানে তাকিয়ে বসে রয়েছে।

পলের মুখেও কথা নেই। মিরণের কথায় ওর অন্তরে এমন এক অনির্বচনীয় আনন্দের বান ডেকে উঠলো যে সেও চাইলো তার অন্তরখানি মিরণের কাছে খুলে ধরতে; কিন্তু আর ভাষা খুঁজে না পেয়ে সেও কেবল মাত্র বারবার মিরণকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো:

আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুণ! —পল যে কতোখানি কৃতজ্ঞ তার মনিবের কাছে তা আর ভাষায় প্রকাশ করে বলতে না পেরে করমর্দনের অভিপ্রায়ে সে মিরণের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

ঠিকই বলেছেন আপনি, এই অসুখটাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে—খুবই ঠিক কথা। রোগে পড়ার আগে-পর্যন্ত আমি ছিলাম একটা জন্তু বিশেষ; ছিলাম রুগ্ন—দেহ মনে। কিন্তু এখন দেখছি আমিও মানুষ হয়ে উঠেছি; লোকে আমার জন্যেও ভাবে, চিন্তা করে, মানুষ বলে গণ্য করে আমাকে। তাই আপনাক অসংখ্য ধন্যবাদ!...এই নিতান্ত সাধারণ অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়েই পল তার মনিবের কাছে নিজের অন্তরখানি উন্মোচিত করে ধরলো।

এটা অবশ্য তুমি খুব বাজে কথা বলছ। অসুখের আগে লোকে তোমাকে ভালো চক্ষে দেখতো না তো কি হয়েছে তাতে? তোমার স্বভাবটা কিছু অদ্ভুত গোছের ছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও আমি একটা কথা বলতে

চাই তোমাকে যে, আমি এখনও নিশ্চয় করে বুঝে উঠতে পারিনি কোনটা ভালো—লোকজনদের এড়িয়ে চলা না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। দুনিয়ায় ভালো সঙ্গী পাওয়া বড়ো শক্ত কিনা!...অবশ্য বন্ধুত্ব করতে পারো কিন্তু তবুও তোমাকে থাকতে হবে মুখটি বুজে আর হাতের মুঠোটিও শক্ত করে। তাছাড়া যদি কেউ ঠকায় তো রাগ করে কোন ফল নেই; কারণ, সবাই চায় সবাইকে ঠকাতে—এটাই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। জীবনটা এতোই কোলাহলময়, এতোই ভিড়বহুল যে কিছুতেই তুমি পাশের লোকটিকে ধাক্কা না দিয়ে চলতে পারবে না। তবে অবশ্য লাথি খাওয়ার চাইতে লাথি দেওয়াই ভালো। কিন্তু সংসারে সব চাইতে প্রয়োজন হচ্ছে মেয়েদের সম্পর্কে একটু সজাগ দৃষ্টি রেখে চলা। ওরা এমন চালাক, কোন ফাঁকে কখন যে তোমার গায়ে আঁটার মতন লেপ্টে যাবে তা টেরও পাবেনা। এক নম্বর হচ্ছে, মেয়েটা তোমার দিকে তাকিয়ে হাসবে, দু'নম্বর, তোমাকে চুমু খাবে, তিন নম্বর—তোমার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে, চার নম্বর তুমি তার জন্য খাটতে শুরু করবে আর পাঁচ নম্বর—অসহ্য হয়ে উঠবে তোমার জীবন। তুমি তখন চাইবে নিজেকে মুক্ত করতে, কিন্তু হায়! হায়! ঐ বিড়ালীগুলোর থাবা এমন ধারালো—এমন শক্ত যে কিছুতেই তুমি ছাড়াতে পারবে না। মরার আগে অন্ততঃপক্ষে পাঁচটিবার তোমার মৃত্যু হবে, বুঝেছ বন্ধু...মিরণ ক্রমেই উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগলো; হাতে কাজ করতে করতে মুখে মুখে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমানে চললো তার ঐ দার্শনিকতা।

পল একটা কাঁটা দিয়ে আনমনে কি যেন একটা খোঁচাতে খোঁচাতে একাগ্র মনে শুনছিলো তার কথা; কিন্তু মনিবের ঐ দার্শনিক স্বগতোক্তিতে তার মনে আদৌ কোনও রেখাপাত করছিলোনা—তার নিজস্ব চিন্তাধারার উপরে পড়লো না কোন প্রভাব।

যাকগে, ঢের হয়েছে!—হাতের কাজ এবং মুখের দার্শনিকতা দু'টোই এক সঙ্গে শেষ করে মিরণ বলে উঠলো।—যাও হে, এখন একটু শুয়ে পড়গে, বিশ্রাম নাও। না হয় রাস্তায় বেরিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে এসোনা কেন?

না, তার চাইতে আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করে আসিগে...চোখ নীচু করে নম্র কণ্ঠে পল বললো।

কার কথা বলছো? নাতালিয়ার? হুঁ...তা যাবে যাও—কেমন যেন একটু চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললো মিরণ কিন্তু যেই পল বাইরে নেমে এলো, মিরণ পিছন থেকে ডেকে বলে উঠলো:

দেখো যেন শেষ পর্যন্ত ও তোমাকে বিয়ে না করে বসে! হিঃ হিঃ! তুমি বুঝতেই পারবেনা কোথা থেকে কি ঘটে গেলো...ওরা বড্ডো চতুর কিনা।

মিরণের এই শেষোক্ত মন্তব্যে পল মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলো। সে তো জানে এবং বোঝে যে নাতালিয়া আদৌ সে ধরণের মেয়ে নয়। পল নিজেও তো তার সম্পর্কে কতোই না খারাপ ধারণা পোষণ করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৈ তাতো টিকলো না! এতো মায়া এতো মমতা ওর হৃদয়ে —আর সেটাইতো ওর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

এমনি নানা ধরণের পরস্পর বিরোধী চিন্তায় বিভোর হয়ে পল পথ চলতে লাগলো; বুঝেই উঠতে পারলো না কেমন করে কখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নাতালিয়ার ছোট্ট ঘরটির আধখোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পলের কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগতে লাগলো; ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েও কি ভেবে যেন একটু ইতস্ততঃ করে থমকে দাঁড়ালো, ভাবলো একটু কেশে ওর আগমনের কথাটা আগেই জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু যদিও পল বেশ জোরে জোরেই কয়েকবার গলা খাঁকরে উঠলো তবুও দরজার ওপাশ থেকে কোনই সাড়া এলো না।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে—পল ভাবলো, কিন্তু তবুও সে চলে গেলো না। দুটো হাত পিছনের দিকে করে দোরের সামনে এসে অপেক্ষা করে রইলো আর আশা করতে লাগলো, হয়তো যে কোনও মুহূর্তেই তার ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে পড়বে।

রাস্তার উপর থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছে; দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ ছাদের উপরের দিকটা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে; তপ্ত মাটির গুমটে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পলের নাকে এসে লাগলো।

হঠাৎ পল দেখতে পেলো, দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে, এক পা পিছিয়ে গিয়ে পল সসম্ভ্রমে টুপী খুলে মাথা নীচু করে মেয়েটির মুখ থেকে কিছু একটা শোনার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো; কিন্তু

সে কিছুই তো কৈ বলে উঠলো না! তারপর মাথা তুলে দেখলো কেউই নেই ওর সামনে দাঁড়িয়ে, আর ঘরটাও শূণ্য—জনপ্রাণীহীন। খোলা জানালার পথে দমকা হাওয়া এসে দোরটাকে পাটে পাট খুলে দিয়ে গেছে।

পল ঘরের ভিতরে তাকালো। জিনিষপত্র সব ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে; ঘরটা গোছানো হয়নি; দেয়ালের পাশে বিছানাটা চট্‌কানো; বিছানার সামনে টেবিলের উপরে এ'টো থালাবাসন, ভুক্তাবশেষ খাদ্যের টুকরা, পোড়া সিগারেটের বাট, খালি দুটো বিয়ারের বোতল, একটা কেট্‌লী, চায়ের কাপ। বাবা রংয়ের একটা স্কার্ট, জুতা, ছে'ড়াখোঁড়া কতগুলি কাগজের ফুল এক সঙ্গে মেঝের উপরে লোটাচ্ছে।

এই দৃশ্যে পলের মনটা দমে গেলো। ভাবলো এক্ষুণি চলে যাবে, কিন্তু তার পরিবর্তে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। ছাদের একটা দিকে খানিকটা জায়গায় নীল কাগজের আস্তরণ অদ্ভুতভাবে ছি'ড়ে ঠিক যেন একটা মৃতের কফিনের ঢাকনার মতন হয়ে আছে। স্থানে স্থানে ছি'ড়ে ঝুলে পড়েছে। দেয়ালের কাগজ ঘরের এই জীর্ণ চেহারা সমস্ত বিশৃঙ্খলার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়ে যেন এক অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করে আছে—যেন কেউ ঘরটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে।

পলের বুক চিরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো; ধীরে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে চেয়ারের উপরে বসে পড়লো।

চলেই যাইনা কেন?—পল ভাবলো, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো স্থান পরিত্যাগ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তার নেই। কেমন করেই বা চলে যাই? সে ঘরে নেই, দোর খোলা—তালাটা পর্যন্ত বন্ধ করে যায়নি! তাছাড়া জিনিষপত্র সব এলোমেলো ছড়ানো পড়ে রয়েছে...নিশ্চয়ই দূরে কোথাও যায়নি...এখানেই আসপাশে কোথাও হয়তো আছে...

পল উঠে জানালার পথে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখলো, কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা।

জানালার ভিতর দিয়ে শহরটাকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে;—কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে শহরটা—কেবল মাত্র ছাদ আর ছাদ; মাঝে মাঝে সবুজ দ্বীপের মতন দু'একটা বাগান। লাল, নীল সবুজ ছাদগুলো যেন এলোমেলো-

ভাবে গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে আছে ; তারই ভিতরে গির্জার সুউচ্চ চূড়ার উপরের ক্রুশটা অস্তগামী সূর্যের শেষ ম্লান আলোয় ঈষৎ আলোকিত হয়ে আকাশের গায়ে মাথা উচিঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিক থেকে সায়হ্নের হালকা কুয়াসা ঐ ছাদগুলির উপরে ধূসর ধোঁয়ার মতন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে সমস্ত শহরটাকে কোমল অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে; ধীরে ধীরে সবুজ দ্বীপ গুলি বাড়ী ঘরগুলোর সংগে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

পল দেখলো সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে সমগ্র ধরণীকে গ্রাস করে ফেলেছে; পলের অন্তর কেমন যেন এক অজ্ঞাত ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে উঠলো। দূরে আকাশের গায়ে যেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে সেখানে ফুটে উঠেছে দুটি তারা—একটি বড়ো, লাল উজ্জ্বল, অপরটি কেবলমাত্র যেন একটুখানি মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে উঠেই পরক্ষণে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

খুবই ভালো হতো যদি তাদের মতন হওয়া যেতো যারা সব কিছুরই অর্থ সব কিছুরই তাৎপর্য বুঝতে পারে। যারা জানে কি গভীর রহস্য লুকানো রয়েছে ঐ সন্ধ্যার বুকে, ঐ আকাশ, নক্ষত্র, ঐ ঘুমন্ত নগরী আর নিজের অন্তরে জেগে উঠা ঐ ভাবধারার ভিতরে—যারা জানে কি তার মানে? জানে, সমস্ত 'কেন' এবং 'কোথাথেকে'র জবাব—কি গভীর গুহ্যতত্ব নিহিত রয়েছে এই বিশ্ব দুনিয়ার অতল হৃদয়ের গোপন অন্তস্তলে। যে জেনেছে এই দুনিয়াকে সঠিক ভাবে—জেনেছে কেনই বা তার এই সংসারে আসা আর জীবনে তার স্থানই বা কোনখানে; যে লোক এ সব জানে, বোধহয় সে তার সমস্ত জীবনটিকে ঐ ঘনায়মান সন্ধ্যার কোমল ছায়াখানির মতন তেমনি সুন্দর তেমনি মধুর তেমনি আলিঙ্গনভরা উষ্ণতায় ভরপুর করে তুলতে পারে। সমস্ত মানুষকে পারে সে এমন ভাবে মিলাতে যাতে করে প্রত্যেকটি লোক অপরের ভিতরে দেখতে পায় তার নিজের প্রতিচ্ছবি, কিন্তু তা দেখে আঁৎকে ওঠে না, পায় না ভয়।

জানালার সামনে বসে ভাবতে ভাবতে পল এমন গভীরভাবে তন্ময় হয়ে পড়েছে যে জানতেও পারেনি কখন সন্ধ্যার হালকা অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র যখন উঠানের ভিতরে উচ্চকণ্ঠের চীৎকার শুনতে পেয়ে নীচের দিকে তাকালো তখন বুঝতে পারলো যে, সে বহুক্ষণ ধরে বসে আছে,—

রাত্রি গভীর হয়ে উঠেছে, তারায় তারায় ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ। পলের ঘুম পেলো ; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। ঘরের বাইরে আসতেই পল সিঁড়ির উপরে ভারী অসংলগ্ন পায়ের উচ্চ শব্দ শুনতে পেয়েই থমকে দাঁড়ালো।

একটি অস্থির মূর্তি টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে ; উঠতে উঠতে কান্নাভাঙ্গাস্বরে কি যেন বকতে বকতে আসছে। পল চকিতে একটু পাশে সরে গিয়ে দরজার একটা পাটের আঁড়ালে দাঁড়ালো।

পাজী বদমাইশ!—জড়িত কণ্ঠে মূর্তিটি গজ্ গজ্ করে উঠলো। পল ভাবলো কেউ হয়তো এসেছে নাতালিয়ার কাছে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল যে, আর কেউ নয়, স্বয়ং নাতালিয়া তখন সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। দূর থেকেও পল ওর গায়ে মদের গন্ধ পাচ্ছিলো; কাছে আসতেই দেখলো ওর বেশ-বাস অসংবৃত, মলিন; কথা বলতে পারছে না, নাতালিয়ার অবস্থা দেখে পলের অন্তর করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠলো; কিন্তু কি যেন এক অজ্ঞাত কারণে সে ওর সাহায্যের জন্য এগিয়ে না গিয়ে তেমনি ভাবেই দরজার আড়ালে আত্মগোপন করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। নাতালিয়া কাঁধ দিয়ে দরজার উপরে এমন ভাবে ধাক্কা দিলো যে দরজার আড়ালে দাঁড়ানো পলের দেহটা দেওয়ালের সঙ্গে চিপ্টে গেলো; পরক্ষণেই নাতালিয়া ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। ঢুকতেই গ্লাস বোতল প্রভৃতি নীচে পড়ে গিয়ে সশব্দে ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ উঠতে লাগলো।

জাহান্নামে যা...সবাই...দূর যা...ছাই...

পলের বুকের ভিতরটা কি এক অজ্ঞাত ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠলো ; ঐ জড়িত মত্ত কণ্ঠে ফুটে উঠেছে কেমন এ যেন একটা গভীর তিক্ত সুর। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো—যদিও সেটা আদৌ ওর কাছে প্রীতিকর কিম্বা সুখশ্রাব্য হচ্ছিলো না।

ঘরের ভিতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো প্রতিবাদ ভরা তীক্ষ্ম সুর :

মারলে আমাকে...কুকুর...কেন মারবে আমাকে? নিশ্চয়ই আমি চাইতে পারি......জোচ্চোর কোথাকার! তিন টাকা......টাকা আমি চাই-ই! তুই

ভেবেছিলি মেয়েটা তো ঐ......তাই তুই মারতে পারিস......মারতে পারিস! না তুই মিথ্যুক......মিথ্যুক......আমি বেশ বুঝতে পারি। না হয় আমি মানুষ নই......ধরলুম ঠিক কথা......মানুষ নই......নষ্ট......কিন্তু তাবলে আমার......হকের টাকা চাইবার......নিশ্চয়ই অধিকার আছে......নিশ্চয়ই দাবী করতে পারি আমি......তিন টাকা!

তিন টাকা কথাটা এমন তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে উঠলো যেন ওর সেই স্বরের ভিতর দিয়ে একটা মর্মান্তিক ব্যথা একটা সুতীব্র ঘৃণা ঝরে পড়লো ; পলের অন্তরও যেন ঐ ব্যথায় ঐ ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। দ্রুত পায়ে পল সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো; শেষ ধাপে পোঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলো থালাগুলো মেঝের উপরে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে যাওয়ার শব্দ।

নিশ্চয়ই টেবিলটা উল্টে পড়েছে...পল উচ্চকণ্ঠেই বলে উঠলো। ইতিমধ্যে সে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর মনে হলো কিছু একটা করা দরকার। টুপিটা হাতে করে দাঁড়িয়ে শুনলো সে তার বুকের ভিতরের মুচড়ে ওঠা ব্যথার টনাটনানী...মনে হলো কে যেন হাতুড়ী দিয়ে পিটছে তার হৃদপিন্ডটার উপরে... সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেলো—কেন? কিছুই পল আর স্পষ্ট ভেবে উঠতে পারলো না।

যতো সব বেজম্মার দল! পলের কণ্ঠ অনুচ্চ: এতারৎকাল যতো গালাগাল সে শুনেছে—অনুচ্চ তীব্রকণ্ঠে একটি একটি করে সবগুলিই সে আউরে গেলো। পরে যখন ওর বুকটা একটু হালকা হয়ে এলো তখন বাইরে বেরিয়ে এসে দেয়ালের গায়ে পিঠ হেলান দিয়ে বেঞ্চের উপরে বসে পড়লো। কল্পনায় দেখতে পেলো পল তার চোখের সামনে দিয়ে অগণিত নারীদেহের মিছিল, ঘোর অন্ধকার পরিত্যক্ত পথের উপর দিয়ে ঘৃণাভরা কণ্ঠে কি যেন বলতে বলতে হেঁটে চলেছে...এক অব্যক্ত অসহনীয় ব্যথায় পলের অন্তর মুচড়ে উঠলো, ধীরে পল্ কারখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

কিহে পল কেমন কাটলো—পরের দিন সকালে পলকে দেখতে পেয়ে একটু মুচকি হেসে মিরণ প্রশ্ন করলো,—ওখানেই ছিলে নাকি রাত্রে? ওকে ধন্যবাদ জানিয়েছো তো, কি বলো?

সে...বাড়ী...ছিলোনা—মিরণের চোখের দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর কণ্ঠে

পল জবাব দিলো।

তাই নাকি? বেশতো তাই যেন হলো, আমরা লিখে রেখে দেবো যে বলতে গেলে সে বাড়ী ছিলো না!—বলেই মিরণ কাজ হাতে পলের সামনে এসে বসলো।

মেয়েটা নিশ্চয়ই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়— পুনরায় মিরণ বলতে শুরু করলো: খুবই খারাপ, মেয়েটার অন্তঃকরণ এমন চমৎকার! সত্যি খুবই খারাপ! যাকগে, কেবলমাত্র মনে মনে করুণা করা ছাড়া কিছুই আর করার নেই ওর সম্পর্কে। নাঃ, তার বেশী আর কিছুই করার নেই, ও হচ্ছে সেই তাদেরই একজন।

নীরবে পল চামড়ার ভিতর দিয়ে দ্রুত মোমে মাখা সুতা চালিয়ে সেলাই করে চলছে; কাজ করতে করতে মিরণ গুণগুণ করে সুর ভাঁজতে আরম্ভ করেছে।

মিরণ ;—অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর পল তার মনিবের দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করলো—

হুঁ, কি?—মুখ তুলে মিরণ প্রশ্ন করলো।

আপনি কি মনে করেন সে ঐ নরক কুণ্ডের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে কোন দিন।

কে? হুঁ! হয়তো পারলেও পারে, কিন্তু না পারার সম্ভাবনাই সব চাইতে বেশী। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখলে মনে হয়তো সে পারলেওবা পারে। বলা কঠিন, বুঝেছ বন্ধু! তবে হাঁ, ধরো যদি এমন কোন শক্ত পুরুষের পাল্লায় পড়ে যে দুহাত দিয়ে ওকে আগলে রাখতে পারবে... অবশ্য তবুও সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ যে শেষ পর্যন্ত কে হারবে আর কে জিতবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, আজকাল আর বোকা কেউ নেই, কারণ এখন এতো কনে পাওয়া যাচ্ছে যে—ঠিক যেন গরমের দিনের মাছির মতন ওরা চারিদিকে ভ্যান্ ভ্যান্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। এমন কি ভালো কনেরাও এখন আর ভাল দাম পায় না। এই ধরো না যেমন আমাদের রাজহাঁস—সে বিয়ে করলো; যৌতুক হিসাবেও পেলো দুশ টাকা; তাছাড়া মেয়েটি কি, যেন পরী! লেখাপড়া পর্যন্ত জানে। কিন্তু নিশ্চয়ই মেয়েটা ওকে ঠেকাতে বাধ্য।

কারণ, দেখ কি ধরণের মাল সে সওদা করেছে? রাজহাঁসের বয়েস প্রায় পঞ্চাশ আর মেয়েটার বয়েস মোটে সতেরো; এমন একটা মেয়ে কিনা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলো রাজহাঁসকে! তা আবার দু'শ টাকা নগদ যৌতুক দিয়ে। আর ঐ টাকার জন্যেই তো রাজহাঁস ওকে বিয়ে করেছে। অঢেল কনে পাওয়া যাচ্ছে আজকাল; পথেঘাটে কনের ছড়াছড়ি আর তেমনি সস্তা। কিন্তু কেন? আজকাল বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে একটা বিষম সমস্যা, বুঝলে ছোকরা? গাদা গাদা লোক কেবল জন্মাচ্ছে। এখন যদি আইন করে বেশ কিছুদিনের জন্য বিয়ে বন্ধ করে দেয়া যায়—এই ধরো খুব কম করেও পঞ্চাশটি বছরের জন্য, তবে গিয়ে ঠিক হয়। চমৎকার হয় তাহলে! সত্যি ভালো হয়,—আমি শপথ করে বলতে পারি একথা, বুঝলে?

নিজের কথায় বৃদ্ধ মিরণ নিজেই উত্তরোত্তর উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগলো। তারপর সে তার ঐ মতবাদ বিশ্লেষণ করে বলতে আরম্ভ করলো। পল নীরব। দেখলে মনে হবে যেন সে খুব মন দিয়ে একাগ্রভাবে শুনে চলেছে ওর কথা; কিন্তু যেইমাত্র মিরণ কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-শাসন করে লোকসংখ্যা কমিয়ে সমস্যা সমাধানের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছালো, হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে পল বলে উঠলো:

মিরণ! আমি যদি ওকে কিছু একটা উপহার দি তো কেমন হয়?

ওকে? মানে তুমি বলছো নাতালিয়াকে?—কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মিরণ প্রশ্ন করলো, তার এমন একটা মূল্যবান কল্পনা পল মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে নষ্ট করে দিল তাই ক্ষুণ্ণ মনেই মিরণ ছাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিলো। হাঁ, তা' দিতে পারো কিছু একটা উপহার। কেন পারবে না? জানো, সে তোমার জন্য অনেক খরচ করেছে!

বলেই মিরণ চুপ করে গেলো তারপর আবার আপন মনেই গুন্‌গুন্‌ করে সুর ভাঁজতে আরম্ভ করলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার ওরা এসে মুখোমুখী বসে পরম উৎসাহে কাজ সুরু করে দিলো। দিনটা বেজায় গরম। দরজা-জানালা সব খোলা থাকা সত্ত্বেও ঘরের ভিতরে কেমন যেন দম আটকে আসছিলো। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মিরণ গরমের বিরুদ্ধে একটা কটু বক্তব্য করে উঠলো—নরকের

আবহাওয়াও বোধ হয় এর চাইতে অন্ততঃপক্ষে দশ ডিগ্রি কম। এই বুট-গুলো তৈরী করে দেবার নির্দিষ্ট কড়ার না থাকলে নিশ্চয়ই সে সানন্দে নরকে যেতেও রাজী হয়ে যেতো।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আপন মনে পল কপাল কুঁচকে চামড়া সেলাই করে চলেছে, তাহলে বলতে চান আপনি যে, মোটামুটি সে মেয়ে ভালো।

কিন্তু কেন?—সন্ধানী দৃষ্টিমেলে মনিব নতমুখে পলের দিকে তাকালো।

না, এই অমনিই!—পল ছোট্ট করে জবাব দিলো।

না হে, ওতে তেমন বেশী কিছু বলা হলো না!—মিরণ হেসে উঠলো। আর কি বলবো?—পলের কণ্ঠে কেমন যেন একটু ক্লান্তি একটু ব্যথার আভাস ফুটে উঠলো।

দু'জনেই আবার চুপ করে গেলো।

আর কিছুই করবার নেই তবে?—একান্ত ভীরু প্রশ্ন, মিরণ কোনই জবাব দিলো না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পল নিজেই হঠাৎ প্রতিবাদ করে উঠলো: দেখুন, এটা কিন্তু খুবই ভুল! মোটেই ঠিক নয় একথা! সে ভালো মেয়ে —তবুও এছাড়া ওর আর অন্য কোন উপায় নেই—এটা একটা দারুণ লজ্জার কথা!— উত্তেজনায় পল টেবিলটার উপরে একটা লাথি মারলো।

তাহলে কোনওদিনই আর সে নিজেকে বদলাতে পারবে না, কেমন? হিস্!—দাঁতের ফাঁক দিয়ে মিরণ শিস দিয়ে উঠলো তারপর একটু বিদ্রুপের হাসি হেসে বল্‌লো: সবে তোমার এই নূতন শিং গজিয়েছে পল!—কশাই খানায় তাড়িয়ে নেয়া ভেড়ার মতন, হাঃ হাঃ হাঃ!

সন্ধ্যাবেলা কাজকর্ম চুকিয়ে পল কারখানার হল ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো তারপর নেমে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাতালিয়ার ঘরের জানালার দিকে তাকালো। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নেই, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করতে লাগলো জানালার পথে ওকে দেখা যায় কিনা। তারপর আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে না পেরে রাস্তায় নেমে আগের দিন রাত্রে যে বেঞ্চটার উপরে বসেছিলো, সেই বেঞ্চটার

উপরে গিয়ে বসলো।

নাতালিয়ার সম্পর্কে মিরণের কথা কিছুতেই পল ভুলতে পারছিলো না। ওর কথা চিন্তা করে পলের অন্তরে এক অনির্বচনীয় করুণার রসে আপ্লুত হয়ে উঠলো। জীবন সম্পর্কে আগের তুলনায় পল এখন ঢের বেশী জানে—শিখেছে ভাবতে, কল্পনা করতে ; নাতালিয়ার মুক্তির জন্য পল মনে মনে অনেক কিছু পন্থা চিন্তা করতে লাগলো ; কিন্তু কিছুই প্রায় সে জানেনা। পলের সমস্ত চিন্তা সমস্ত ভাবনা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশে নাতালিয়ার বিভিন্ন মূর্তিকে কেন্দ্র করে ঘুরে মরছে,—সেই গুদাম ঘরে, হাসপাতালে, অবিন্যস্ত এলোমেলো ওর ছোট্ট ঘরখানির ভিতরে......কল্পনায় নাতালিয়াকে সে একস্থান থেকে আর একস্থানে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ; মাতাল অবস্থায় ঘরের ভিতর থেকে বার করে ওকে নিয়ে গেলো হাসপাতালে; তারপর ওর মনের আকাশে এমন একটা ছবি ফুটে উঠলো যে গভীর হতাশায় পলের হৃদয় দমে গেলো। কিন্তু যখন ঘরের ভিতরে এনে ওর হাসপাতালে দেখা মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠিত করলো, মুহূর্তে পলের মনের অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেলো, নীরব হাসিভরা মুখে পল তার নিজের চারিদিকে তাকালো, তাকালো জমাট বাঁধা অন্ধকার রাস্তাটার দিকে তারপর তাকালো সোনালী তারায় ভরা নীল আকাশের পানে।

দুটো পরস্পর বিরোধী ভাবধারা এসে মিলেছে ওর অন্তরে—জাগিয়ে তুলেছে এক অদ্ভুত সংঘাত : একটা ওর দেহ মন ঘিরে জাগিয়ে তুলেছে আনন্দের উষ্ণ প্রশ্রবণ, অপরটা বয়ে এনেছে কন্‌কনে শীতের তীব্র শিহরণ। হাসপাতালে রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে পল এত গভীরভাবে নাতালিয়ার কথা চিন্তা করতো যে মনে মনে তার সঙ্গে গড়ে উঠেছে ওর একটা নিবিড় আত্মীয়তা, জেগে উঠেছে এক অপূর্ব নৈকট্যবোধ। পলের জীবনে সে-ই প্রথম এবং একমাত্র নারী যে ওকে করেছে সেবা, যত্ন, পরিচর্যা, বুলিয়ে দিয়েছে ওর সর্বাঙ্গ ছেয়ে দরদভরা কোমল পরশ। পলের সঙ্গীহীন সাথীহীন, শূন্য হৃদয় মুহূর্তে সবটুকু উত্তাপ সবটুকু তীব্রতা সবটুকু একাগ্রতা নিয়ে এই মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরলো; কিন্তু যে ওর প্রতি দেখিয়েছে এতোখানি দয়া, মায়া, স্নেহ, তাকেই নাকি আজ

করতে হবে ঘৃণা। পলের মনে পড়ে গেলো সেদিনের কথা যেদিন হাসপাতালে নাতালিয়া এসে বসেছিলো ওর রোগ শয্যার পাশে। যদিও একটু ম্লান, একটু ঝাপসা হয়ে এসেছে সেদিনের স্মৃতির সেই অমলিন ঔজ্জ্বল্য কিন্তু এইমাত্র সে কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি নির্মল সুভ্রতা নিয়ে আবার ওর মানস-পটে ভাস্বর হয়ে উঠলো।

হঠাৎ পলের কানে গেলো একটা হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠের সুর :

তুমি! কখন ছাড়া পেলে হাসপাতাল থেকে?

চকিতে পল পিছন ফিরে তাকালো দেখলো নাতালিয়া এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। ওর মাথা মুখ আবৃত করে একখানা ধূসর রংয়ের চাদর জড়ানো, কিন্তু তবুও পল দেখতে পেল ওর নিবিড় নীল দুটি চোখের আয়ত উজ্জ্বল দৃষ্টি।

কাল ছাড়া পেয়েছি, তারপর? —পল আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে নির্ণিমেষ নয়নে ওর মুখের পানে নীরবে তাকিয়ে রইলো।

ইস্ কতো রোগা হয়ে গেছো! —মৃদু করুণ কণ্ঠে নাতালিয়া বললো তারপর চাদরটা দিয়ে মুখখানা আরও ভালো করে জড়িয়ে নিলো।

শুনলাম তুমিও অসুস্থ।

আমি? ন্-ন্-ন্-আ, হাঁ, তবে এখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারিনি। এমন দাঁতের ব্যথা হয়েছিলো যে...অনেকদিন ভুগলাম।

পলের মনে পড়ে গেলো গত রাত্রের কথা, তখন ওর গালে কোন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিলোনা।

বেশ ভালো হয়ে গেছোতো? শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেতো? কাজকর্ম আরম্ভ করেছ? —কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নাতালিয়া পুনরায় প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ কাজ করছি। কাল থেকেই শুরু করে দিয়েছি।

আচ্ছা আমি আসি তবে এখন। —বলেই নাতালিয়া তার হাতখানি পলের দিকে প্রসারিত করে দিলো।

পল ওর হাতখানা নিজের মুঠোর ভিতরে নিয়ে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলো। আদৌ ইচ্ছা নেই ওর যে এতো শীঘ্র নাতালিয়া চলে যায়।

তোমাকে আমি জানাতে চাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, অসংখ্য ধন্যবাদ

—তুমি এতো করেছ, এতো ভেবেছ আমার জন্য...

আঃ! আবার শুরু হলো বুঝি! যতো সব বাজে কথা...আচ্ছা সময় করে একবার এসো আমার ওখানে চা খেতে—দিনের বেলা, এই ধরো দুপুরে খাবার সময়ে। সন্ধ্যাবেলা সাধারণতঃ আমি ঘরে থাকি না। এসো, কেমন?

আসবো, নিশ্চই আসবো। ধন্যবাদ!

বেশ, আমাকে এখন একটু দোকানে যেতে হবে,—বলেই নাতালিয়া চলে গেলো।

পল ওর ফিরে আসার অপেক্ষায় তেমনি বসে রইলো। কেমন যেন ওর মনে একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ আশা জেগে উঠলো যে নাতালিয়া আবার ফিরে আসবে, এসে বলবে ওকে তার সঙ্গে উপরে যেতে। কিন্তু পলের দিকে না তাকিয়েই দ্রুত পায়ে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। পলের মনে হলো চাদরের ভিতরে লুকিয়ে সে নিয়ে গেলো একটা মদের বোতল।

ভারাক্রান্ত মনে পল বহুক্ষণ সেইখানেই বসে রইলো, তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে শুতে চলে গেলো। ক্লিষ্ট হৃদয়ে পল ভাবতে লাগলো নাতালিয়ার কথা ; অনেক রাত অবধি সে ঘুমোতে পারলো না।

দুদিন পরে কাগজের মোড়কে জড়ানো একটা রুমাল হাতে করে পল নাতালিয়ার ঘরে এসে ঢুকলো। রুমালটা কিনতে পলের খরচ হয়ে গেছে দেড়টাকা। দরজা খোলাই ছিলো; পলকে দেখা মাত্রই নাতালিয়া ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি চাদরটা টনে মাথায় মুখে জড়িয়ে নিলো:

আঃ ! তুমি! বেশ হয়েছে। এক্ষুণি আমি চা খেতে বসছিলাম, এসো, এসো!

নীরবে পল তার আনিত উপহারটা নাতালিয়ার হাতের ভিতরে গুঁজে দিলো তারপর শান্ত কোমল স্বরে বলে উঠলো : তোমার জন্য এনেছি... সামান্য একটু উপহার...

কি এটা? ওঃ রুমাল! কি চমৎকার রুমালটা! আঃ! তুমি—তুমি সত্যিই কতো ভালো!—গদগদ কণ্ঠে নাতালিয়া বলে উঠলো তারপর আলিঙ্গন ভরা দুটি ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করে পলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মাঝ পথে থেমে গিয়ে রুমালটার তারিফ করতে লাগলো।

উপহারটা ওর পছন্দ হয়েছে দেখে পল দারুণ খুসী হয়ে উঠলো। নীরব স্মিত মুখে দেখতে লাগলো কেমন করে নাতালিয়া বার বার রুমালটাকে চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। হঠাৎ একটু চটুল ভংগী করে নাতালিয়া দেওয়ালের গায়ে ছোট্ট আয়নাখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তারপর দুটি হাতে এক অপূর্ব ভংগী তুলে জড়ানো চাদরটা খুলে ফেলে দিয়ে রুমালটা মাথায় বেঁধে নিলো।

একি? —পল প্রায় চীৎকার করে উঠলো।

নাতালিয়ার দুটি চোখের নীচে রক্তাক্ত কাল শিরার চিহ্ন, নীচের ঠোঁটটা ফুলা, প্রবল মুষ্টাঘাতে থেতলে গেছে।

পলের চীৎকার করে ওঠার সংগে সংগেই নাতালিয়ার সব কথা মনে পড়ে গেলো; কিন্তু আর লুকোবার চেষ্টা বৃথা, অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। চেয়ারের উপরে ধপ্ করে বসে পড়ে নাতালিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকলো!

হারামজাদার দল! ইস্ কেমন করে মেরেছে দেখ! —বুকভাংগা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতন কথাটা পলের মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো। ঘরের ভিতরে নেমে এলো এক গভীর থমথমে নিস্তব্ধতা। পল কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে, খুঁজে পাচ্ছে না কোনও কথা, ভাবতে পারছে না কিছুই—কেবলমাত্র ফ্যাল ফ্যাল করে শূণ্য দৃষ্টিতে ঘরের চতুর্দিকে তাকাতে লাগলো। অপ্রত্যাশিত এক রূঢ় আঘাতের বেদনায় পলের বসন্তের দাগে ভরা ক্লিষ্ট মুখখানা ভয়ংকর আকার ধারণ করলো—তবুও সেই ভীষণতার উপরে কেমন যেন একটা করুণ রুগ্নছায়া সমস্ত মুখাবয়বকে একটা হলদে মুখোসের মতন করে তুলেছে।

টেবিলের উপরে কেট্‌লীতে জল ফুটছে; ঘনবাষ্পের কুণ্ডলী স্রোতের মতন বেরিয়ে এসে বাতাসের সংগে মিশে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে; ফুটন্ত জলের কেট্‌লীর ভিতর থেকে একটা অনুচ্চ হিস্‌হিস্ শব্দ উঠছে জেগে মনে হচ্ছে যেন একটা ছোট্ট হিংস্র জন্তু বিজয় উল্লাসে ফোঁসফোঁস করছে।

ঘরের ভিতরটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। নেই কালকের সেই এলোমেলো ভাব। কিন্তু তবুও ভিতরের অবস্থাটা এতো জীর্ণ এতো দীন যে কিছুতেই তাকে সুন্দর করে তোলা যায় না। অবশ্য ঘরটাকে সুন্দর করে তোলার দিক থেকে গৃহকর্ত্রীর আদৌ প্রচেষ্টার অভাব নেই। সস্তাদামের চটকদার

ছবি কিনে এনে নাতালিয়া দেয়ালের গায়ের ফাঁকা অংশটা ঢাকতে চেষ্টা করেছে, পোকা খাওয়া জানালার বাজুর উপরে বসিয়ে দিয়েছে ফুলদানী। কফিনের ঢাকনার মতন ছাদটা মনে হয় যেন যে কোন মুহূর্তেই ভেঙে পড়বে—যদি তাই হয় তবে ঘরটা জুড়ে নেমে আসবে কবরের অতল অন্ধকার।

পল নাতালিয়ার মুখের দিকে তাকালো; ওর বুকটা দুলছে, কাঁধদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে বার বার। পল বুঝতে পারলো, কেন? বোধহয় আমার চলে যাওয়াই ভালো...সে মনে মনে ভাবলো।

আচ্ছা, আসি তবে, নমস্কার!—কিন্তু কেবলমাত্র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পল যেমন ছিলো তেমনিই বসে রইলো। কারণ কোনমতেই সে ওর এই ভাবান্তরের কোন অর্থই খুঁজে পেলো না।

হঠাৎ নাতালিয়া...দু'হাতে পলের গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো:

না, না লক্ষ্মীটি যেও না। এখন আর কোন মানেই হয় না, তুমিতো দেখেই ফেলেছ।— তারপর পলের মুখের সামনে হাত নেড়ে বলতে লাগলো: উঃ! কতো চেষ্টাইনা করলাম যাতে তুমি দেখতে না পাও! আঃ! তুমি কতো ভালো, কতো মহৎ, কতো দয়ালু...তুমি চাওনি...তুমি চাওনি...জানতে... দেখতে...। অন্য সবার মতন তুমি নীচ নও, অভদ্র নও। কাল যখন তোমাকে দেখলাম, কতো আনন্দই না আমার হলো! ভাবলাম যাক্ তুমি সেরে উঠেছ বাঁচলাম! দারুণ ইচ্ছা হলো তক্ষুণি তোমাকে ঘরে ডেকে আনি; কিন্তু ভাবলাম, কেমন করে আমি তোমার সামনে এই কুৎসিত, বিকৃত মুখখানা বের করবো। দেখার সংগে সংগেই যে তুমি দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে! তাই আমি কাল তোমাকে ডাকিনি। অন্যে হয়তো এ মুখখানা দেখে উপহাস করে চলে যেতো, কিন্তু সে তো তুমি পারবে না...তুমি এতো ভালো! কেন তুমি এতো ভালো?

যুগপৎ লজ্জা আনন্দ ব্যথায় পলের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো কান্নায় কান্নায়। মাটির দিকে তাকিয়ে নত নেত্রে পল অস্পষ্ট স্বরে বলতে আরম্ভ করলো:

না, তুমি জানোনা, আমি খুব...মানে সত্যই আমি খুব ভালো নই। আমি বোবা।—কখনও অমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। ধরো যেমন এই এখনই—

তোমার জন্য আমার এতো কষ্ট হচ্ছে মনে, এতো আপনার মনে হচ্ছে তোমাকে, কিন্তু কি করে সেটা প্রকাশ করে বলবো? কিছুইতো জানি না আমি! এমন কি একটি ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিনা...জীবনে শুনিওনি কোন দিনও... একটি কথাওনা...কখনওনা...যে কথা আমি বলতে চাই...যেটা দরকার এখন... এই মুহূর্তে...

দুষ্টু কোথাকার! নিজে কতো সুন্দর সুন্দর কথা কেমন চমৎকার করে বলছে আর ভাবে, কথা জানে না! বেশ বেশ! চলো বসিগে, এখানে এসো আমার পাশে। এখন চা খাওয়া যাক। দাঁড়াও দরজাটা আগে বন্ধ করে দি—এক্ষুণি হয়তো কোন গর্দভ এসে ঢুকবে। সবগুলো শয়তানের চেলা! নরকে পচে মরুক সবগুলো!...পরে যখনই দেখা হয় গা ঘিন্ ঘিন্ করে...ওগুলো এতো নোংরা, পাজী!

বলতে বলতে নাতালিয়া দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। 'তোমার ভাই' 'আমার বোন' কাউকেই সে বাদ দিলো না। যেন সে একজন মস্তবড়ো প্রতিভাশালী সমালোচক, অগ্নিময়ী তার ভাষা, জাঁকালো বলার ভংগী—কিছুটা তীক্ষ্ণও বটে, তবে সে কেবল শ্রোতাদের উপরে তার বক্তব্যের ফলাফলকেই তীব্র করে তোলার জন্যে। ঢেলার মতন সে তার অভিজ্ঞতাগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে স্তূপীকৃত করে তুল্লো, তারপর এমনভাবে তার বক্তব্য শেষ পর্যায় নিয়ে এলো যেটা সম্পূর্ণ লোকমত বিরুদ্ধ হলে পরেও গভীর প্রভাবশীল।

পলের সামনে জীবনের এমন একটা দিক সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে গেলো অতীতে যার বিন্দুমাত্র ধারণাও তার ছিলো না কোন দিনও। এমন অভিশপ্ত এমন নোংরা, কলুষিত ভয়ংকর সে জীবন যে, মুহূর্তে পলের কপালে এক রকমের ঠান্ডা ঘাম দেখা দিলো। জীবনের সেই দিকটার ভীষণতায় বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই দারুণ শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

ক্রমে বক্তা আরও ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লো; চোখের নীচে কালশিরা পড়ে চোখ দু'টো মনে হচ্ছে যেন গর্তের ভিতরে ঢুকে গেছে; একটা প্রতিহিংসাভরা বন্য আনন্দ যেন সেই দু'টো চোখের ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে; সমস্ত মুখখানা জুড়েই মনে হচ্ছে যেন দু'টো

চোখ। কেবলমাত্র নীচেকার ফুলে ওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট ধবধবে ধারালো দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে সে ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করছে। একটা অদ্ভুত ভয়ংকর অথচ বিষাদমাখা সুরে নাতালিয়া নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে চলেছে; কখনও উত্তেজিত কণ্ঠে বলছে 'তোমার ভাই'দের দুরাদৃষ্টের কথা—কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ছে প্রতিহিংসাভরা তীব্র ঘৃণার সুর; পরক্ষণেই আবার রাগে, দুঃখে ,হতাশায় বলছে তাদের সাফল্যের কথা। বলতে বলতে কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে, কখনও বা হাসিকান্না একসঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে নিজের বক্তৃতার ফলাফল দেখে বিস্মিত হয়ে ক্লান্ত নাতালিয়া থেমে গেলো।

এমন একটা নিদারুণ পাশবিক ক্রোধে পলের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠলো যে তাকে আর যেন মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, দাঁতে দাঁত কড়মড় করে উঠছে—দুপাটি দাঁত এমন দৃঢ়ভাবে পরস্পরকে চেপে ধরেছে যে গালের হাড় দুটা ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত মুখাবয়ব ঘিরে ফুটে উঠেছে এক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের লোলুপ হিংস্রতা। নীরবে পল নাতালিয়ার দিকে একটু হেলে বসলো, কিন্তু একটি কথাও বল্লো না। অভিযোগ শেষ করে নাতালিয়া যখন এমন একটা কিছু বলার উপক্রম করলো যাতে পলের ঐ আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে তুলে তাকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। হঠাৎ পল নিজে নিজেই যেন সে ভাব কাটিয়ে উঠে বলতে শুরু করলো :

আচ্ছা—প্রায় চীৎকার করেই পল বলে উঠলো বেশ! এসব কথা আমি জানতুম না তো এতোদিন!—এমনভাবে সে কথাটা বললো যে, এখন যখন জানতে পেরেছে, তখন যাতে করে না এ অবস্থার পুনরাবৃত্তি আর কোন দিন ঘটে সে বন্দোবস্ত পল করবে।

এই হচ্ছে তাহলে ব্যাপার! হা ঈশ্বর, তাও কি সম্ভব!—পল দু'হাতের ভিতরে মাথা রাখলো তারপর টেবিলের উপরে দুটো কনুইয়ের ভর রেখে পুনরায় গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো।

নাতালিয়া তখন নরম গলায় আপোষের সুরে বলতে আরম্ভ করলো। এতক্ষণে যেন সে নিজের এবং অন্যের এই দুষ্কৃতির একটা অনুকূল যুক্তি

খ্ঁজে পেয়েছে। যা কিছ্ দোষ প্রথমটায় সে চাপাতে চেষ্টা করলো 'মদে'র ঘাড়ে; কিন্তু পরক্ষণেই ব্ঝতে পারলো যে জীবনের এই অতি কুৎসিত অংশের ভিত্ হিসাবে 'মদ' বড্ডো বেশী তরল, তাই পরক্ষণেই সে মান্ষের প্রতি দোষারোপ করতে শ্র্ করলো। সবাইকে তার ন্যায্য পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেয়ার পর প্নরায় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

দেখো, সংসারে বেঁচে থাকাটা দার্ণ শক্ত ব্যাপার। সর্বত্র পঙ্কিল খাদ; একটা এড়িয়ে যাও তো আর একটার ভিতরে গিয়ে পড়বে। স্তরাং যে কোন গলি, যতোই বাঁকাচোরা হোকনা কেন চোখ ব্জে চলে যাও। জীবনে কোথায় পাবে সহজ সরল প্রশস্ত রাজপথ—নিরঙ্কুশ, নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন? কটা লোক পায় তা? আমাদের জীবন কঠিন, নোংরা; কিন্তু বিবাহিত জীবনও তো কৈ তেমন মধ্র নয়। ছেলেপ্লে হওয়াই তো একটা দার্ণ বিশ্রি ব্যাপার; কিন্তু তাছাড়াও আছে স্বামী, হাঁড়িকুড়ি আরও কতো কি যে ঝামেলা, শয়তানই জানে! জীবনটা ভীষণ কোলাহলময়!

শ্নতে শ্নতে পল কল্পনার চক্ষে দেখতে পেলো—সারি সারি অসংখ্য অতলস্পর্শী পঙ্কিল খাদ আর তারই ভিতর দিয়ে অতি অপরিসর সর্ একফালি পথ; কাতারে কাতারে মান্ষ চোখ ব্জে চলেছে সেই পথের ব্ক বেয়ে; ঘন অন্ধকারে ভরা খাদগ্লি যেন পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে আছে আর থেকে থেকে খল্‌খল্ অট্টহাস্যে উঠছে হেসে; হাসির সঙ্গে সঙ্গে এক নিদার্ণ প্তিগন্ধ জেগে উঠে আকাশ-বাতাস পরিপ্র্ণ করে তুলেছে—সেই দ্র্গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃসঙ্গে, একাকী, দ্র্বল লোকদের মাথা ঘ্রে উঠছে; ঘ্রতে ঘ্রতে তারা ঐ খাদের ভিতরে পড়ে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে...

নাতালিয়ার বক্তৃতায় পলের মনের এক অপরিজ্ঞাত কোণের অবর্দ্ধ দার্শনিকতার চাবী খ্লে গেলো। এখন আবার আরও সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে শ্র্ করেছে নাতালিয়া। বলছে সে কবরের কথা—কেমন করে কবরের ব্কে জন্মায় সোমরাজ গাছ, জেগে ওঠে স্যাঁতসেতে ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধ...

পলের মনে হলো ব্ঝিবা এক্ষ্ণি সে কেঁদে ফেলবে। আর না, এখন চলে যাওয়া দরকার।

চললুম এখন, নমস্কার!—অতি সংক্ষেপে পল বললো। নাতালিয়া ওকে বাধা দেবার কোন প্রচেষ্টাই করলো না। বিদায় বেলা কেবলমাত্র কোমল সুরে বল্‌লো একটি কথা: আবার এসো, শিগ্‌গির।—মাথা নেড়ে পল সম্মতি জানালো।

রাস্তায় নেমে এসে বহুক্ষণ পর্যন্ত পল আপন মনে একাকী শহরের ভিতরে ঘুরে বেড়ালো। নিজেকে আজ ওর খুব বড়ো, খুব ভারিক্কি মনে হচ্ছে, কারণ, এতো সব নূতন চিন্তা, নূতন ধারণা, নূতন অনুভূতির অধিকারী হয়ে উঠেছে সে যে, কিছুক্ষণ আগে এসব কিছুই ছিলো ওর অজানা, অজ্ঞেয় কল্পনার বহির্ভূত। ওর চতুর্দিকের সবকিছু—এই শহর, শহরের যাবতীয় বস্তু, সবই যেন মনে হচ্ছে নূতন—সবকিছুই যেন ওর অন্তরে জাগিয়ে তুলছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা, জাগিয়ে তুলছে এক অনন্ত দুঃখভরা করুণা। বোধহয় পলের এই ভাবান্তরের কারণ শহরের বিভিন্ন পাড়ার রহস্য আজ এই প্রথম ওর চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে।

সমস্ত রাতভোর পল পথে পথে ঘুরে বেড়ালো, তারপর ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে ফিরে এলো।

সাত

এক সপ্তাহ কেটে গেলো। পল সাতদিনই এসেছে নাতালিয়ার কাছে।

সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে ওরা আলোচনা করে আনন্দ পায়—আর আনন্দ পায় বলতে নিজেদের জীবনের কথা। হাসপাতালে রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে পল কল্পনায় যেসব রঙীন ছবি আঁকতো এখনও সে সব বাস্তবে পরিণত করে উঠতে পারেনি। নাতালিয়ার কাছে গল্প করেছে সে স্বল্প-ভাষী আরিফির কথা, তার নিজের শৈশবের বিচিত্র সেইসব কল্পনার কথা, যখন সাধারণ স্নান-ঘরের পিছনের সেই গর্তটার ভিতরে শুয়ে শুয়ে কতো কি কল্পনার জাল বুনে চলতো; বলেছে, কেমন করে সে সমাধি স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো—বেড়াতো পথে পথে, শহরে, গ্রামে। সেদিনের সেইসব চিন্তার সঙ্গে কেমন যেন একটা আত্ম-অবিশ্বাস, একটা হতচকিত বিমূঢ়তার স্মৃতি ওর

মনের ভিতরে দাগ কেটে বসে আছে; ওর চিন্তার ধারাবাহিকতার ভিতরে জীবন সম্পর্কে কোথায় যেন একটা মস্তবড়ো ভুল, মস্তোবড়ো গলদ রয়ে গেছে যার আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

নাতালিয়াও তার জীবনবৃত্তান্ত পলকে শোনালো—খুবই সহজ, সরল সাধারণ সে কাহিনী। ওর তখন ষোল বছর বয়েস, এক সওদাগরের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতো; তারপর অতি অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন কেমন করে যেন তার কুমারী জীবনের ঘটলো অবসান। জানতে পেরে ওর বাপ-মা ওকে তাড়িয়ে দিলো ঘর থেকে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোক ছিলো ওর বাপ মা। অগণিত গৃহহীন লোকের মতন ওরও তখন আশ্রয় হলো পথ। জুটলো এসে এক পরোপকারিণী; তারপর এলো একজন পরোপকারী। এমনি করে ক্রমে অজস্র উপকারী বন্ধুর দল চতুর্দিক থেকে ভিড় করে আসতে লাগলো—কে জানে কোন নরক থেকে যে হয় তাদের আবির্ভাব! তারপর আজ দীর্ঘ আট বছর ধরে তারা অঝোর ধারায় কৃপাবারি বর্ষণ করে আসছে— এমন কি আজও তার কোন বিরাম নেই। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে নাতালিয়া অকপটে সবকিছুই পলের কাছে স্বীকার করে গেলো। ইতিমধ্যে পল ঐ পরোপকারীদের কথা ভালভাবেই জানতে পেরেছে; তাই ওর কাহিনী শুনে পলের মন দুঃখে, ব্যথায় পূর্ণ হয়ে উঠলো কিন্তু আর কোন গভীর প্রতিক্রিয়া হলো না।

ওদের দুজনার ভিতরে গড়ে উঠেছে এক সহজ, সরল হৃদ্যতার বন্ধন; যেন কোন একটি বান্ধবীর কাছে বলছে নাতালিয়া—এমনি সহজ, সরল অসঙ্কোচে সে বলে যায় সবকিছু কথা পলের কাছে। পলও তেমনি দ্বিধা-হীন নিঃসঙ্কোচে বলে সব কথা যেমন করে লোকে বলে তার কোনও পুরুষ বন্ধুর কাছে।

নাতালিয়ার চোখের কোলের কালশিরার দাগ ক্রমে মিলিয়ে এসেছে; মুখখানি ঘিরে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে স্বাভাবিক সুন্দর গোলাপী আভা। ঐ ধরণের বিশেষ পেশার দরুণ মেয়েদের মুখের উপরে যেমন একটা পাতলা শিশার মতন কালছে ছোপ ধরে, নাতালিয়ার মুখে এখনও তার কোন চিহ্ন ফুটে ওঠেনি। নাতালিয়া গান গাইতে ভালোবাসে; প্রায়ই সে গায় ব্যর্থ

প্রেমের করুণ গান। কিন্তু 'প্রেম' কথাটা ওর অন্তরে কোন বিশেষ সুখস্মৃতি কিম্বা আবেশ ঘনিয়ে তোলে না; এমন কি বোধহয় সত্তর বছর বয়েসের বৃদ্ধারাও ওর মতন অমন নির্জীব, নিস্পৃহ, উপেক্ষাভরা সুরে ঐ কথাটি উচ্চারণ করতে পারে না। কারণ এক অতি বৃদ্ধা নারীর কাছেও ঐ কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় ফেলে আসা জীবনের হাসি, কান্না, দীর্ঘশ্বাসের স্মৃতিভরা ইতিবৃত্ত।

নাতালিয়া পলকে পছন্দ করে এইটুকুই মাত্র, আর সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ জীবনে সে এই প্রথম এমন একটি পুরুষের দেখা পেয়েছে যে অন্য দশজনার মতন সেই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি ওর কাছে—আসতে পারেনি। নাতালিয়া বোঝে পল তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে—যেমন করে একজন ভদ্রপুরুষ নারীর প্রতি জানায় সম্মান, করে থাকে সম্ভ্রমভরা, শ্রদ্ধাভরা সুন্দর ব্যবহার। আর তাতে নাতালিয়ার মন পূর্ণ হয়ে ওঠে, সে পায় আনন্দ, তৃপ্তি, সুখ। তাই পলের কাছে প্রয়োজন হয় না ওর দেহভরে ফেনিয়ে তোলা লালসভরা ইঙ্গিতের অশ্লীল ছলাকলার নিলর্জ প্রগল্‌ভতা। কিম্বা নাতালিয়ার মনে মানুষের প্রতি যে একটা উপেক্ষাভরা বিদ্বেষ জমে উঠেছে—যদিও এখনও সেটা তার চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গড়ে ওঠেনি—পলের কাছে তার অভিব্যক্তি অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া যে কোনও কথাই সে অসঙ্কোচে পলের কাছে বলে যেতে পারে, আর চির অনভ্যস্ত পল এখন যদিও তেমন বেশী কথা বলতে শেখেনি, কিন্তু গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনে ওর প্রত্যেকটি কথা:

একটু একটু করে পলের মুখ খুলতে আরম্ভ করেছে। আগের তুলনায় এখন সে ঢের বেশী কথা বলে। অবশ্য এটাও একটা কারণ যে নাতালিয়া সত্যি সত্যিই ওকে বুঝতে চেষ্টা করে—বুঝতে চেষ্টা করে ওর অন্তরের ভাবপ্রবাহ, ওর চিন্তার ধারা, সবকিছুই। পল ওর প্রিয়; পলের সাহচর্য নাতালিয়ার জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়। পল অবাক হয়ে যায়; নাতালিয়া যেন পলের সঙ্গে অস্বাভাবিক রকমের ভালো ব্যবহার করে—অদ্ভুত কোমলতা, অদ্ভুত মায়া ওর পলের উপরে; কিন্তু তবুও সে তাদেরই একজন, যাদের সম্পর্কে জীবনে পল একটিও ভালো কথা শোনেনি কোন দিনও।

প্রায়ই পলের মনে পড়তো আরিফির কথা। 'কে বেশী ভালো?'—কথাটা ভেবে ভেবে পল অবাক হয়ে যেতো—'আরিফি না নাতালিয়া'? ইচ্ছা করেই পল এ প্রশ্নের কোন মিমাংসায় উপনীত হতে চাইতো না; ভয় হতো পাছে সেটা তার মৃত অভিভাবকের প্রতি অসম্মানজনক হয়ে পরে—আরিফির অনুকূলে না যায়। পলের সন্ধ্যাগুলো এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো। কাজের শেষে সে আসে নাতালিয়ার ঘরে সহজ সচ্ছন্দ পদ-ক্ষেপে; তারপর দুজনে বসে চা খায় আর নিশ্চিন্ত খোলা মনে গল্প করে।

করুণ রসাত্মক ছোট গল্প পড়তে নাতালিয়া খুব ভালোবাসে। সস্তা দামের কাগজে ছাপা, পাঁচ আনায় দু'খানা করে যে সব বই পাওয়া যায়, সেই সব বইয়ের ভাবপ্রবণ গল্পের প্রতি ওর প্রবল ঝোঁক। ওর খাটের তলায় একটা বাক্সের ভিতরে ঠাস ভর্তি এক বাক্স বই আছে ঐ ধরণের। মাঝে মাঝে নাতালিয়া পলকে পড়ে শুনাতো; পড়তে পড়তে দারুণ উৎসাহিত হয়ে পলকেও সে পড়ার জন্য অনুরোধ করতো আর প্রত্যেক বারই পল প্রতিশ্রুতি দিতো পড়বে বলে।

পলের সমস্ত দিনের কর্মক্লান্তি অপনোদিত হয়ে যেতো—একটা হালকা আরামের আবেশে ওর দেহমন পূর্ণ হয়ে উঠতো। এমন কি ক্রমে পল হাসতেও শিখলো। মিরণ পলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও সে ওর মুখের দিক তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে ওঠে। অবশ্য পল তাতে আদৌ আহত কিম্বা বিচলিত হয় না। ক্রমে পল তার মনিবের প্রতিও অনুরক্ত হয়ে উঠলো; পলের ব্যাপারে মিরণের বেশ একটু কৌতূহল জেগে উঠেছে; বিনিময়ে পল ষাঁড়ের মতন পরিশ্রম করে তার প্রতিদান দিতে লাগলো।

আচ্ছা পল, আমাকে কেন একদিন ওর ওখানে নিয়ে চলো না? অবাক বিস্ময়ে পল কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর সানন্দে তার প্রস্তাবে সম্মতি দিলো। এক সন্ধ্যায় ওরা দু'জনে মিলে নাতালিয়ার ঘরে বসে চা খেলো। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বৃদ্ধ এই তরুণ তরুণীর হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগলো আর মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তার ভিতরে কৌতুকচ্ছলে দু'একটি ফোড়ন কাটতে লাগলো।

সেদিনের সন্ধ্যাটা ওরা তিনজনে মিলে খুব আনন্দেই কাটিয়ে দিলো।

পলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে প্রথমে মিরণ অস্পষ্টভাবে কি যেন বললো তারপর ওর কাঁধের উপর হাত রেখে বলতে শুরু করলো:

তুমি একটি অদ্ভুত লোক ভায়া, আর সেও—মানে ঐ মেয়েটা। অবশ্য, কোন দিন যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরের পুচ্ছমর্দন করতে শুরু না করো তবে চলবে বেশ ভালোই।

পল ওর কথার কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না; কেবল এই টুকুই মাত্র বুঝলো যে মিরণ ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই কথাটা বলেছে; তাই প্রত্যুত্তরে সে ওকে জানালো ধন্যবাদ। যখন পল হকচকিয়ে যেতো, কোনও একটা কথা সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারতোনা তখনই সে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করতো।

একদিন পল আর নাতালিয়া বসে চা খাচ্ছিলো—এক সঙ্গে বসে চা খাওয়াটা ওদের একটা পরম আনন্দের ব্যাপার; কে কি ভালোবাসে হঠাৎ তারই আলোচনা শুরু হলো। পল তার পছন্দ অপছন্দের ফিরিস্তি দিলো তারপর চুপ করে বসে শুনতে লাগলো নাতালিয়ার কথা:

নাতালিয়া অনেক কিছুরই নাম করলো—নাগর দোলা, ব্রাণ্ডির সঙ্গে লিমোনেড, সারকাস্, গান, বাজনা, বই, শরৎকাল,—কারণ এই সময়টা বড়ো করুণ বিষণ্ন মনে হয় ওর কাছে। তারপর ছোট ছেলে, অবশ্য শয়তানী বুদ্ধি গজাবার আগে, মাংসের কিমা, এমনি আরও কতো কি...পরিশেষে নৌকা ভ্রমণের কথা বলে সে শেষ করলো।

এটাই আমি ভালোবাসি সবচাইতে বেশী। —দারুণ উৎসাহে নাতালিয়ার চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠলো। —নৌকায় চড়ো আর দেখবে তোমাকে কেমন দোলনার উপরে শোয়ানো ছোট কচি শিশুটির মতন দোল দিতে থাকবে; সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ঠিক ছোট্ট শিশুটির মতনই হয়ে পড়বে—বুঝতে পারবেনা কিছুই, পারবেনা কিছুই ভাবতে, কেবল ভেসে চলা আর ভেসে চলা...অনন্ত কাল ধরে এমনি করে আমি ভেসে যেতে পারি। ভাসতে ভাসতে একদিন পৌঁছাবো গিয়ে সাগরে—জীবন ভোর চলবে এমনি বিরামহীন ভেসে চলা। আঃ! কি চমৎকারই না হতো তাহলে। একটিবার যদি নৌকায় বেড়াতে পারতুম!

তারপর ওরা দু'জনে মিলে ঠিক করলো আসচে রবিবার যাবে নৌকায়

বেড়াতে।

সেদিন আবহাওয়াও ছিলো ভালো; মেঘ মুক্ত সচ্ছ আকাশে প্রথম গ্রীষ্মের উষ্ণ আমেজ। ওরা মজবুত দেখে ছোট্ট একটি হালকা নৌকা ভাড়া করলো। পল বসলো গিয়ে দাঁড়ে, তারপর শুরু হলো উজান বেয়ে এগিয়ে চলা। এক পারে পাথরের গায়ে চওড়া ফিতার মতন নরম কাদা মাটির হালকা প্রলেপ; অপর পারে সবুজ লতাগুল্মের ঝোপ। কোথাও বা দু একটি আকাশ ছোঁয়া বার্চ গাছ, কোথাওবা ঝাউ গাছ—রুপালী পাতার সজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বা অতিকায় ওক্; হাওয়ায় ডালপালাগুলি প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে; কতোগুলি শাখা পড়েছে ঝুলে মাটির টানে। মাথায় ফেনার সাদা মুকুট পড়ে ছোট ছোট ঢেউগুলি নৌকার পিছু পিছু আসছে ছুটে কিন্তু কিছুতেই নৌকাটার নাগাল না পেয়ে ভগ্ন মনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে করতে পেছিয়ে পড়ছে। উপকূলের ঝোপের ছায়ার মতন স্বচ্ছ নীল আকাশের সুগভীর ছায়া প্রতিবিম্বিত হচ্ছে নদীর বুকে। আপন আনন্দে আপনি বিভোর হয়ে তীরের ঝোপগুলি মৃদু মৃদু দুলছে।

দুঃসাহসী সুইফ্‌ট পাখিগুলো দ্রুত বেগে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে চলেছে; খঞ্জনগুলো কুলে বসে সগর্বে মাথা উঁচিয়ে পুচ্ছ নেড়ে চলেছে—মনে হচ্ছে যেন এক একটি ক্ষুদে কাক। ঢেউ আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পত্রগুচ্ছগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে; দূরে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে সংগীতের সুমধুর সুর—সুরের কোমল রেশটুকু স্রোতের সঙ্গে মিশে দূর দূরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

খালি মাথায় কেবল মাত্র একটা লাল রংয়ের সার্ট গায়ে পল সুদক্ষ মাঝির মতন জোরে জোরে দাঁড় টেনে চলেছে; দাঁড়ের টানে টানে ওর সুদৃঢ় হাতের পেশীগুলো উঠছে ফুলে ফুলে। কখন বা এক গোছা চুল বাতাসে উড়ে এসে ওর কপালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—সঙ্গে সঙ্গেই পল মাথাটা একটু নেড়ে অবাধ্য চুলগুলিকে আবার যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে। পলের দুটি চোখে উপচে পড়া অনাবিল আনন্দের উষ্ণ প্রস্রবণ। গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাতাসের মিষ্টি গন্ধ বুক ভরে টেনে নিতে নিতে বারবার বলে উঠছে; আঃ! কি চমৎকার!

পলের মুখোমুখী বসেছে নাতালিয়া; হাতদুটি আলতো করে রেখেছে হাঁটুর উপর; ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে পরিপূর্ণ তৃপ্তির অলৌকিক হাসির মৃদু আভা। দাঁড় টানার তালে তালে নাতালিয়া দুলছে। দাঁড়ের গা বেয়ে চক্‌চকে সুন্দর জলের ফোটাগুলি নিঃশব্দে ঝরে পড়ে আলিঙ্গনের মতন ছড়িয়ে পড়ছে নদীর বুকে। নাতালিয়া চারিদিকে তাকালো; তাকালো দাড়ের পানে—দৃঢ়, সবল, বিশাল দেহ; ওর কোমল উন্মীল অপরূপ দুটি চোখের ভিতর থেকে এক অপূর্ব মধুর হাসির ছটা ঠিকরে বেরিয়ে এসে দুটি পরিপূর্ণ রক্তিম ঠোঁটের উপরে ছড়িয়ে পড়ে অলৌকিক দীপ্তিতে ঝল্‌-মল করে উঠলো।

কারুর মুখেই কথা নেই—নেই কথা বলার ইচ্ছা। দুজনেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করছে দুজনকে—তাই কথার চাইতে অনেক বেশী মুখর, অনেক বেশী বাঙ্‌ময় এই সুমধুর নীরবতা। ওরা যেন কোন এক জনপ্রিয় নাটকের নায়ক-নায়িকা,—উভয়ের অন্তর-আকাশে নূতন প্রণয়ের প্রথম অরুণোদয়,—কেউই এখনও পুরোপুরী সচেতন হয়ে ওঠেনি, তবুও অনুভব করছে পরস্পর পরস্পরকে একান্তভাবে দেখার, একান্তভাবে জানার এক দুর্বার আকর্ষণ; আর তারই ভিতর দিয়ে ঘটনার গতি দ্রুত পরিণতির পথে চলেছে ধেয়ে।

কিন্তু পল আর নাতালিয়ার সঙ্গে ঐ নায়ক-নায়িকার মিল ততটুকু পর্যন্তই যে, এখন তারা পরস্পর পরস্পরের হয়নি ; কেন যে হয় নি তা কেবল-মাত্র অদৃষ্টই জানে!

এবার পারে ভিরাই? —নদীর এপারে এসে একটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া সুন্দর স্থান দেখতে পেয়ে পল নাতালিয়াকে জিজ্ঞাসা করলো। জায়গাটা যেন বনভোজনের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতিদেবী নিজের হাতে তৈরী করে রেখেছেন। উর্ধ্বে বার্চশাখা ছায়া বিস্তার করে রয়েছে, ঘাসের বুকে ফুটে রয়েছে নানা বর্ণের অজস্র সুন্দর সুন্দর ফুল।

একটা মোড়কে কিছু খাবার, একটা কেটলী, আর এক বোতল পানীয় নিয়ে ওরা তীরে নেমে এলো। আধঘণ্টার ভিতরেই দেখা গেলো ঘাসের বুকে জ্বলে উঠেছে আগুন আর তার উপরে ফুটছে চায়ের জল। কেটলীর গা'বেয়ে দু'এক ফোঁটা জল জ্বলন্ত আগুনের উপর পড়ে ফচ্‌ ফচ্‌ শব্দে বাষ্প হয়ে

উড়ে যাচ্ছে ; ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসের সঙ্গে মিশে মালার মতন হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগলো আর তারই গন্ধে মাতাল হয়ে কতোগুলি কীট পতঙ্গ মন্থরগতিতে নেমে এলো নীচে মাটির বুকে।

চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ—যেন সমস্ত ধরণী কি এক অশ্রুতপূর্ব রাগিনী শোনার জন্য আকুল আগ্রহে উন্মুখ হয়ে কান পেতে রয়েছে। নাতালিয়ার মুখে চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া—গুন গুন সুরে কি একটা গান গাইতে গাইতে সে ঘাসের ফুল আর পাতা তুলে একটা ছোট্ট তোড়া বাঁধলো। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বেশ একটু ভাব প্রবণ সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবে ঘটেও ছিলো তা-ই।

কুমারী মেয়ের মতন নাতালিয়া ফুল তুলে তুলে তার গন্ধ শুঁকছিলো। অবশ্য, আমার নায়িকাকে ভদ্র কুমারী মেয়েদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত করার জন্য আমি তাদের কাছে মার্জনা চাইছি। বিশ্বাস করুণ আমার আদৌ সে রকমের কোনই ইচ্ছা ছিলো না। কুমারী মেয়েরা স্থির হোন! তাদের সঙ্গে আমার নায়িকার তুলনা করতে পারি এমন দুঃসাহস আমার নেই কিম্বা তেমন আদর্শবাদীও আমি নই। তবে আমার বিশ্বাস, যদি ইচ্ছা এবং প্রচুর অবকাশ পায় যাতে করে ভালো হবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারে, তবে যে কোন লোকই ভালো হতে পারে।

এতক্ষণে ফুটলো চায়ের জল! চা তৈরী করে দু'জনে মিলে চা ও খাবার খেয়ে নিলো। খেতে খেতে ওদের ভিতরে একান্ত সন্তর্পণে দু'একটি কথার আদান প্রদান চলতে লাগলো—সবাই কেমন সুন্দর, কেমন চমৎকার, তারই সম্পর্কে। বোতলের পানীয় থেকে তিনটি গ্লাস উদরস্থ করার পর পলের মাথা ঘুরে উঠলো—ভিতরে ভিতরে কথা বলার একটা দারুণ আগ্রহ জেগে উঠলো ওর মনে।

যাঁরা এই দুনিয়ার সমস্ত গোপন রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন—যাঁরা বোঝেন সব, জানেন সব, তাদের জীবন কতোই না সুখের—ভাবুকের মতন বলে উঠলো পল।

নাতালিয়া পলের মুখের পানে তাকালো তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো :

তাতে সুখেরই বা কি এমন আছে?

পল ভাবতে লাগলো কি জবাব দেবে ; ওর সেই ইতস্ততঃতার সুযোগে পলকে কোন উত্তর দেয়ার সুযোগ না দিয়েই পুনরায় নাতালিয়া বলতে শুরু করলো :

আমি অতশত বুঝিনা কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো, সব কিছু বুঝতে চেষ্টা না করাই ভালো। প্রশ্ন যতো কম করবে, জীবন ততোই সহজ হয়ে উঠবে। সামনে যা এলো তাকেই বরণ করে নাও—লোকে কি বল্‌লো না বল্‌লো সে কথায় কান দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।

তারপর ওরা ডুবে গেলো দার্শনিকতায়। কিন্তু কিছুক্ষণ চালাবার পরেই তাতে এলো ক্লান্তি। দার্শনিকতা ছেড়ে ওরা গল্প শুরু করলো। ক্রমেই পলের নেশা চড়তে লাগলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—উষ্ণ, সুন্দর, নির্জন সন্ধ্যা; ক্রমে ঘোর হয়ে আসছে দেখে নাতালিয়ার মনটা দমে গেলো—সে চাইলো বাড়ী ফিরে যেতে। যদিও মুখে পল স্বীকার করছে যে এখন বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত কিন্তু ওর নড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেলো না—পলের মনে হলো শরীরটা পাথরের মতন ভারী হয়ে উঠেছে, আর তাই বুঝি নড়ছে না একটুও। বোকার মতন হাসতে হাসতে সে জমে ওঠা নেশার সংগে লড়াই করবার দুর্বল প্রচেষ্টায় অংগ চালনা করতে লাগলো।

অতিকষ্টে নাতালিয়া ওকে টেনে নিয়ে নৌকায় তুললো ; কিন্তু নৌকায় উঠেই পল সটাং চিৎ হয়ে শুয়ে মুহূর্তে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়লো। নাতালিয়া বসলো গিয়ে দাঁড় নিয়ে। অনুকূল স্রোতে নদীর কূল ঘেঁসে নিঃশব্দে নৌকা এগিয়ে চললো। দূরে কোথা থেকে যেন হাওয়া উড়ে আসছে আগুনের ফুলকি; তীরের সবুজ বনানীর কালো ছায়া প্রতিবিম্বিত জলের বুকে এসে পড়েছে দু'একটি জ্বলন্ত স্ফুলিংগ।

নাতালিয়া মাঝ নদীতে পারি দিলো। অস্পষ্ট চাঁদের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত পলের মুখে ; নীরবে নাতালিয়া ওর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো, কিন্তু ভাবছিলো অন্য কথা; ওর দু'গাল বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়েছে চোখের জল। এপারে সবুজ বনানীর অস্পষ্ট রেখা ওপারে খাড়া পাহাড় ; আকাশে একটি দুটি করে তারা দেখা দিয়েছে ; চারিদিক নিস্তব্ধ —সমস্ত জীব-জগৎ যেন এক গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। এমন কি

নৌকার তলায়ও জলের ছল্‌ছলানির এতটুকু শব্দও উঠছে না। নিঝুম নিস্তব্ধ অন্ধকার জমাটবাঁধা মাখনের তালের মতন কোমল মসৃণ। দূরে শহরের আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে ; থেকে থেকে জেগে উঠছে একটা অস্পষ্ট—মৃদু কোলাহল—যেন এক অতিকায় ঘুমন্ত জানোয়ার গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে নাক ডাকাছে। ক্রমে সেই কোলাহল বিরামহীন অবিচ্ছিন্ন একটানা শব্দে রূপান্তরিত হয়ে উঠলো।

ওরা এপারে এসে পৌছালো। পারের গায়ে নৌকাটার ধাক্কা লাগতেই পলের ঘুম ভেঙে গেলো। দারুণ লজ্জা পেলো. পল অমন করে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে।

আমায় ক্ষমা করো নাতালিয়া... নদীর তীর ছেড়ে অপরিসর নির্জন পথের বুক বেয়ে খানিকটা দূর চলে এসে হঠাৎ পল বলে উঠলো।

নাতালিয়া অবাক হয়ে গেলো:

কেন বলতো?

পল দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলো যে একজন মহিলার সামনে ঘুমিয়ে পড়াটা হচ্ছে একটা নিতান্ত ভদ্রতা বিরুদ্ধ কাজ।

বাপরে বাপ! যতো সব বাজে কথা,—কোথায় পেলে এসব?—বিস্মিত নাতালিয়া প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলো।

না, মোটেই বাজে কথা নয়—গলার সুরে একটু জোর দিয়েই পল বলে উঠলো।—তুমিইতো সেদিন একটা বই থেকে পড়ে শুনিয়েছিলে, মনে নেই? —বলেই পল বইয়ের সেই অংশটা নাতালিয়াকে শুনিয়ে দিলো।

কেমন দেখলে তো?—ওযে ঠিকই বলেছে সেটা প্রমাণ করতে পেরে পল মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করলো, তারপর পুনরায় বলে উঠলো:

বইতে তো আর কোন মিছে কথা লেখা থাকে না!

এই শেষোক্ত মন্তব্যের ভিতর থেকেই যে কেউই বুঝতে পারবে বই সম্পর্কে পলের জ্ঞানের পরিধি কতো সীমাবদ্ধ।

যখন ওরা বাড়ী ফিরে এলো, সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়েই পল নাতালিয়ার দিকে তার ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলো: আচ্ছা, তবে আসি এখন। এক মুহূর্ত নাতালিয়া একটু ইতস্ততঃ করলো, তারপর দুহাত দিয়ে পলের

প্রসারিত হাতখানা জড়িয়ে ধরে অদ্ভুত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলো:

পল! প্রিয় আমার! কি সুন্দর তুমি! কতো মধুর!...বলেই নাতালিয়া দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো; আর এই অযাচিত উচ্ছ্বাসভরা প্রশংসায় হকচকিয়ে গিয়ে বিমূঢ় পল সেইখানেই স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে রইলো।

অল্প কিছুদিনের ভিতরেই ওরা আর একবার নৌকায় করে বেড়িয়ে এলো।

এমনি করে চললো কিছুদিন।

মানুষ যেমন একই কাজের পৌনঃপুনিকতায় বিরক্ত হয়ে ওঠে, প্রকৃতি দেবীও তেমনি এই নিছক অভিনয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠে দু'জনাকে ঘিরে এক বাস্তব প্রণয়ের কাব্যলোক গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করলেন।

এমনি করে শুরু হলো সেই গীতিকাব্য:

একদিন সন্ধ্যায় সুন্দর এক জোড়া গোঁফসহ এক তরুণ মুখ কারখানার খোলা দরজার ভিতর দিয়ে উঁকি দিয়ে বিনীত কোমল কণ্ঠে পলকে জিজ্ঞাসা করলো:

বলতে পারো ভাই, নাতালিয়া নামে একটি সুন্দরী মেয়ে এখানে কোথায় থাকে? নাতালিয়া...

লোকটির পক্ষে হয়তো ওকে জিজ্ঞাসা না করাই ছিলো ভালো। কথাটা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই পলের দুটো চোখ হিংস্র আকার ধারণ করলো।

জানি না।—নিরস কণ্ঠে জবাব দিলো পল; কিন্তু ওর গলার স্বরটা তেমন মধুর শোনালো না।

জানো নিশ্চয়ই, ফর্সা রঙ্, চোখ দুটো নীল আর খুব বেশী লম্বা নয়।

আমি জানি না,—পল তার আগের জবাবের পুনরাবৃত্তি করলো। এবার ওর কণ্ঠে সুস্পষ্ট বিরক্তির রুক্ষ সুর।

তা-তা-তারা যে বললো আমাকে এখানেই—লোকটি একটু ইতস্ততঃ করে বলতে লাগলো,—মাপ করুণ, আসি তাহলে নমস্কার!—লোকটির কণ্ঠে ফুটে উঠলো হতাশার সুর।

পল আর কোন জবাব দিলো না। যদিও লোকটি তখন চলে গেছে তবুও তার মাথা লক্ষ্য করে জুতার সাজটা ছুঁড়ে মারার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা

জেগে উঠলো পলের মনে।

বলতে পারেন নাতালিয়া নামে একটি মেয়ে এখানে কোথায় থাকে?— উঠানের দিক থেকে পুনরায় ভেসে এলো সেই বিনীত কণ্ঠের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

জুতার সাজটা হাতে করে পল লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর সদর দরজার দিকে লক্ষ্য করে ছুটে এলো। প্রায় যখন দরজার কাছে এসে পড়েছে তখন শুনতে পেলো নাতালিয়ার কণ্ঠ:

এই দিকে, এই দিকে ইয়াকভ ভ্যাসিলিচ্!

পল ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলো তারপর আনমনে ভুল করে হাতের অসমাপ্ত জুতাটার বেজায়গায় একটা পেরেক ঠুকে দারুণ বিরক্তিতে জুতটাকে টান মেরে মেঝের উপরে ছুঁড়ে দিয়ে পুনরায় উঠে দাঁড়ালো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পল তাকালো নাতালিয়ার ঘরের জানালার পানে; কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না; শুনতে পেলো কেবল নাতালিয়ার খুসীভরা উচ্ছল কলকণ্ঠের সুর আর তার অনুগ্রহলাভে ধন্য সেই লোকটার চরিতার্থ কণ্ঠের অস্পষ্ট গদগদ ভাষা।

পরক্ষণেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠলো। দুজনই বেরিয়ে এলো। ক্ষিপ্র হাতে পল দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটু সামান্য ফাঁক রেখে তারই ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইলো।

ধূসর রংয়ের পোষাক পরা লম্বা লোকটির সঙ্গে নাতালিয়া নীচে নেমে এলো। খুসী মনে গোঁফে তা দিতে দিতে লোকটা বার বার তাকাচ্ছিলো নাতালিয়ার মুখের পানে। নাতালিয়া আঁড় চোখে একবার দরজার আঁড়ালে দাঁড়ানো পলের দিকে তাকালো তারপর দুজনে মিলে চলে গেলো।

পল পুনরায় ঘরের ভিতরে ফিরে এসে জানালার সামনে বসে পড়লো। রাস্তাটা ভালো করে দেখার জন্য সে মাথাটা একটু পিছন দিক হেলিয়ে দিলো; কিন্তু সামনের বাড়ীটার ছাদ আর আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না।

এই প্রথম পলের মনে হলো কে যেন ওকে মাটির নীচে পুতে ফেলেছে— ওকে ঘিরে গভীর ধোঁয়াচ্ছন্ন স্যাঁতসেতে এক অন্ধকুপ। পলের মাথাটা আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়লো; গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলো পল।

দোকানের মালিক এসে কি যেন ওকে জিজ্ঞাসা করলো কিন্তু কোন জবাব পেলো না। সহানুভূতিভরা কণ্ঠে পুনরায় সে প্রশ্ন করলো:

কি হয়েছে পল? দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি তুমি কি যেন একটা ভীষণ কান্ড করে বসবে!

এ্যাঁ!—পল বললো;—ওর চোখের দৃষ্টি ম্লান, ক্লান্ত।

দেখলাম, নাতালিয়া এইমাত্র একটা লোকের সঙ্গে গাড়ী চড়ে চলে গেলো। —পলের মুনিব বললো।

না, সে নয়।

না? তাহলে নিজে গিয়েই দেখে এসোনা কেন তার ঘর?—বলেই মিরণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পলের মুখের দিকে তাকালো।

আমি যাচ্ছি এখন।

হয়তো পল সত্যি সত্যিই নাতালিয়ার ঘরে গিয়ে বসতো, কিন্তু তার ঘর বন্ধ। সর্বশেষে ধাপের উপরে বসে পল নীচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো; বিরাট মশখব্যাদন করে সিঁড়িটা যেন প্রতিবাদের ভংগীতে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নীচ দিয়ে কে যেন হেঁটে গেলো। লোকটা কি বলতে বলতে গেলো পল তা স্পষ্ট বুঝে উঠত পারলো না; ওর সমগ্র চেতনা আচ্ছাদিত করে একটি প্রশ্নই মনপ্রাণ জুড়ে বসেছে—কি করে নাতালিয়াকে ঐ সব রঙীন টুপী পড়া ফোতোবাবুদের সংসর্গ থেকে সরিয়ে আনা যায়? এর আগে যে লোকটা এসেছিলো তার মাথায়ও ছিলো রঙীন টুপী, কিন্তু সে টুপীটা ছিলো কালো রংয়ের আর গোঁফের বদলে তার ছিলো লালচে দাড়ি। সে দেখতে ছিলো ঠিক যেন একটা রোঁয়া ছাঁটা শয়তানের মতন। পল ভাবতে লাগলো: এই লোকগুলো কেনই বা জন্মায় পৃথিবীতে আর কেনই বা বেঁচে থাকে? কেন ওদের সব ধরে ধরে সশ্রম নির্বাসনে পাঠায় না? কিন্তু পল এসব প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেলোনা, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লো। অনেক দিন হয়ে গেলো ওর মনের সেই সদা বিষণ্নভাব কেটে গেছে—অপসারিত হয়ে গেছে সেই অন্ধকারময় কালো ছায়া ওর মনের আকাশ থেকে; কিন্তু আজ আবার যেন তারই পুনরাবর্তন হলো; তাই ওর অনুভূতি আরও তীক্ষ্ণ

আরও গভীর হয়ে উঠলো। পলের অন্তর এক নিদারুণ আঘাতের অসহনীয় ব্যথায় রক্তাক্ত হয়ে উঠলো।

তেমনি বিমর্ষ ভরাক্রান্ত হৃদয়ে পল চুপ করে বসে রইলো; কেটে গেলো এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা...ক্রমে পলের অপসৃয়মান প্রতীক্ষাকুল রাত্রির শেষে এলো নবপ্রভাতের অরুণোদয়। একখানা গাড়ী এসে থামালো দোরের গোড়ায়; সিঁড়িতে জেগে উঠলো পায়ের শব্দ।

পলের সমস্ত শরীর আকুঞ্চিত করে দিয়ে এক তীব্র হিম-প্রবাহ বয়ে গেলো। সে চলে যেতে চাইলো, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। উস্কখুস্ক চেহারা, বিবর্ণ মুখ, দুটি চোখে ক্লান্ত ম্লান দৃষ্টি, নাতালিয়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। পলকে দেখতে পেয়েই সে অর্ধপথে থমকে দাঁড়ালা। ওর এই অসময় উপস্থিতিতে মনে মনে সে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে উঠলো।

একি! তুমি! কি ব্যাপার?—বলতে বলতে নাতালিয়া ওর মুখ পানে তাকিয়েই থেমে গেলো।

পলের মুখখানা শুকনো, একটা কঠিনভাব সেই শুকনো মুখের উপরে কালো ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। রাত জাগার দরুণ চেহারা শীর্ণ, মলিন, দীন; রাত ভোর সেই দুঃসহ চিন্তার গুরুভারে আর নিদ্রাহীন রাত্রি জাগরণে পলের চোখে ফুটে উঠেছে এক উদ্‌ভ্রান্ত কঠোর দৃষ্টি; সে দৃষ্টি নাতালিয়াকে শঙ্কিত করে তুললো। পলের চোখে এমন দৃষ্টি দেখেনি আর কোন দিনও।

লজ্জার চাইতে নাতালিয়া ভয়ই পেলো বেশী। সিঁড়ির রেলিংয়ের উপরে ভর দিয়ে সে সেই যে দাঁড়িয়ে রইলো আর একটি পা-ও অগ্রসর হবার সাহস হলো না। পলও তেমনি কঠোর দৃষ্টিতে ওর পানে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। সমস্ত দৃশ্যটা ভাষাহীন, মৌন, কঠোর; ছাদ সংলগ্ন ঘুলঘুলির পথে একফালি শীর্ণ আলো এসে ছড়িয়ে পড়ে সেই কঠোরতাকে আরও যেন তীব্র করে তুললো। আলোর রেখা প্রথমে পলের মুখের উপরে পড়ে ধীরে নেমে গিয়ে নাতালিয়ার মুখের উপরে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিমুহূর্তেই তার মুখখানাকে যেন বদলে বদলে দিতে লাগলো।

যদি একটিবার পল তার সেই মুখাকৃতি দেখতে পেতো তবে হয়তো

অবাক হয়ে যেতো। দু'হাঁটুর উপরে কনুইয়ের ভর রেখে, দু'হাতের ভিতরে মুখ গুঁজে বিচারকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে সে নীচের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। প্রতি মুহূর্তে অবস্থা কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগলো—দু'জনার কেউই একটুও নড়ছে না। ক্রমেই নাতালিয়ার মুখখানা আরও পাংশু আরও ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে লাগলো আর পলের সেই তীব্র কঠোর ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টির সামনে অন্তরে অন্তরে সে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। নাতালিয়ার মনে হলো বসন্তের দাগে ভরা পলের বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানা ছেয়ে যেন একটা তীব্র ঘৃণা, তীব্র নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরিয়ে আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তে যদি না একটা বিড়াল এসে ওদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তো তবে কেমন করে যে ঐ অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটতো তা কেউই বলতে পারে না। বিড়ালটা ছাদ সংলগ্ন ঘুলঘুলির উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে পলকে ডিঙিয়ে নাতালিয়ার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে নীচে চলে গেলো।

এখানে অবশ্য আমি কোন সুলক্ষণ বা কু-লক্ষণের ইঙ্গিত করতে চাইনি; কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এই ঘটনার অবতারণা করেছি,—সেটা হচ্ছে 'সত্য'। আমার সৃষ্ট এই বিড়ালটির মতন এমন অনেক ছোটখাটো জিনিষ প্রতিনিয়তই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আসে এবং বিলীন হয়ে যায় তাদের আসা ও যাওয়ার ভিতর দিয়ে অনেক বড়ো বড়ো ঘটনার, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় কিন্তু সেই তুচ্ছ অকিঞ্চিতকর জিনিষগুলি প্রায়ই দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্নই থেকে যায়। পল ও নাতালিয়ার ঐ কঠিনতম মুহূর্তে যে মহামান্য বিড়ালটি আবির্ভূত হয়ে অতি সহজেই দুজনকে ঐ সংকটময় অবস্থার ভিতর থেকে উদ্ধার করলো তার আকার কি রকমের, কি রঙ ইত্যাদি কিছুই আমি বলতে পারবো না সত্য কিন্তু তার কাছে আমি চির ঋণী।

একটা ভয়ার্ত চীৎকার করে নাতালিয়া লাফিয়ে পলকে অতিক্রম করে উপরে উঠে এলো; চকিতে পলও এক পাশে সরে দাঁড়ালো। হতভাগা বিড়ালটা কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলো, বাপ্ ঘরের তালা খুলতে খুলতে নাতালিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলো। পল ভয়ে আঁৎকে উঠেছিলো। ক্রমে দু'জনেই তাদের সেই বিহ্বল বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে উঠলো। তালা খুলে নাতালিয়া

পলকে ঘরের ভিতরে আসতে আহ্বান জানালো।

নীরবে পল ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। এখন তার চোখ মুখের চেহারা দেখে মনে হবে যেন সে কোন একটা কঠিন সমস্যার সমাধানে এসে পৌঁছেছে। পল জানালার সামনে চেয়ারের উপরে গিয়ে বসলো। নাতালিয়া কাঁধের উপরে পিন দিয়ে আঁটা পুরানো ধরণের শালটা খুলতে লাগলো।

আজ এতো ভোরে উঠেছ যে বড়?—আবার আগের মতন সেই অসহনীয় কঠোর নীরবতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে নাতালিয়া বলে উঠলো।

ম্লান দুটি চোখের করুণ দৃষ্টি মেলে পল নাতালিয়ার মুখের পানে তাকালো, তারপর, কে যেন ওর অন্তরে বসে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে, এমনিভাবে থেমে থেমে ভারী গলায় বলতে শুরু করলো:

না, এখন পর্যন্ত আমি ঘুমোতে যাইনি। কাল সেই লোকটাকে তোমার সঙ্গে দেখার পর থেকে আমি...না, এ অসম্ভব! এ ধরণের জীবন তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে! তুমি কি ভাবো খুব ভালো, খুব সুখের এ জীবন? লোকের অধিকার আছে তোমাকে নিয়ে যা খুসী তাই করবার? সত্যি এরই জন্যে কি এসেছো তুমি সংসারে? না, এপথ মোটেই সৎপথ নয়, ভদ্র নয়, না আদৌ ভদ্র নয়! তোমার নিজের কাছেই কি এটা খুব ভালো লাগে? অসম্ভব! লাগতেই পারে না। কোথাকার কে একটা লোক এলো, তোমাকে সঙ্গে করে যেখানে খুসী গেলা...তারপর সেই সব যাচ্ছেতাই কান্ড। না, নাতালিয়া তুমি ক্ষান্ত দাও! বন্ধ করো এসব নাতালিয়া!—পলের মিনতিভরা শান্ত করুণ কণ্ঠের শেষের দিকটা কেঁপে কেঁপে ভেঙে পড়লো।

নাতালিয়া পলের কাছ থেকে এতোটা আশা করেনি। শালখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রবল রক্তোচ্ছ্বসে ওর মুখখানা থেকে থেকে রক্তিম হয় উঠছে; ঠোঁট দুটো অদ্ভুতভাবে নড়ে চলেছে কিন্তু একটুও শব্দ ফুটে বের হচ্ছে না। কি যেন একটা বলতে চাইছে নাতালিয়া কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছে না কিম্বা হয়তো বলা উচিৎ কিনা তাও স্থির করে উঠতে পারছে না।

পল নাতালিয়ার মুখের পানে একটিবার চোখ তুলে তাকালো তারপর,

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় সেই অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলতে শুরু করলো:

নাতালিয়া!

নাতালিয়া পলের কাছে সরে এলো তারপর ওর কাঁধের উপরে একটা হাত রেখে ব্যথাভরা শান্তকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলো। ওর কণ্ঠে ফুটে উঠলো একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার সুর।

শোনো! এইটাই যখন পথ...আমি তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলবো না, অকপটে সব কথা তোমাকে খুলে বলছি, যা সত্য তাই। আমি বুঝি, যা আমি করে বেড়াই সেটা তোমার কাছে আদৌ প্রীতিকর নয়। হাঁ, খুব ভালো করেই জানি আমি সে কথা! কিন্তু এ ছাড়া কিইবা আমি করতে পারি? তুমি জানো এই হচ্ছে আমার জীবিকা। আর কোন যোগ্যতা নেই আমার। কাজ? জানিনা আমি কেমন করে কাজ করতে হয়, তাছাড়া ভালো লাগে না। কাজ করা আর উপোস করে মরা—এটাই কি ভালো হতো? কিন্তু তবুও আমার আজও লজ্জা সরম সব দূর হয়ে যায়নি; এমন কি এই মুহূর্তে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। বিশ্বাস করো, খুবই লজ্জাবোধ করছি আমি; কিন্তু তবুও আমার পক্ষে কি-ইবা আর করার আছে? কিছু নেই, আর কোন উপায়ই নেই। দীর্ঘদিন এই ধরণের জীবন যাপন করে আসছি আর আজীবন করতেও হবে তাই। তুমি জেনে রেখো এখন আমি কি করবো। এখান থেকে আমি অন্যত্র উঠে যাবো; কোথায়? সে কথা তোমাকে জানাবো না। আমার কথা তুমি ভুলে যেও। আমাকে তোমার কোন কাজে লাগবে? তার চাইতে দেখে শুনে একটি ভালো মেয়ে বিয়ে করে ঘর সংসার করো। অনেক ভালো মেয়ে পাবে! —নাতালিয়ার শেষ কথাটির ভিতরে যেন ফুটে উঠলো একটা প্রশ্নের সুর।

পল প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগলো।

আমাদের দু'জনার কথা এক হলোনা! আদৌ এক হলোনা! আমার কথার মূল বক্তব্য হচ্ছে তোমাকে নিয়ে, আমাকে নিয়ে নয়। আমার কি? আমিতো ঠিকই আছি। কিন্তু তোমাকে এপথ ছাড়তে হবে—বড্ডো নোংরা এপথ! একবার ভেবে দেখো দেখি, একটা লোক এলো আর তোমাকে নিয়ে

চলে গেলো—ছিঃ! আর ঐ লোকগুলো হলো কিনা যতো সব পাজী, বদমায়েস, লোফারের দল। কেমন করে যে মানুষ অমন হয় ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নোংড়া জীব!

এ পথের এই হচ্ছে রীতি।

পলকে শান্ত করার অভিপ্রায় নাতালিয়া ওর কাঁধের উপরে মৃদু মৃদু চাপড় দিতে লাগলো। পলের কণ্ঠের তিক্ত সুর আর নিদারুণ ঘৃণা ও বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে ওঠা মুখের পানে তাকিয়ে নাতালিয়া মনে মনে দারুণ শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

না, এ চলবে না! মিছে কথা বলছ তুমি, আমি খোকা নই! কোনই প্রয়োজন নেই তোমার...আমি অনেক ভেবেছি, অনেক চিন্তা করে দেখেছি। এপথ ছেড়ে দাও, ছাড়তেই হবে তোমাকে এপথ!

লক্ষ্মীটি, রাগ করোনা, সত্যি বলতো কি করতে পারি আমি?—আরও একটু সরে এসে পলের মুখের কাছে মুখ এনে শান্তকণ্ঠে নাতালিয়া বললো; কিন্তু মনে মনে সে আরও ভীত হয়ে উঠলো। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে একটা হাত জানালার উপরে রেখে অন্য হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পল বলে উঠলো:

করতেই হবে! নিশ্চয়ই করতে হবে। ছেড়ে দাও এসব! তাড়িয়ে দাও, দূর করে দাও ঐ সবগুলোকে! জাহান্নামে যাক্ সব শয়তান হারাম-জাদার দল!

অতো চেঁচিওনা, লোকে শুনতে পাবে। এসো আমরা আস্তে আস্তে কথা বলি। ভেবে দেখো...

না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি।

না, একটু শোন, এক মিনিট!

সবটুকু সাহস আর শক্তি এক করে নাতালিয়া পলের হাতখানা চেপে ধরলো তারপর বসবার আর কিছু হাতের কাছে না পেয়ে পলের সামনে নত-জানু হয়ে মেঝের উপরে বসে পড়ে বলতে আরম্ভ করলো:

কোনও কাজেরইতো আমি উপযুক্ত নই; আর কেউই আমাকে গ্রহণ করবে না, কারণ এই হচ্ছে আমার পরিচয় পত্র...

প্রত্যেকটি কথার উপরে জোর দিয়ে সুস্পষ্ট কণ্ঠে নাতালিয়া বলে চললো।

পলের সর্বাঙ্গ ছেয়ে জেগে উঠলো এক দুর্নিবার অসহিষ্ণুতা; পরক্ষণেই কি একটা কথা মনে হতেই ওর সমস্ত শরীর একবার থর থর করে কেঁপে উঠলো তারপর নীচু হয়ে নাতালিয়ার চোখে চোখ রেখে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললো:

শোন, তুমি আমাকে বিয়ে করবে? করবে? করবে বিয়ে? এসো রাজী হও। আমি তোমার...তোমার জন্য আমি...ভীরু কপোতের মতন কাঁপতে কাঁপতে পলের কণ্ঠ মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে ভেঙে পড়লো। মুহূর্তে নাতালিয়া সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, দুটি চোখ বিস্ফারিত; হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলের বক্ষলগ্ন হয়ে কান্নাভাঙাকণ্ঠে পলের কানে কানে ফিস্-ফিস্ করে বলতে আরম্ভ করলো।

প্রিয়তম! প্রিয়তম! আমার প্রিয়! বিয়ে করবে আমাকে...আমাকে তুমি! তোমাকে...তোমাকে বিয়ে করবো...আমি! আমি! কি অদ্ভুত! পাগল...পাগল তুমি! সত্যিই তুমি একটি খোকা...খোকা তুমি একটি...

নাতালিয়া পলকে চুম্বন করতে আরম্ভ করলো; দৃঢ় আলিঙ্গনে দুহাতে পলের গলা জড়িয়ে ধরে পাগলের মত হেসে, কেঁদে, অস্থির হয়ে পলকে অভিভূত করে ফেললো।

এ বস্তু পলের কাছে সম্পূর্ণ নূতন—অভিনব। এতোদিন সে যেন এক অস্পষ্ট কুহেলিকাঘেরা আধো আলো আধো অন্ধকারের ভিতর ঘুরে বেড়িয়েছে; পল শুনতে পেলো তার শিরায় শিরায় প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসের প্রলয় ডমরু; ক্রমে ওর সব চেতনা সব সত্তা আচ্ছন্ন হয়ে এলো; দারুণ আলিঙ্গনে নাতালিয়ার দেহখানি চেপে ধরে দ্রুত নিশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে কি যেন বলার চেষ্টা করলো তার কানে কানে তারপর তৃষ্ণার্ত উষ্ণ ঠোঁটে নাতালিয়ার মুখখানি চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে লাগলো...

জানালার পথে নব প্রভাতের অরুণ কিরণ ছোট্ট ঘরখানিকে কোমল সোনালী আলোয় ভরিয়ে তুলছে...

পলের ঘুম ভাঙলো। ঘরের ভিতরটা কেমন যেন গুমোট হয়ে উঠেছে

—চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যায় ভরে গেছে ঘর, দূর থেকে একটা অস্পষ্ট একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছে; রোদ এসে পড়েছে নাতালিয়ার মুখে; চোখ দুটি বোজা, ভ্রূকুটিভঙ্গে কুটিল হয়ে উঠেছে কপালের রেখা; উপরের ঠোঁট ঈষৎ উর্ধ্বে তোলা—কেমন যেন একটা অসন্তুষ্টির ভাব রয়েছে ফুটে; গাল দুটি থেকে থেকে লাল হয়ে উঠেছে—পলর মনে হলো নাতালিয়া ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। ওর সুন্দর সোনালী চুলগুলো ঘুমের ঘোরে আলুথালু হয়ে সুন্দর হালকা গুচ্ছে গুচ্ছে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে; একটা কাঁধ নগ্ন —নিটোল, সুন্দর, পরিপূর্ণ। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী নাসা-রন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠছে। রোদ পড়ে ওর সমস্ত দেহখানি যেন স্বচ্ছ হয়ে এক অপূর্ব জ্যোতিতে ঝলমল করে উঠছে।

পাশে শুয়ে পল ধীরে ধীরে ওর চুলগুলোর উপরে হাত বুলাতে লাগলো। ঘুমভরা চোখ মেলে নাতালিয়া একবার পলের দিকে তাকালো তারপর অতি মধুর অতি কোমল একটু মিষ্টি হাসি হেসে রোদের দিক থেকে ঘুরে পাশ ফিরে শুলো।

পল উঠে পোষাক পরে নিলো তারপর অতি সন্তর্পণে চেয়ারটা তুলে এনে বিছানার পাশে রেখে তার উপরে বসে একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে নাতালিয়ার মুখের পানে তাকিয়ে বসে রইলো। নাতালিয়ার প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও যেন উৎকর্ণ পলের দুটি কানে মধু বর্ষণ করতে লাগলো, আর কোন দিনও নাতালিয়াকে ওর এতো মধুর, এতো প্রিয়, এতো আপনার মনে হয়নি; নীরব স্মিত মুখে পল এক অনাগত ভবিষ্যতের মধুময় স্বপ্ন রচনায় বিভোর হয়ে গেলো—যেমন করে মধুমিলনের সুখ-স্মৃতি দিয়ে নতুন প্রেমিক কল্পনায় বুনে চলে স্বপ্নের সোনালী ঊর্ণা।

পল ভাবতে লাগলো—বিয়ের পর সে নিজে দোকান খুলবে,—ছোট্ট একটি ঘর; কিন্তু মিরণের ঘরের মতন অমন নোংরা, অন্ধকার, ঝুল-কালি ভরা নয়; পরিষ্কার তক্‌তকে, আলো ভরা। পাশে থাকবে আর একটি ছোট কামরা—ওদের শোবার ঘর; ছোট্ট কিন্তু নীল কাগজে মোড়া তার দেয়াল। প্রথম ঘরটা—দোকান ঘর—তার দেয়ালের কাগজ হল্‌দে আর ফুলকাটা। জানালার সামনে ছোট্ট একটু বাগান; সেই জানালায় বসে প্রতিদিন সন্ধ্যায়

ওরা করবে চা-পান; গরমের দিনে বাতাস বয়ে আনবে টাটকা তাজা হরিৎ-পত্র-পুষ্পের মিষ্টি গন্ধ, মৃদু মৃদু বইবে ঘরের ভিতরে। নাতালিয়া করবে রান্না; পল তাকে শেখাবে জুতা তৈরী করতে; তারপর একদিন আসবে সন্তান...আরও কত কি—সুন্দর শান্ত সুমধুর...

ভবিষ্যত সুখের সুমধুর কল্পনায় পলের অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। গভীর তৃপ্তিভরা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে কেটলীটা তুলে বাইরে নিয়ে গিয়ে পরিস্কার করতে লেগে গেলো। আঃ! কি ভালোইনা ওর লাগছে! নাতালিয়া ঘুম ভেঙে উঠেই দেখবে কেটলীতে জল ফুটছে আর তারই পাশে পল ঠিক গৃহস্বামীর মতনই রয়েছে বসে। কতোই না প্রশংসা করবে সে...

আগুন জ্বলে উঠতেই পল তাতে কয়লা ঢেলে দিয়ে ঘরের ভিতরে ফিরে এলো ; ভাবলো ঘরের এলোমেলো সব কিছুই গুছিয়ে তুলবে সে চুপি চুপি; কিন্তু হঠাৎ নাতালিয়ার ঘুম ভেঙে গেলো; সঙ্গে সঙ্গে পলের কল্পনার সৌধও চুরমার হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। মাথার নীচে দুটি হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে একান্ত গদ্যময়ভাবে নাতালিয়া ছাদের পানে তাকিয়ে রইলো; পল যে ওর খুবই পরিচিত এছাড়া আর কোন বিশেষ ভাব ফুটে ওঠেনি নাতালিয়ার মুখে। পলের কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেলো।

আমি জল বসিয়ে দিয়েছি—পলের কণ্ঠে একটু আহত অভিমানের সুর।

তাই নাকি? কটা বাজে এখন?

বারোটা বেজে গেছে।

নাতালিয়ার এই অতি মামুলী ঘরোয়া কথাবার্তার ধরণে পল মনে মনে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলো। ওর মনে যে এক বিশেষ অনুভূতির শিহরণ জেগে উঠেছে তাতে আলাপ-আলোচনার ধরণ হওয়া উচিত ছিলো সম্পূর্ণ অন্যরূপ—কিন্তু কি সে কথা, কি সে ভাষা, সে সম্পর্কে আদৌ কোন স্পষ্ট ধারণা পলের নেই। পুনরায় পল নাতালিয়ার পাশে এসে বসলো।

কেমন লাগছে? মৃদু হেসে নাতালিয়া প্রশ্ন করলো।

আঃ! খুব ভালো! নাতাশা, চমৎকার!—আনন্দে উৎসাহে পলের কণ্ঠ

পূর্ণ হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, সুন্দর!—একটু হেসে নাতালিয়া বললো।

পলের দারুণ ইচ্ছা হলো ওকে চুম্বন করে ; দু'হাতে নাতালিয়ার মাথাটি তুলে ধরে নীচু হয়ে তার ঠোঁট দুটি নাতালিয়ার মুখে চেপে ধরলো।

তাই বলো! আগেও এরকম অভ্যাস ছিলো দেখছি!—নাতালিয়া অনুচ্চ শব্দে একইু হেসে উঠলো।

ওর কথা এবং হাসির শব্দে পলের সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

কি বললে?—পরিস্কার বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলো পল।

আমি? ও কিছু না, এমনি। আচ্ছা, এখনও কি আমাকে বিয়ে করবার সাধ আছে তোমার?—নাতালিয়ার কণ্ঠে কেমন যেন একটা সন্দেহের, একটা পরিহাসের সুর অনুভব করলো পল। এর মানে কি?...

বিছানার উপরে উঠে বসে নাতালিয়া পোষাক পরতে লাগলো: ওর মুখে কেমন যেন একটা করুণ অথচ নিষ্ঠুরতার ছাপ।

হ'লো কি তোমার? —ভয়ে ভয়ে পল জিজ্ঞাসা করলো।

কেন? কি আবার হবে?—পলের দিকে না তাকিয়েই নাতালিয়া জবাব দিলো।

কিন্তু ঠিক যে কি হয়েছে তা পলও জানে না; তবে এইটুকুই অনুভব করছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে নাতালিয়ার যেমনটি হওয়া উচিৎ ছিলো ঠিক যেন সে তেমনটি নয়। কিন্তু নাতালিয়ার দিক থেকেও কারণ আছে এমন হওয়ার। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ওর ভিতরে এলো একটা পরিবর্তন; এইমাত্র ওদের দুজনার ভিতরে যা ঘটে গেলো তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ভেসে উঠলো তার মানস পটে। নাতালিয়ার মনে পড়ে গেলো—অন্তরে অন্তরে অনুভব করলো সে যে এক অন্ধ উন্মাদনার উদগ্র কামনার কবলে আত্মসমর্পণ করে হারিয়ে ফেলেছে তার জীবনের প্রথম পাওয়া একমাত্র প্রিয়তম বন্ধুটিকে; উভয়ের ভিতরের সেই সুমধুর পবিত্র সম্বন্ধটিকে টেনে নামিয়ে এনেছে ধূলায়—বহু-পরিচিত সেই ক্লান্তিকর কুৎসিত পরিবেশে। ও বস্তু ঢের ঢের পেয়েছে সে জীবনে ; কিন্তু পলের ভিতর যে বস্তুটি ওকে আকর্ষণ করেছিলো সবচাইতে

বেশী, সেটা হচ্ছে নাতালিয়ার প্রতি তার সম্ভ্রমভরা, শ্রদ্ধাভরা, বন্ধুত্বের ভাব। কয়েকঘণ্টা আগেও তা ছিলো অম্লান, উজ্জ্বল, ভাস্বর; কিন্তু ওর মনে হলো এইমাত্র তা মুছে গেলো নিশ্চিহ্ন হয়ে; খুব ভালো করেই জানে নাতালিয়া কেমন করে সে বস্তুর ঘটে অপমৃত্যু, আসে সমাপ্তি। এমনি করে সবাই প্রথমে ঘনিয়ে আসে কাছে। যদিও এই মুহূর্তে নাতালিয়া দেখতে পাচ্ছে পল হয়েছে সুখী—আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে ওর অন্তর; কিন্তু কিছুতেই ভাবতে পারছে না সে যে পলের এই আনন্দ, এই আকর্ষণ, হবে দীর্ঘস্থায়ী। নাতালিয়া আজ তার একমাত্র প্রিয়তম বন্ধুটিকে ফেলেছে হারিয়ে—ক্ষোভে দুঃখে, ব্যথায়, অনুশোচনায় ওর অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। পল এখনও তার সুখ-কল্পনার রাজ-সিংহাসন থেকে চ্যুত হয়নি কিন্তু তবুও তার কাজে কর্মে হাবভাবে নাতালিয়া যেন তার নিজের মনের ঐ জেগে ওঠা অনুভূতির অভিব্যক্তি না দেখে পারছে না।

নাতালিয়ার পোষাক পরা দেখতে দেখতে ওকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরার এক অদম্য কামনা জেগে উঠলো পলের মনে। আত্মসংযমের কোন প্রয়োজন নেই, কিম্বা সে শক্তিও আর তার নেই; উন্মত্ত কামনার অন্ধ আবেগে পল দৃঢ় আলিঙ্গনে ওকে বুকের ভিতর চেপে ধরলো ; একটা ক্লিষ্ট হাসি হেসে একান্ত নির্বিকার ভাবে নাতালিয়া ওর উক্ত আলিঙ্গনে আত্ম-সমর্পণ করলো। নাতালিয়া ঠাণ্ডা, ভিজা স্যাঁতসেতে ; কিন্তু পলের অত্যুগ্র কামনার উত্তাপ এতো প্রখর এতো তীব্র যে তা দু'জনার পক্ষেও প্রচুর ; তাই নাতালিয়ার ভাবান্তর ওর চোখে আদৌ ধরা পড়লো না...

মিনিট দশেক পরে ওরা দু'জনে মিলে চা খেতে বসলো। নাতালিয়া ইতি-মধ্যেই হাতমুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে পরিপাটি হয়ে নিয়ে বসেছে বিছানায় ; আর পল বসেছে চেয়ারে ওর মুখামুখী হয়ে। যুগপৎ এক প্রবল উত্তেজনা আর সুমধুর ক্লান্তির আবেশে পলের দেহ মনপূর্ণ হয়ে উঠেছে; চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে ম্লান দুটি চোখের ব্যথা ভরা দৃষ্টি মেলে নাতালিয়া পলের পানে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো।

হঠাৎ পল দেখলো...নাতালিয়ার দুগাল বেয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল গরিয়ে নেমে এসে পাত্রস্থ চায়ের সঙ্গে মিশছে। এই দুর্বোধ্য মেয়েটির

মতন এমন করে চায়ের সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে কেউ কখনও পান করেছে কিনা সন্দেহ; অথচ সে তেমনি শান্ত, তেমনি স্থির তেমনি নির্বিকার।

হলো কি তোমার? কি হয়েছে? এর মানে কি?—পল দ্রুত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে নাতালিয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো।

নাতালিয়া তার হাতের সেই চোখের জল মেশানো চায়ের পাত্রটা ঠক করে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখতেই খানিকটা গরম চা টলকে টেবিলের উপরে পড়ে গেলো; পরক্ষণেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শুরু করলো:

কি বোকা, কি নির্বোধ আমি! শেষ পর্যন্ত কিনা নিজের ঘরেই আমি নিজে ডাকাতি করলুম। জীবনে একটি বারের জন্য আমি শুনতে পেলাম নাইটিংগেলের গান আর নিজের নির্বুদ্ধিতার দোষে নিজেই কিনা আমি তাকে ভয় পাইয়ে দিলাম উড়িয়ে। হায় নাতাশা! নিজের হাতেই মুছে দিলি তুই তোর জীবনের সব সুখ, সব শান্তি, সব আনন্দ! ইচ্ছা হচ্ছে নিজের হৃদপিন্ডটাকে টেনে ছিঁড়ে এনে চিবিয়ে খাই! ওঃ! ওঃ! ওঃ! কি নির্বোধ কি নির্বোধ আমি! বোকা—বোকা! একেবারে বোকা!

পল কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। পলের আলিঙ্গনে নাতালিয়ার মনের সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো; আরও বেশী করে সে কাঁদতে শুরু করলো। অবশেষে সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে পল বলতে আরম্ভ করলো:

চুপ করো নাতাশা, চুপ করো! শান্ত হও! আমরা বিয়ে করবো আর তার পরেই দেখো শুরু হবে আমাদের নূতন জীবন—সত্যিকার জীবন। বিয়ের পরে আমি দোকান খুলবো—তুমি হবে আমার গৃহের কর্ত্রী, হবে ঘরণী; যেমন করে আর দশজন মেয়ে ঘরসংসার করে থাকে তুমিও করবে তেমনি। কি সুন্দর! কি চমৎকার হবে তখন!

পলের হাতটা ঠেলে দিয়ে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে নাতালিয়া বলে উঠলো: অবশ্য, সে সুরের ভিতরে একটু ক্ষীণ আশার রেশও বুঝিবা ধ্বনিত হয়ে উঠলো:

ক'দিনের জন্য? বড়ো জোর এক সপ্তাহ থাকবে তোমার গলায় এই সুর! তোমাদের আমরা চিনি—খুব ভালো করেই চিনি আমরা তোমাদের

জাতকে; বুঝেছ খোকা? আমার উদ্দেশ্য তা নয়—আদৌ ভাবিনি আমি সে কথা, তোমার ভয় নেই। তোমার প্রস্তাবে আমি আদৌ কোন গুরুত্ব দেইনি আর দেবোওনা কোন দিন। সত্যি সত্যিই কি ভেবেছ যে আমি তোমায় বিয়ে করবো? বিয়ে আমি কাউকেই করবোনা—তোমাকেও না। তা ছাড়া তুমি ভালো; ভালো জিনিষ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার অতীত জীবনের জন্য একটি দিনের তরেও চাইনা আমি কারুর কাছ থেকে কোনরূপ গঞ্জনা শুনতে; নিশ্চয়ই না জেনে রেখো। ভাবছো, তোমার স্ত্রী হলে পর আমার অতীত কথা কোন দিন তুমি মনেও আনবে না! হায় ভাই! দুদিন পরে ঠিক আর দশজনার মতন তুমিও বলতে আরম্ভ করবে—খুব ভালো করেই জানি আমি সে কথা। জীবনের জলাভূমিতে আমার মতন মেয়ের জন্য কোথাও এক ফোঁটা শুষ্ক স্থান নেই। কিন্তু যাক সে সব কথা—কোনই লাভ নেই ওসব আলোচনা করে। আমি তোমার প্রস্তাবে আদৌ সম্মত নই। কিন্তু এই দুঃখটাই আজ আমার সব চাইতে বড়ো হয়ে বুকে বাজছে যে, মূর্খ আমি, তাই তোমার মতন বন্ধুকেও কিনা আজ আমি হারিয়ে বসে আছি! আজ থেকে তুমি আর আমার বন্ধু নও আর তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি নিজে একা। হায়! কতো বড়ো নির্বোধ আমি! কি ভীষণ বোকা!...

পল আপ্রাণ চেষ্টা করলো, কিন্তু ওর কথার কোন তাৎপর্যই তার হৃদয়ঙ্গম হলো না। নাতালিয়ার চোখের জলে ওর অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠেছে, এক গভীর বিষাদে, নিদারুণ ভয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ওর মন, প্রাণ, সত্তা।

শোনো নাতাশা! আমাকে অমন করে আঘাত দিও না—গভীর সুরে পল বলতে আরম্ভ করলো: ঐ সব কথা বলে আমায় ব্যথা দিও না। আমি বুঝতে পারিনা ওসব কথার কি মানে—কিছুই বুঝতে পারি না। কিন্তু তোমার ঐ কথাগুলোই কেবলমাত্র সব কিছু নয়; আমি যা বলতে চাই শোনো! তোমার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, বুক চিরে হৃদপিন্ডটাকে টেনে ছিঁড়ে এনে দিতে হলেও আমি প্রস্তুত আছি। দেখো, এ দুনিয়ায় একমাত্র তুমিই আমার সব চাইতে আপন, সব চাইতে প্রিয়—আমার প্রিয়তম। আমি সবটুকু অন্তর দিয়েই তাই বিশ্বাস করি, অনুভব করি। সব কিছুই করতে পারি আমি

তোমার জন্য। তুমি যদি বলো, পল, ঐ জ্বলন্ত সূর্যটাকে গিয়ে নিভিয়ে দিয়ে এসো'—দেখবে তক্ষুণি আমি ছাদ বেয়ে উঠে সূর্যটকে লক্ষ করে এমন জোরে জোরে ফু দিতে আরম্ভ করবো যে, হয় সূর্যটাই নিভে যাবে নয় তো আমি নিজেই দম ফেটে মরে যাবো; যদি একবার বলো, 'পল ঐ জানালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ো,—তিল মাত্র বিলম্ব না করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়বো; কিম্বা যদি বলো, পল, ঐ লোকটাকে কেটে ফেলো—তক্ষুণি আমি ছুটে গিয়ে তার গলা কেটে আসবো, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না। যা তুমি চাও তাই করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত। বলো যদি, পল, তুমি আমার পদ চুম্বন করো!—মুহূর্তেই তাই আমি করবো। দেখবে? এই দেখো তবে!

পল নাতালিয়ার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো।

পলের আবেগ ভরা উচ্ছ্বাসে নাতালিয়া অভিভূত হয়ে পড়লো; প্রথমে ওর কথা শুনে নাতালিয়ার মুখে ফুটে উঠেছিলো এক অবিশ্বাস ভরা স্মিত নীরব হাসি; যখন পল সূর্যটাকে নিভিয়ে দেবার কথা বললো তখন সে কৌতুকে হেসে উঠলো; কিন্তু যখন ওর সম্মানের জন্য সে লোক খুন করার প্রস্তাব করলো, তখন নাতালিয়ার অন্তর আত্মা মথিত করে জেগে উঠলো এক তীব্র কম্পন। পলের সমস্ত শরীর যেন তখন এক ভয়ংকর উত্তেজনায় জ্বলে উঠে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। অবশেষে যখন পল ওর পদ চুম্বন করার কথা বললো, নাতালিয়ার হৃদয় গর্বে ভরে উঠলো; পদ চুম্বনরত পলকে সে এতোটুকুও বাধা দিলো না।

মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে চিরদিনই মানুষ পায় আনন্দ। একটা মানুষ তার দাস! তাছাড়া মানবোচিত অন্যান্য ধর্ম থেকেও নাতালিয়া সম্পূর্ণ বঞ্চিত নয়—বিশেষ করে করুণা; পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া পলের প্রতি করুণায় ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠলো; নীচু হয়ে নাতালিয়া পলকে ধরে তুললো তারপর এমনভাবে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো যে, ইতি-পূর্বে কোনও দিনও আর সে কাউকেই অমন গাঢ় নিবিড় উত্তাপ ভরা ব্যাগ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেনি। ক্রমে দুজনেই এক অভূতপূর্ব সুখাবেশে বিভোর হয়ে এলিয়ে পড়লো।

কিন্তু কেউই তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্থির, সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে উঠতে

পারেনি। ঠিক করলো দুজনে মিলে শহরের বাইরে গিয়ে মাঠে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসবে। পল ভুলে গেলা তার দোকানের কথা, মনিবের কথা, ভুলে গেছে জগত সংসার সব কিছু। জনমানবহীন অপরিসর পথের বুক বেয়ে হেঁটে চলেছে নাতালিয়ার পাশে পাশে। পাছে কোনও পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই নাতালিয়া বেছে নিয়েছে এই পথ।

দীর্ঘ সময় ওরা দুজনে একা একা মাঠের ভিতরে বেড়িয়ে বেড়ালো। অকপট চিত্তে দুজনে দুজনার সঙ্গে আলাপ করে চলেছে—কারুর মনে আর কোন সংকোচ নেই, ভয় নেই, পাছে কেউ কোন অর্থহীন অদ্ভুত কথা বলে ফেলে অপরের কাছে হাস্যাস্পদ হয় নেই তার শংকা। কেউই চাইছে না জোর করে তার নিজস্ব মত অপরের ঘারে চাপিয়ে দিতে—প্রতিষ্ঠিত করতে নিজের অনুভূতি, নিজের ধারণা; কেউ কারুর উপরে চাইছে না প্রধান্য বিস্তার করতে; প্রণয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা যেমন করে নানান কলা কৌশল বিস্তার করে প্রেমকে খুব রসালো করে তুলতে প্রয়াস পায়—অথচ খুব কম-মাত্রায়ই সেটা হয়ে থাকে মুখরোচক—তার কোন প্রচেষ্টাই ওদের ভিতরে নেই। সুতরাং, উপরোক্ত কারণে, আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের সুরে সুর মিলিয়ে, আসুন আমরা আমাদের নায়ক নায়িকার শিক্ষা ও কৃষ্টির অভাবের জন্য তাদের মার্জনা করি।

অবশেষে ওরা নদীর তীরে উইলো ঝোপের ভিতরে ঢুকে ঢেউ-ধোয়া বালুর উপরে এসে বসলো; তারপর অনতিবিলম্বেই পরস্পর পরস্পরের দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো...

আট

এমনি করে কেটে গেলো কিছুদিন যে কোনও লোকই জানালার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতো পলের মনে হতো, সে চলেছে নাতালিয়ার ঘরের দিকে। প্রতিবারেই সে লাফিয়ে উঠে উঠান পর্যন্ত ছুটে যেতো। মিরণ লক্ষ্য করতো সবই আর গোঁফের আড়ালে একটু মুচকি মুচকি হাসতো। পল মিরণকে বলেছে সব কথা। যেদিন পল মিরণের কাছে এসে তাকে সসম্ভ্রমকে অনুরোধ

জানালো যে, সে যেন ওদের বিয়ের দিনটিতে গির্জায় উপস্থিত থেকে নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করে, শুনে মিরণ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলো; তারপর তার সেই বিহ্বল ভাব কেটে যাওয়ার পর পলের উদ্দেশ্যে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাই দিয়ে ফেললো:

মূর্খ! শোনো আমার কথা! দু' দু'বার আমি বিয়ে করে ছিলাম; আমার প্রথমা স্ত্রীর কাছে আমি আর দোকানের অন্য সব লোকজনদের ভিতরে কোনই প্রভেদ ছিলো না। আর আমার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী তো, আমাকে এমন ভালো বাসতো যে কি করে যে আমি এতো দিন বেঁচে আছি তা এখনও ঠিক করে বলতে পারি না। যখন খুসী হাতের কাছে যা কিছু পেতো তাই দিয়েই সে আমাকে আপ্যায়িত করতে শুরু করতো। লোককে মারধোর করার দিকে তার এমন একটা দারুণ আকর্ষণ ছিলো যে মনে হতো ওর মা-বাপ বোধহয় ছিলো পুলিস।

তারপর মিরণ সাংসারিক জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র পলের সামনে তুলে ধরলো;—হাঁড়ি কলসী, হাতা খুন্তি, কাঁথা কম্বল, ঝারাপোঁছা ধোয়া ইত্যাদি যতো কিছু সুখ সুবিধার ব্যাপার আছে সব। তারপর সে বর্ণনা করে চললো—এমন কি শপথ করেই বললো—কেমন করে কপির ডলনায় পাওয়া যেতো সাবান, কেমন করে তাকে পা উপরে তুলে হাতে হাঁটতে হতো, কেমন করে ভিজা কাঁথা কম্বল সজোরে নিক্ষিপ্ত হতো তার গায়ের উপরে, তাছাড়া কেমন করে তার গিন্নী যাবতীয় হাঁড়ি, কলসী, ঘটি, বাটি ইত্যাদি কোনটা কতোখানি শক্ত, কতোখানি মজবুত, তা যাচাই করে দেখতে তার মাথায় ঢুকে। পরিশেষে মিরণের স্ত্রীজাতি সম্পর্কিত আলোচনা এক নৈরাশ্যজনক সিদ্ধান্তে এসে পোঁছালো:

তুমি একটি অদ্ভুত ছেলে! আজকাল ঘাটেপথে কতো মেয়ের ছড়াছড়ি। ওকে তোমার কোন্ কাজে লাগবে শুনি? ওর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তুমি মাটি করে ফেলবে, একথা আমি দিব্যি করে বলতে পারি। ধরে নিলাম সে তোমার অনেক উপকার করেছে; ভালো কথা, তুমিও ব্যাটাছেলে—পুরুষের বাচ্চা, ওর সঙ্গে হাসো, খেলো, গল্প করো, স্ফূর্তি করো, ব্যাস্, ফুরিয়ে গেলো! কিন্তু তাও বলি সে যা করেছে তোমার জন্য তার বদলে বহু গুণ

বেশী তুমি পরিশোধ করেছ। কে তার সঙ্গে তোমার মতন অমন ভালো ব্যবহার করবে শুনি? আশাতীত পেয়েছে সে তোমার কাছ থেকে। বিয়ে করতে চাও করো; দেখে শুনে দিব্যি একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী মেয়ে ঠিক করে দিচ্ছি। সেটা তবু একটা কাজের মতন কাজ হবে, কিছু মোটা টাকা যৌতুকও পাবে আর তখন নিজের দোকানও খুলতে পারবে। কিন্তু তা বলে ঐ মেয়ের সঙ্গে নয়। দেখে নিও একটি মাস যেতে না যেতেই তোমার অরুচি ধরে যাবে। তখন কেমন করে সংসার করবে? তাছাড়া তোমার তো কিছুই নেই— না একটা চায়ের বাটি না একটা চামচ; আর সেও তো কোন কাজই জানে না। হটাও ওকে! ওমেয়ে মোটেই ভালো নয়।

মিরণের কথায় পলের মনে আদৌ কোন রেখা পাত করলো না; যেন সে এতক্ষণ দেয়ালটার সঙ্গে মিছে বকে মরেছে। নাতালিয়ার উপরে পলের আকর্ষণ এতো তীব্র এতো প্রবল যে, মুহূর্তের জন্যেও সে তাকে বাদ দিয়ে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না। নাতালিয়াকে যদি সে সব সময়ে এই ঘরে তার চোখের সামনে পেতো তবে হয়তো ঠিক আগেকার মতনই অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে পারতো।

একদিন কাজের শেষে নাতালিয়ার ঘরে গিয়ে দেখলো নাতালিয়া ঘরে নেই। পলের মুখখানা মুহূর্তে শুকিয়ে উঠলো, ওর সবটুকু অন্তর মথিত করে জেগে উঠলো এক সুতীব্র হিম শীতল কম্পন; তারপর নাতালিয়ার ফিরে আসা পর্যন্ত তেমনি ঠায় ওর বন্ধ দোর গোড়ায় বসে রইলো। রাত দুপুর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর নাতালিয়া ফিরে এলো কিন্তু তবুও আজ তার অবস্থা স্বাভাবিক। নাতালিয়া এই বলে পলকে বুঝ দিয়ে ঠণ্ডা করলো যে সে গিয়েছিলো তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। সেই বান্ধবীই বলেছিলো ওকে একটা ঝিয়ের কাজ যোগাড় করে দেবে। একান্ত সরল মনে পল বিশ্বাস করলো তার কথা আর মনে মনে দারুণ খুসী হয়ে উঠলো; সম্পূর্ণ ভুলে গেলো তার অন্তরে জেগে ওঠা সন্দেহ ভরা আশঙ্কার কথা।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পল আবার ভাবতে শুরু করলো:

নাতালিয়া টাকা কড়ি পায় কোথা?—এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় ওর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো। ঐ দিন রাত্রেই পল তাকে জিজ্ঞাসা করলো

সে কথা কিন্তু প্রত্যুত্তরে নাতালিয়া তার জবাব এড়িয়ে গিয়ে একটি পাল্‌টা প্রশ্ন তুললো:

আমার একার জন্য দরকারইবা কতোটুকু?

ওর জবাবে পল সন্তুষ্ট হতে পারলো না?

দু'এক পয়সা করে জমিয়ে জমিয়ে আমি কিছু টাকা করেছিলাম—এখনও চলছে তাই দিয়েই।

পলের মনে হলো কে যেন ভিতর থেকে ওকে বলে দিলো—পল পুনরায় বলে উঠলো: কৈ দেখি, দেখাও তো আমাকে কতো টাকা!

মুহূর্তের জন্য নাতালিয়া একটু ইতস্ততঃ করে পরক্ষণেই বলে উঠলো:

বেশ দেখতে চাওতো দেখাতে পারি।

কিন্তু পাতি পাতি করে খুঁজেও নাতালিয়া কিছুতেই তার বাক্‌সের চাবীটা খুঁজে পেলো না।

প্রশ্নটা প্রশ্ন হয়েই রয়ে গেলো।

পরম উৎসাহে পল যখনই তাদের দু'জনার ভবিষ্যত মিলিত জীবনের সুমধুর চিত্র এঁকে নাতালিয়ার সামনে তুলে ধরতো—নাতালিয়া স্বপ্নাতুর অর্ধতন্দ্রায় চোখ দুটি বুজে চুপ করে থাকতো। নিজের সেই রঙীন কল্পনায় বিভোর হয়ে পল যখন ওকে আলিঙ্গন করতো নাতালিয়ার কাছ থেকে তেমন বিশেষ কোন সাড়া আসতো না। একদিন সেটা এমন সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো যে সেদিন আর পল জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলো না:

বোধহয় তোমার ভালো লাগেনা এসব না?

জবাব দিতে গিয়ে নাতালিয়ার বহুক্ষণ সময় কেটে গেলো; অবশেষে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো, কিন্তু যা বললো তা যেন ওর নিজের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না:

ন্‌-ন্‌-ন্‌আ। কেন তুমি ওকথা ভাবছো? আমার তো খুবই ভালো লাগে।

পলকে বুঝ দেয়ার পক্ষে, তাকে শান্ত করার পক্ষে ঐ টুকুই যথেষ্ট।

পল তার মাইনের টাকা এনে নাতালিয়ার হাতে দিতে আরম্ভ করলো—যেন সে ওর স্ত্রী, ওর গৃহিণী। একদিন তার জন্য কিনে নিয়ে এলো

পোষাকের কাপড়; উপহার পেয়ে নাতালিয়া খুবই খুসীর ভাব দেখালো— কিন্তু সেটা যেন নেহাৎই মামুলী, গতানুগতিক।

এই প্রথম পলের মনে জেগে উঠলো একটা তীব্র ঈর্ষার ভাব; কারণ, অন্তরে অন্তরে অনুভব করলো সে যে, ওর সম্পর্কে নাতালিয়া কেমন যেন অমনোযোগী, কেমন যেন রয়েছে তার একটা নিরুৎসাহের ভাব। এই অনুভূতি সম্পর্কে যদিও পলের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তবুও এটা বুঝতে পারলো যে তার বহিঃপ্রকাশ আদৌ ঠিক হবে না।

একদিন যখন ওরা দু'জনে বসে বসে চা খাচ্ছিলো তখন হঠাৎ সিঁড়িতে বেপরোয়া শিসের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো পায়ের শব্দ; একটু পরেই মেয়েলী নাকী সুরের গান শোনা গেলো :

যাচ্ছি আমি যেথায় আছে আমার নাতাশা
এইযে হেথায় প্রিয়ার গৃহ প্রাণপাখির বাসা......

পলের মনে হলো যেন দারুণ একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছে। রাগে পলের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

কিগো, এই কি আমার নাতাশার বাসা নাকি গো! ওঃ! তোমার ঘরে যে লোক রয়েছে দেখছি!

দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে নিরাশ কণ্ঠে লোকটা বললো।

বাবুটির শীর্ণ চেহারা, দীন বেশ, থুতনীর উপরে ছাগলের মতন এক গোছা দাড়ি আর পাকানো গোঁফ। পলের দিকে তাকাতে তাকাতে একান্ত পরিচিতের মতন লোকটা ভিতরে ঢুকে এলো; তারপর টুপিটা আলনার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে নাতালিয়ার কাছে এগিয়ে এলো। একটু হেসে নাতালিয়া ওকে অভ্যর্থনা জানালো—কিন্তু সে হাসির ভিতরে ফুটে উঠলো কেমন যেন একটা অপরাধী অপ্রস্তুত ভাব।

কি খবর গো পরী রাণী নাতাশা?

কি চাই তোমার এখানে? —গর্জে উঠলো পল।

লোকটা পলের মুখের দিকে তাকালো তারপর ওকে বিশেষ কোন আমলের মধ্যে না এনে নাতালিয়ার হাতখানি মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে একটু মৃদু চাপ দিলো।

মিস ক্রিস্তাভ! আমাকেও এক বাটি চা দাও তারপরে ঐ চোখের কোলে কালিপড়া কুৎসিত মুখ ভদ্রলোকটির পরিচয়টাও শুনিয়ে দাও দেখি?

মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো—কুৎসিত দর্শন ভদ্রলোকটি লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

তার মানে? নাতাশা! এসবের মানে কি? —অপমানিত কাপ্তেন বাবুটি নাতালিয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলো।

মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো—রাগে কাঁপতে কাঁপতে পল তার পূর্বোক্ত কথারই পুনরাবৃত্তি করলো।

তা বেশ ভালো কথা; চল্লুম আমি তা'হলে—আগন্তুক এক কথায়ই রাজী হয়ে গেলো তারপর চীৎকার করে গাল পাড়তে পাড়তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে চললো:

তোমাদের আইন মাফিক বিয়ে সুখের হোক নাতাশা; কিন্তু যাই একবার খবরটা দিয়ে দেই গে—

কাকে যে খবর দিতে চাইলো সেটা আর শোনা গেলো না। বহুক্ষণ পর্যন্ত দু'জনে চুপ করে বসে রইলো; তারপর গম্ভীর আহত কণ্ঠে পল প্রশ্ন করলো :

এই লোক গুলোর আসা যাওয়া আর কতো দিনে বন্ধ হবে?

যতো দিনে তুমি সবাইকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিতে পারবে।

এমন আরও অনেকগুলো আছে নাকি?

জানি না, যাও! আমি তো আর তাদের সংখ্যা গুণে রাখিনি যে হিসাব দেবো?—নাতালিয়া হেসে উঠলো।

না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না! বুঝেছ? কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না! এখন তুমি আমার।

ও-হো! তাই নাকি? তা কোত্থেকে কিনে আনলে তুমি আমাকে? আর এমন একটা সওদার জন্য কতো দাম দিতে হয়েছে তোমাকে?

মুহূর্তে আগুণ হয়ে উঠলো পল।

হাসছো তুমি!......মোটেই এটা হাসির কথা নয়। আমি মিথ্যা কথা বলছি না তোমার কাছে, জানো? তুমি আমার—দিনরাত সকল সময়—সর্ব-

ক্ষণের জন্য তুমি আমার। সব সময়ের জন্য ভাবি আমি তোমার কথা—তোমার মুখ, তোমার ছবি। সব সময়...

ঘাট হয়েছে থামো, আর বলবো না।—নাতালিয়ার স্বর শুকনো—নির্জীব।

কিছুদিন ধরেই নাতালিয়ার অতিথিদের প্রতি পলের মনোভাব ওকে বিচলিত করে তুলেছে। পূর্বপরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়াটা নাতালিয়া মনে করে অনাবশ্যক। ওদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ভালো লোক—আমুদে স্ফূর্তিবাজ। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে নাতালিয়া যে পল শুধু যে কেবল অমার্জিত তাই নয় দারুণ অসামাজিক। সর্বক্ষণের জন্য কেবল সে যদি ওর গলা আঁকড়ে থাকে তবে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। নাতালিয়ার রুচি সম্পূর্ণ আলাদা ; আর পলের রুচি অদ্ভুত—এমন কি সেটা উপহাসের যোগ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তা'সত্ত্বেও পলের স্বভাব ভালো, সৎ, নির্মল। পল ওকে ভালোবাসে—এটা নাতালিয়ার একটা অহঙ্কারের, একটা গৌরবের বস্তু। পল নাতালিয়াকে তার সমপর্যায়ভুক্ত হিসাবে দেখে, তাতে নাতালিয়ার মনপ্রাণ এক অনাবিল আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অসংকোচে পল যে কোনও বিষয় নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করে আর নাতালিয়াও কিছুমাত্র দ্বিধা, কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না পলের কাছে। এ জিনিষের মূল্য অনেকখানি।

কিছুদিন থেকেই নাতালিয়া ভাবতে শুরু করেছে, কি করে পলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেও তার বর্তমানের জীবনযাত্রার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। যদিও এই জীবন এক এক সময়ে খুবই বিশ্রী মনে হয় তবুও এর একটা স্বকীয় আনন্দ আছে—আছে উন্মাদনা। এই ধরণের জীবনের ভিতরেও যতটুকু আনন্দ, যতটুকু সুখ আছে সেটা সম্পূর্ণ নিজের ভাগে রেখে তার কুৎসিত মন্দদিকটা চায় সে পলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। মনে মনে নাতালিয়া এমন একটা আশা পোষণ করে যে, আজ হোক কাল হোক একদিন সে পলকে এমনভাবে পোষ মানিয়ে নিতে পারবে যে, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হবে পল ঐ রকমের একটা আপোষ রফার ভিতরে চলে আসতে।

ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে পলের সুমধুর কল্পনাভরা রঙীণ উচ্ছ্বাস শুনতে নাতালিয়া ভালো লাগে; এমন কি শুনতে শুনতে চোখ বুজে

সে বিবাহিত জীবনের অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে চলতো মনে মনে ; ওর মুখের উপরে ফুটে উঠতো এক অপূর্ব রহস্যময় জ্যোতির আভাস। মাঝে মাঝে পলের বর্ণনায় সে দারুণ লুব্ধ হয়ে উঠতো, অভিভূত হয়ে পড়তো, কিন্তু অন্য দিকেও সে খুবই সচেতন, জানে যে বাস্তবের রূঢ় সংঘাত এলে পরেই পলের এই কল্প বিলাস একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। নাতালিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস যে পলের এই উদ্দাম উন্মত্ত প্রেম অচিরেই আসবে স্তিমিত হয়ে। পলের ভালোবাসাকে বিচার করতো সে তার নিজস্ব ধারায়—যার ভিতরে এতোটুকুও মোহ, এতটুকুও ভাববিলাসিতার স্থান কোথাও নেই। খুব ভালো করেই জানে নাতালিয়া, যে দিন, যে মুহূর্তে পলের এই প্রেম, এই ভালোবাসা নেশার মতন ছুটে যাবে, সেই দিন থেকেই পল শুরু করবে গাল মন্দ—হয়তো ধরে মারতেও শুরু করবে। তাছাড়া কেবলমাত্র পলের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে হবে—এ চিন্তা কিছুতেই নাতালিয়া বরদাস্ত করে উঠতে পারে না। সেই একই লোকের সঙ্গে প্রতিদিন একই ঘরে—দিনে রাত্রে সব সময়েই সেই একই লোক, কেবলমাত্র সে-ই একক--এ অসহ্য।

আবার এক এক সময়ে মনে হতো যে, আজীবন অতি সুখে শান্তিতে সে পলের সঙ্গে ঘর সংসার করতে পারবে। কিন্তু স্থির করতো যে, আদৌ সে কাজ ঠিক হবে না। মোটেই নাতালিয়া পলের যোগ্য বধূ নয়। পল এতো ভালো, এতো মহৎ যে, তার মতো মেয়ের পক্ষে ওকে বিয়ে করার কথা ভাবতেও মায়া লাগে। না, যতো খুসী পল অনুরোধ করুক না কেন, যতোই পেড়াপীড়ি করুক, কিছুতেই তাকে বিয়ে করে নাতালিয়া তার জীবনটাকে ভরাক্রান্ত করে তুলবে না। পল সুখী হোক, তাতেই নাতালিয়ার সুখ, শান্তি, তৃপ্তি; কিন্তু তার নিজের জীবন যে পথে চলেছে সেই পথেই চলুক বয়ে...

এই ধরণের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন একটা অজ্ঞাত মধুর আবেশে ওর দেহ মন পূর্ণ হয়ে উঠতো; বুকটা হালকা হয়ে যেতো—নিজের বুদ্ধির উপরে জেগে উঠতো অদ্ভুত শ্রদ্ধা।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে নাতালিয়া নারীসুলভ ছলা-কলায় উদ্বুদ্ধ

হয়ে উঠতো আর মনের ভিতরে সৃষ্টি করে তুলতো এক কৃত্রিম ভাবাবেগ, তারপর চিন্তান্বিত বিমর্ষ মুখে সে পলের সামনে চুপ করে বসে থাকতো। ওর সেই চিন্তাক্লিষ্ট বিষন্ন মুখের পানে তাকিয়ে পলের অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠতো; একান্ত দরদভরা কোমল স্পর্শ বুলিয়ে মুছে নিতে চাইতো ওর হৃদয়ের সব দুঃখ, সব ব্যথা। এমনি করে নাতালিয়া মনে মনে বেশ খানিকটা আনন্দ উপভোগ করতো। ইতিমধ্যে পলের সম্পর্কে নাতালিয়ার মনে জমে উঠেছিল যে বিরক্তির কালো মেঘ, ওর সান্নিধ্যের নিবিড়তায় তা' অনেকখানিই তখনকার মতন যেতো উড়ে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই এই ধরণের অভিনয় করা নাতালিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতো না; তখন হয় তাকে পলের কাছ থেকে আত্ম গোপন করতে হতো, নয়তো সরাসরি বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলতো।

অন্য দিকে যতোই দিন যেতে লাগলো নাতালিয়ার প্রতি পলের আকর্ষণ ততোই তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো। ক্রমে পল অধৈর্য হয়ে উঠলো ওর সঙ্গে চুরান্তভাবে আলোচনা করে একটা শেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে। অবশেষে একদিন পলের সে ইচ্ছা ফলবতী হলো:

একদিন সন্ধ্যায় দু'জন শহরের ভিতরে বেড়াতে বেড়াতে একটা বাগানে এসে ঢুকলো তারপর শ্রান্ত হয়ে ঘন ঝোপের আঁড়ালে একটা বেঞ্চের উপরে গিয়ে বসলো।

আচ্ছা নাতাশা, বলোতো এখন তার কি ব্যবস্থা করছ?...

আড়চোখে নাতালিয়ার মুখের পানে তাকিয়ে পল প্রশ্ন করলো। কিসের কি ব্যবস্থা?—পাতা শুদ্ধ একটা ডাল ভেঙে নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে নাতালিয়া পাল্টা প্রশ্ন করলো। অবশ্য খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে, যে ওর এ প্রশ্নের অর্থ কি—কোন দিকে এর গতি।

আমাদের বিয়েটা তাহলে হচ্ছে কবে?

ঘন ঝোপের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়লো; একফালি ছায়া এসে পড়েছে দু'জনার গায়ে—পড়েছে নীচে পায়ের তলায়; পথের উপরে আলো ছায়ার ঝিকিমিকি; এক পশ্‌লা আলো এসে পড়েছে সামনের খালি বেঞ্চটার উপরে। বাগানটা জনমানবহীন, শান্ত। ওদের

মাথার উপরে জ্যোৎস্নাধৌত স্বচ্ছ আকাশ; আকাশের বুকে সাদা পালকের মতন ছেঁড়া মেঘগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে; সেই হালকা মেঘের ভিতর থেকে ঝিক্‌মিক্‌ করে তারাগুলি আত্মপ্রকাশ করছে।

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ার পর নাতালিয়া একটা চিন্তাক্লিষ্ট ভাব নিয়ে গম্ভীর মুখে চুপ করে বসে ছিলো। এই মুহূর্তে, বিবাহ সম্পর্কে তার অনিচ্ছা সত্যই খাঁটি; ঠিকই বুঝতে পেরেছে নাতালিয়া যে, বিয়ে করতে তার এতটুকুও ইচ্ছা নেই আর তার এ'অনিচ্ছা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত।

বিয়ে? আমিতো বলেছি তোমাকে সেকথা ভুলে যাও। কি ধরণের স্ত্রী হতে পারি আমি? আমি হচ্ছি একটা বেশ্যা: আর তুমি—তুমি হচ্ছো কিনা একজন চরিত্রবান, সৎ, কর্মঠ পুরুষ। তাই বিয়ে আমাদের অসম্ভব। আগেই তো বলেছি তোমাকে, যে আমি উচ্ছন্নে গেছি—আমি নষ্টচরিত্র: আমার পক্ষে এখন আর অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব।

আত্ম নিন্দার ভিতরে নাতালিয়া এক অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে। নিজেকে সে মনে মনে একটা পড়া বইয়ের নায়িকার মতন ভাবতে শুরু করলো। আর তোমার—করুণ সুরে নাতালিয়া বলতে শুরু করলো;—তোমার প্রয়োজন একটি সতীসাধ্বী স্ত্রীর। জন্মকাল থেকেই আমি পাপে ডুবে আছি—যাপন করে আসছি কলুষিত জীবন। আমি চাই তোমার জীবন সুখময় হয়ে উঠুক। স্ত্রী, সন্তান, দোকান—প্রবল চেষ্টায় কান্না চাপতে গিয়ে ভাঙা ভাঙা চাপা গলায় নাতালিয়া বলতে লাগলো:

—তারপর চুপি চুপি আমি কখনও কখনও যাবো তোমর বাড়ী, দেখে আসবো আমার প্রাণাধিক পল কেমন করে...

নাতালিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। এতক্ষণ সে যা বলেছে বাস্তবিক-পক্ষে সেটা ওর কাছে মর্মান্তিক, অসহনীয়। মনে পড়ে গেলো ওর সেই সস্তা দামের চটি বইটার ভিতরের একটি দৃশ্য: কেমন করে একটি তরুণী গভীর ভাবে ভালো বেসেছিলো আর তার সেই প্রেমাস্পদের সুখের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু—এমন কি তার প্রেমকে পর্যন্ত দিয়েছিলো বলি। সবার কাছ থেকে ঘৃণা, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করেও একদিন মেরী দেসারি শীর্ণ দেহে, দীন বেশে, এসে দাঁড়ালো চার্লস লাক'তের জানালায়। জানালার

কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলো, চার্লস্ তার স্ত্রী ফ্লারেন্সের পায়ের তলায় বসে কি একখানি বই পড়ে চলেছে। ফ্লোরেন্সের দৃষ্টি ধূমায়িত অগ্নি-কুণ্ডের দিকে নিবন্ধ; এক হাতে সে কোলর উপরের শিশুটিকে ধরে রয়েছে, অন্য হাতে চার্লসের মাথার চুলগুলি নিয়ে আনমনে খেলা করছে। বহু দূরের পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে মেরী এসে পোঁছেছিলো তার প্রিয়তমের গৃহে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো প্রেম ও একনিষ্ঠতার অর্ঘ; কিন্তু হায়! তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে! মেরী সেই জানালার নীচেই মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেলো...

গল্পটার শেষ কেমন করে হয়েছিলো তা নাতালিয়া জানতে পারেনি, কারণ বইটার শেষের পাতাটা ছিলো ছেঁড়া। এই করুণ কাহিনীটি মনে পড়ে ওর কান্নার বেগ আরও উথ্‌লে উঠলো।

গভীর প্রেমের আবেগে, সহানুভূতিতে, অসহনীয় ব্যথায় পলের সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠলো। বাহুবন্ধনে নাতালিয়াকে আলিঙ্গনা বদ্ধ করে কান্না ভরা থম থমে কণ্ঠে পল বলতে লাগলো:

নাতাশা! প্রিয়তমে! শান্ত হও! চুপ করো ! চুপ করো! আমি তোমায় ভালোবাসি—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি আমি তোমাকে। কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না! পরিত্যাগ করবো না তোমাকে এ জীবনে!

ক্রমে নাতালিয়া কিছুটা শান্ত হয়ে উঠলো। নাতালিয়ার প্রতি তার নিজের অন্তরের সুগভীর প্রেম আর নাতালিয়ার হৃদয়ের মহত্বে অভিভূত হয়ে পল পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে বলতে শুরু করলো :

শোনো আমার কথা! তুমি আমার, একমাত্র আমার আর কারুর নও; কারণ দিনে, রাত্রে, শয়নে, স্বপনে আমি তোমারই কথা ভাবি. তোমারই কথা চিন্তা করি, তোমারই মূর্তি ধ্যান করি। তুমি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর আমার কেউই নেই। চাইনা আমি আর কাউকে, কাউকেই চাইনা। আমায় যা খুসী বলতে পারো তুমি, কিন্তু তবুও তুমি আমার। লক্ষ্মীটি বুঝে দেখো, কাউকেই আমি তোমাকে দিতে পারবো না। জেনো, তুমি ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন, মূল্যহীন, ফাঁকা! তোমায় না পেলে কেমন করে বাঁচবো আমি বলতো? তুমি আমার। তোমার জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতেও

প্রস্তুত। বুঝেছ তুমি আমার অন্তরের কথা? তাই মিনতি করছি অমন কথা আর বলো না!

কিন্তু তবুও নাতালিয়া ঐ প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হলো না। নিজেকে সে পলের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়ে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাইলো। আত্মনিন্দার ভিতর দিয়ে একটা সুমধুর করুণ রসের অনুভূতি জেগে উঠলো ওর অন্তরে; নাতালিয়ার স্বীকারউক্তি ক্রমেই অকপট, নগ্ন হয়ে উঠতে লাগলো; কণ্ঠে ফুটে উঠলো একটা তিক্ত পরিহাসের সুর। বলতে বলতে সে এসে পৌঁছালো চরমে:

তুমি কি ভাবো এই এতো দিনের ভিতরে আমি কিছুই করিনি—সতী সাবিত্রী হয়ে বসেছিলাম? হায় হতভাগ্য!...প্রতিদিন রাত্রে...

নাতালিয়া তার বক্তব্য শেষ করতে পারলো না; ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতন মুহূর্তে পল সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর দুহাতে নাতালিয়ার কাঁধ দুটো চেপে ধরে ঝাঁকুনী দিতে দিতে অনুচ্চ কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলো:

চুপ! চুপ! একেবারে চুপ! নইলে এক্ষুনি খুন করে ফেলবো!

দারুণ রাগে পলের দাঁতে দাঁত কড়মড় করে উঠলো।

কাঁধের ওপর পলের দুটো হাতের ভারে নাতালিয়া নুয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলো, বলাটা বড্ডো বেশী হয়ে গেছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে নাতালিয়া। ওকে থরথর করে কেঁপে উঠতে দেখে পলের মনে করুণার সঞ্চার হলো, কিন্তু তার অন্তরের জ্বলে ওঠা বিদ্বেষের তীব্রতা কিছুমাত্র হ্রাস হলো না। পুনরায় পল নাতালিয়ার পাশে এসে বসে পড়লো। দু'জনার মাঝখানে এক দীর্ঘ, ভয়ংকর, থম্‌থমে নীরবতা এসে জুড়ে বসলো। নাতালিয়ার মন থেকে তখনও সেই ভয়ের অনুভূতি দূর হয়ে যায়নি; অস্ফুট কোমল সুরে সেই প্রথমে ঐ অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলো: বাড়ী চলো।

নীরব গম্ভীর মুখে পল ওর পাশে পাশে হেঁটে চললো; কারুর মুখে একটিও কথা নেই; অনেকক্ষণ এমনি করে কেটে যাওয়ার পর ভর্ৎসনাভরা কণ্ঠে পল বললো:

তুমি আমাকে মোটেই ভালোবাসো না—তাহলে কিছুতেই তুমি অমন কথা আমার কাছে উচ্চারণ করতে পারতে না। এতোটুকু দয়া, এতোটুকু মায়া

এতোটুকু করুণার লেশমাত্র চিহ্নও নেই তোমার কথার ভিতরে। ওকথা আদৌ বলা উচিত ছিলো না তোমার।

নাতালিয়ার বুক চিরে একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। প্রকৃত অনুশোচনার তীব্র দহনে ওর মুখখানা করুণ হয়ে উঠলো।

পল বলতে লাগলো :

যাক্ যা হবার তা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কখনও আর যেন ওসব কথা আমার সামনে বলো না। এ আলোচনা যথেষ্ট হয়ে গেছে। শোনো, আমার কিছু জমানো টাকা আছে—চল্লিশ টাকা; তাছাড়া মনিবের কাছেও পাওনা আছে আরও ঊনিশ। এতে আমাদের বিয়ের খরচ কুলিয়ে গিয়ে আরও অল্প কিছুদিন চলবে। আচ্ছা, গির্জায় যাওয়ার মতো কোন পোষাক আছে তোমার, যা কোনদিন ব্যবহার করোনি?

না।—কোমল সুরে নাতালিয়া জবাব দিলো।

বেশ, তাহলে একটা তৈরী করে নিতে হবে, কাল আমি তোমাকে কিছু কাপড় কিনে দিয়ে যাবো।

নাতালিয়া আর একটা কথাও বললো না। যখন ওরা বাড়ীতে এসে পৌঁছালো সিঁড়ির গোড়া থেকেই পল এই বলে বিদায় নিলো : আজ আর আমি উপরে যাবো না!

বেশ।—বলেই নাতালিয়া দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পল শুনলো তালা খোলার শব্দ, তারপর নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। নাতালিয়ার অকপট স্বীকারোক্তি পলকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। রাস্তাটা যেন এক অদ্ভুত তুহীন-শীতল ভিজা নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে ওর গায়ে আর জাগিয়ে তুলছে ওর অন্তরে সেই বহুদিন আগের ভুলে যাওয়া নিঃসংগ একাকীত্বের অসহনীয় তীব্র বেদনা। পূর্বের চিন্তা, পূর্বের অনুভূতি, বর্তমানে কেমন যেন দুঃসহ দুর্বোধ্য মনে হতো; কিন্তু সেই চিন্তা সেই অনুভূতি যেন আজ আবার এক নতুন মূর্তি, নূতন রূপ নিয়ে এসে দেখা দিলো।

ঘরে ঢুকেই নাতালিয়া দোর বন্ধ করে দিলো, তারপর বেশবাস পরিবর্তন না করেই খোলা জানালার সামনে গিয়ে বসে এতক্ষণ পরে একটা আরামের

নিঃশ্বাস ছাড়লো। পরে দু'হাতের ভিতরে মুখ রেখে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের পানে তাকিয়ে চুপ করে সে বসে রইলো।

আকাশে ঘিরে জমে উঠেছে সজল কালো মেঘ; গাঢ় অন্ধকারের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে সমস্ত দিগন্তকে যেন এক কোমল মসৃণ মখমলের আবরণে ঢেকে দিয়েছে। সঞ্চরমান মেঘখণ্ডগুলির গতি শ্লথ, মন্দ —যেন দীর্ঘকাল একটানা পরিশ্রম করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঘন আবরণে আকাশ আচ্ছন্ন করে ওরা একটি একটি করে তারাগুলিকে নিভিয়ে দিয়ে চলেছে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার নীলিমার ঐ সুন্দর আভরণ আর ধরিত্রীর বুকের নরম কোমল ঔজ্জ্বল্য মুছিয়ে দেয়ার বেদনায় নীল হয়ে উঠে বড়ো বড়ো ফোঁটায় চোখের জল ফেলে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে; ঝরা ফোঁটাগুলো সশব্দে টিনের চালার উপর আছড়ে পড়ে যেন আনমনা ধরণীকে দারুণ দুর্যোগের আগমন সম্ভাবনায় হুঁসিয়ার করে দিচ্ছে।

পলের মতন নাতালিয়াও আঘাত পেয়েছে প্রচুর। নাতালিয়ার মনে হলো যেন সে এক ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়ে গেছে। ওঃ! তবে তোমার স্বরূপও এই! ঠিক আর দশজনারই মতন! আজ খুব ভালোবাসা দেখাচ্ছো আর কালই মারের চোটে আমার দাঁতগুলো সব গুঁড়ো করে দেবে! আরে আমার মাণিক রে! ইয়ার্কী মারতে এসেছ তুমি আমার সঙ্গে—তামাশা পেয়েছ না?

নাতালিয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠলো পলের সেই বিকৃত ভয়ংকর মুখ; সেই দাঁতে ঘসে কড়মড় করে ওঠা; সেই অনুচ্চ তীব্র কণ্ঠের বজ্র গর্জন: 'চুপ! একদম খুন করে ফেলবো!' আর কেন?—না, সে অকপটে পলের কাছে সব কিছু স্বীকার করেছে বলে? সত্য কথা বলেছে বলে? ওঃ! কী আমার মহাপুরুষ রে! আর এই মুখেই সে বলে কিনা আমার বন্ধু! এমন কি ভালোবাসে বলেও দাবী করে!

জীবনে এই প্রথম লোক, যে নাকি ওকে খুন করে ফেলবে বলে ভয় দেখালো। অন্যে যখন ওকে মারে, তারা মারে বিনা কারণে, কোনরূপ না শাসিয়েই, তাছাড়া মাতাল অবস্থায়। সেই তাদের কথাই ধরা যাক—তাদের সঙ্গেও ওর তুলনা হয় না।... তারপর নাতালিয়া ভাবতে লাগলো: দিনের পর দিন প্রতি মুহূর্তে পলের সঙ্গে কেমন করে কাটবে ওর জীবন। নাতালিয়াকে

উঠতে হবে খুব ভোরে; হয়তো তখনও ওর দু'চোখ ভরে জড়িয়ে থাকবে ঘুম, কিন্তু তবুও উঠে উনুন ধরিয়ে কেট্‌লীতে করে চাপিয়ে দিতে হবে জল। পল যাবে কাজে আর ওকে করতে হবে রান্না। তারপর ঘর ঝাঁট দিতে হবে, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে, টেবিল সাজাতে হবে। খাওয়া—থালা বাটি মাজাঘসা ধোয়া, আবার চা করা... তারপর সন্ধ্যায়—হয়তোবা কোনোদিন ওরা দু'জনে যাবে বেড়াতে—তাও যদি ফুরসুত থাকে। কিন্তু পলের সংগে বেড়াতে যাওয়ার চাইতে বিরক্তিকর আর কিছুই নেই। পল এতো অভদ্র, এতো অমার্জিত, জংলী যে কেউই কখনও আসবে না ওদের বাড়ী বেড়াতে। তারপর একটু বেড়িয়ে ফিরে এসেই খেয়ে দেয়ে বিছানা নেয়া...এই হ'লো গিয়ে একটি দিনের যাবতীয় কাজ। দিনের পর দিন চলবে এরই পৌনঃপুণিকতা।

তারপর যদি পলের কাজ না থাকে? যদি সে অতীতের কথা নিয়ে দিনের পর দিন নাতালিয়ার জীবন করে তোলা বিষময়, তখন? তাছাড়া, কাউকে কাছে দেখলেই ওর মনে জেগে উঠবে সন্দেহ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, তা সে বারো বছরের নাবালক শিশুই হোক আর সত্তর বছরের বুড়োই হোক না কেন। আর পলের সংগে গল্প করবেই বা কি নিয়ে—ওতো একটা অকাট গো-মূর্খ, এমন কি নাতালিয়ার নিজের চাইতেও, লিখতে পড়তেও জানে না।

আমি পড়তে ভালোবাসি; কিন্তু বই জুটবে কোথা থেকে?...

যতোই ভাবতে লাগলো, ততোই নাতালিয়ার মনে হতে লাগলো যে, পলের সংগে দু'দিনেই ওর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে—জীবনে থাকবে না কোন রূপ, রস, গন্ধ—নিঃশেষে মুছে যাবে সব।

নাতালিয়া নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করলো: কেন আমি নিজেকে এমনি করে ওর কাছে বিকিয়ে দেবো? তারপর সংগে সংগেই হিসাব করে দেখলো যে বিনিময়ে দেবার মত কোন সম্পদই পলের হাতে নাই। নাতালিয়া ভাবতে লাগলো—স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, কি সে বস্তু যার জন্য পলের সংগে ওর জীবন এমনি করে শতপাকে জড়িয়ে পড়েছে? কিসের এতো বাধ্যবাধকতা পলের সংগে? নাতালিয়া আবিষ্কার করলো, পলই বরং তার কাছে ঋণী, সে নিজে ঋণী নয় পলের কাছে এতটুকুও। পলের প্রতি তার

এই আকর্ষণের মূলে রয়েছে ওর নিঃসঙ্গ একাকীত্বের প্রতি একটা নিছক করুণা,—তাছাড়া আর কিছুই নয়।

তা'হলে এখন কি করা যায়? নাতালিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো; মনে হলো ওর বুকখানা হাল্কা হয়ে গেছে। প্রাণ ভরে সে পলকে গাল পাড়তে লাগলো:

ওরে শয়তান! বসন্তের দাগ-মুখো শয়তান! রো'স! একটু দাঁড়াও! দেখাচ্ছি তোমাকে মজা! বুঝতে পারবে তখন আমি কেমন মেয়ে! আর কখনও আমার উপরে দাঁত কিড়মিড় করার সহাসটি হবে না। ভেবেছ, আমি তোমার কেনা বাঁদী! ঢের শিক্ষা এখনও বাকী আছে তোমার!

হঠাৎ নাতালিয়া চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে, শালটা টেনে নিয়ে মাথায় জড়ালো তারপর দরজা বন্ধ করেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলো। বাইরে রাস্তায় তখন ঝুপ ঝুপ করে পড়ছে বৃষ্টি, নাতালিয়ার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, টিনের চালা, সার্সির কাঁচ, বারান্দা—সব ঘিরে জেগে উঠেছে উন্মত্ত বর্ষার ভৈরব নর্তন—দানবীয় হুটোপুটি। ঐ ঝড়জল তুচ্ছ করে নাতালিয়া ছুটে চলেছে—পলের কাছে প্রমাণ করতে চলেছে, কি ধরণের মেয়ে সে, একটা উদ্দাম স্বাধীনতার অন্ধ চেতনায় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মতন ছুটে চলে গেলো নাতালিয়া...

(নয়)

দু'দিন আর নাতালিয়ার কোন খোঁজ নেই।

পরের দিন ভোরে পল নাতালিয়ার ঘরে এসে ঢুকেই অনুভব করলো কি যেন একটা ঘটেছে—মনে হ'লো যেন কি একটা নতুন দুর্ঘটনা! সমস্ত দিন পল নাতালিয়ার জন্য অপেক্ষা করে বসে রইলো; রাত্রে শহরময় ওকে খুঁজে খুঁজে ফিরলো; পাতিপাতি করে খুঁজলো সমস্ত হোটেল, রেস্তোরা, পানশালা, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিমেলে, গম্ভীর নীরব মুখে পল এক জায়গায় গোঁজ হয়ে বসে গোটা দিনটা কাটিয়ে দিলো। এক অসহনীয় চাপা ব্যথায়

বিকল হয়ে উঠেছে ওর দেহমন। ভয়ংকর কিছু একটার প্রতীক্ষমানতায় অন্তর পিষে যেতে লাগলো। ক্রমে নাতালিয়ার উপরে ওর ক্রোধ দুর্জয় হয়ে উঠলো। তৃতীয় দিনে পলের চেহারা হয়ে উঠলো শীর্ণ, গাল দুটো বসে গেছে— যেন দীর্ঘদিন রোগভোগের পর সবেমাত্র উঠে বসেছে।

সন্ধ্যার দিকে ওদের কারখানার সামনের রাস্তার উপর দিয় দুখানা গাড়ী ছুটতে ছুটতে এসে সদর দরজার সামনে থামলো। পল শুনতে পেলো নাতালিয়ার উচ্ছল হাসির উচ্চ শব্দ। মুহূর্তে ওর মুখখানা পাংশু হয়ে উঠলো; উঠানের দিকে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো।

সমর বিভাগের কেরাণীর পোষাক পরা একটি শ্বেতাঙ্গ পুরুষের বাহু জড়িয়ে নাতালিয়া ঝুলে রয়েছে। লোকটার গোঁফ, পরণের পোষাক, জামা, সব কিছু ঘিরে কেমন যেন একটা ঝাপসা বিবর্ণ ভাব। নাতালিয়া মাতাল— নেচে, গেয়ে, হেসে বার বার সে ঢলে ঢলে পড়ছে। ওদের পিছনে আরও এক জোড়া—রোগা কালো একটি মেয়ের সঙ্গে আধবয়সী একটি পুরুষ— লোকটাকে দেখতে ঠিক রাঁধুনীর মতন। হল ঘরের ভিতরের দেয়ালের এক ছিদ্র পথে পল তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে ওদের পানে তাকিয়ে রইলো; রাগে ওর বুকের ভিতরটা যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো। পলের মনে হলো প্রবল ক্রোধে, উত্তেজনায় এক্ষুণি সে ফেটে মরে যাবে। কিন্তু যে মুহূর্তে ওরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো, পলের সব রাগ সব উত্তেজনা যেন জল হয়ে গেলো। হতবুদ্ধি হয় মেঝের উপরে বসে পড়লো; তারপর একটা জলের পিপার গায়ে হেলান দিয়ে বসে শুনতে লাগলো নাতালিয়ার ঘর থেকে ভেসে আসা উচ্চ হাসি আর আনন্দ কোলাহলের শব্দ। নাতালিয়ার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো— দেখচে কখনো বা সে উচ্চ হাস্যে লুটিয়ে পড়ছে, কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে চটুল চঞ্চল প্রাণময়—যে রূপে, যে মূর্তিতে কখনও সে পলের সামনে ধরা দেয়নি।

কেন সে আমার কাছে অমনটি করে না?—পল ভাবলো। কিন্তু অনতি বিলম্বেই তার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি খুঁজে পেলো; পেলো আপনার মন থেকেই: আমার সঙ্গে—পলের সঙ্গে কখনও সে অমন হয়ে উঠতে পারে না,

কারণ আমি কুশ্রী, নির্জীব,—বিরক্তিকর আমার সান্নিধ্য। এই অকপট স্বীকৃতির ফলে পলের অন্তরের দুঃখ যেন আরও শতগুণ বেড়ে গেলো।

পলের মনে হলো সে যেন নাতালিয়কে হারাতে বসেছে। দোষ ওর নিজেরই। হারাবে ওকে! হারাবে চিরদিনের মতন! তারপর আবার যেমন ছিলো তেমনিই অবস্থায়ই আসবে ফিরে—সেই একাকী নিঃসঙ্গ, চিরবিষণ্ণ—দুনিয়ার অবাঞ্ছিত পথে পাওয়া সেই ঘৃণ্য হতভাগ্য জারজ সন্তান।

কোনও নারীকে ভালোবেসে তাকে না পাওয়ার পর যেমন সেই প্রেমিকের মনে জেগে ওঠে তার হারানো প্রিয়ার অপূর্ব সব গুণাবলীর কথা, পলের মনেও তেমনি ভিড় করে এলো নাতালিয়ার যাবতীয় মহৎ হৃদয় বৃত্তির কথা। তার ভিতরের যা কিছু মন্দ সে সম্পর্কে কিছুতেই পল তার মনকে ভাবতে দেবেনা। অবশেষে ওর কল্পনায় নাতালিয়া এমন পবিত্র, এমন মধুর, এমন করুণাময়ী মূর্তি নিয়ে এসে দেখা দিলো যে, পলের মনে হলো, সে ওর জীবনে একান্ত অপরিহার্য; আর তাই ওর দুঃখ, ওর ব্যথা শতগুণ তীব্র হয়ে উথলে উঠলো; হঠাৎ পল লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো; ওর মুখেচোখে ফুটে উঠলো এক অপূর্ব স্মিত হাসির আভা—যেন মনে মনে সে এক দুর্জয়, দুঃসাহসী সংকল্পে এসে পৌঁছেছে; মুহূর্তে উঠানে লাফিয়ে নেমে এসে পল ত্রস্ত চরণে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যেতে লাগলো; উঠতে উঠতে শুনতে পেলো একটা সুমিষ্ট কল হাসির সুমধুর ছন্দ।

পল দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আবেগে ঢল ঢল আরক্ত মুখ, সুঠাম সাবলীল ভংগীতে নাতালিয়া এক হাত কোমরে অন্য হাতে একটা রঙগীন রুমাল ঊর্ধ্বে তুলে ধরে নাচার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পলের চোখের সামনে কেবলমাত্র নাতালিয়ার সেই অপরূপ মধুর মূর্তি—আর সব যেন গেছে ডুবে, মিশে গেছে এক গাঢ় ধূসর কুয়াসার অন্তরালে।

নাতাশা!—এক অদ্ভুত আনন্দমাখা কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করে পল ওর নাম ধরে ডেকে উঠলো।

আঃ ! তুমি......তুমি......প্রিয়তম!......

সেই আবছা অস্পষ্ট কুহেলিকার ভিতর থেকে নাতালিয়ার শান্ত নির্জীব

কণ্ঠের প্রত্যুত্তর যেন এক নিদারুণ ভীতির শিহরণ বয়ে এনে পলের সমগ্র দেহ মন কণ্টকিত করে তুললো।

সমস্ত ঘরময় নেমে এলো এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সব কিছুই যেন সেই গাঢ় কুয়াসার ভিতরে ভেসে গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে ; কেবলমাত্র বিশাল আয়ত দুটি নীল চোখের অপূর্ব করুণা মাখা উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে নাতালিয়া নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

হ্যাঁ, আমি এসেছি......এসেছি তোমার কাছে......একটু আনন্দ পেতে...... এখানে আনন্দের বান ডেকে উঠেছে...উথলে উঠেছে আনন্দের অপার পারাবার ...শুনলাম সবাই হাসছে প্রাণ খুলে, দরাজ উচ্চ হাসি...তাই ভাবলাম আমিও যাই ওখানে... হতচকিত পল বিহ্বল সুরে বলতে আরম্ভ করলো:

নাতাশা! নাতাশা! আমি এসেছি......তাড়িয়ে দাও, দূর করে দাও এখান থেকে আর সবাইকে! ক্ষমা করো...আমায় ক্ষমা করো! কিছুতেই তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না...কিছুতেই না...কি হবে তা হলে? একা? একা থাকবো আমি? অসম্ভব! একা একা বেঁচে থাকা অসম্ভব আমার পক্ষে......আমি তোমায় ভালবাসি...... প্রাণ দিয়ে ভালবাসি আমি তোমাকে —আর সে কথা তুমি জানো। জানো তুমি খুব ভাল করেই কতোখানি ভালোবাসি আমি তোমাকে! বহুবার বলেছি আমি সে কথা—বলেছি তোমায় ভালোবাসি...তুমি আমার—একমাত্র আমার আর কারুর নও...কি হবে তোমার অন্য লোক দিয়ে? দিন-রাত, রাত-দিন আমি ভাবি তোমার কথা, ধ্যান করি তোমার মূর্তি...আমার সব চিন্তা, সব ভাবনা তোমায় ঘিরে...সুখী হবো আমি, আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে আমার মন—আমি হাসবো, গাইবো কথা কইবো, অনেক অনেক......

পল দুহাতে নাতালিয়ার দু'পা জড়িয়ে ধরে ওর হাঁটুর উপরে মাথা রাখলো। ওর করুণ গদগদ কণ্ঠের মর্মস্পর্শী বাণী সবার অন্তর বিগলিত করে মন্ত্রমুগ্ধের মতন প্রত্যেককে নির্বাক নিস্পন্দ করে তুললো।

নিদারুণ ভয়ে নাতালিয়া চুপসে, কুঁকড়ে দেওয়ালের গায়ে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—মুখখানি শুকনো, পাংশু বিকৃত। দুহাতে পলের মাথাটা ধরে সরিয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু একটুও নড়াতে পারলো না ; পল তেমনি ভাবে

ওর হাঁটুর উপরে মাথা রেখে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলো।

অসহায়ভাবে নাতালিয়া তার নীল হয়ে ওঠা দুটি ঠোঁট নাড়তে লাগলো—কি যেন বলতে চাইছে, কিন্তু ভাষা ফুটে উঠছে না।

হঠাৎ একটা ক্ষীণ রিণ্‌রিণে তীক্ষ্ন শব্দ জেগে উঠলো ; কালো মেয়েটি হাসতে শুরু করে দিয়েছে ; কেরাণী বাবুটিও তার সঙ্গে যোগ দিলো ; পরক্ষণেই সেই পাচকের মতন দেখতে লোকটাও উঠলো হেসে। বিহ্বল বিমূঢ় নাতালিয়া ওদের পানে তাকালো, পুনরায় তাকালো পলের মুখের দিকে তারপর প্রবল উচ্চ হাসির ধমকে ফেটে পড়লো। সমস্ত ঘরখানি চারটি নরনারীর প্রবল অট্টহাসির ঘায়ে কেঁপে উঠলো...

নিজের এই আকস্মিক অসংবন্ধ অভিব্যক্তিতে বিস্মিত স্তম্ভিত পল মেঝের উপরে বসে পড়ে ম্লান উদভ্রান্ত দুটি চোখের নির্বোধ দৃষ্টি মেলে ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সত্যিই ওকে কেমন যেন অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, হাস্যস্পদ দেখাচ্ছিলো। বসন্তের কুৎসিত দাগেভরা দুগালের উপরে চোখের জলের ধারা নেমে এসে মুখখানিকে করুণ করে তুলেছে; মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত—এলো মেলো হয়ে ঝুলে পড়ে কেমন যেন সংয়ের মতন দেখাচ্ছে ; ম্লান নিস্প্রভ চোখ, মুখটা হা করা, মুচির এপ্রোনের ভিতর থেকে জামাটা বেরিয়ে পড়েছে, জুতার উপরে জড়ানো ভিজা চট্‌চটে থলের টুকরা—সব মিলে এমন একটা মূর্তি ধারণ করেছে যে, ওকে দেখলে অনুকম্পার পরিবর্তে কৌতুকই জাগিয়ে তোলে।

চারটি নরনারীর মিলিত হাসি ক্রমে আরও উচ্চ, আরও উশৃংখল হয়ে উঠলো; পল তেমনি বিমূঢ় তেমনি নির্বাক নিষ্পন্দ হয়ে মেঝের উপরে বসে রইলো। মেঝের উপরে কে একজন মদের গ্লাস উপুড় করে ঢেলে দিলো; মদ গড়িয়ে পলের দিকে এগিয়ে চললো, আর সঙ্গে সঙ্গে কালো মেয়েটি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লো; তারপর পলের মাথা লক্ষ্য করে একটা মেয়েদের টুপী ছুঁড়ে মারলো; টুপীটা পড়লো গিয়ে পলের হাঁটুর উপর; বোকার মতন পল টুপীটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো।

হাসির শব্দ আরও উচ্চে উঠলো। হাসতে হাসতে সবাই একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়লো, তারপর কেশে, কেঁকিয়ে, অস্থির হয়ে উঠলো। পল

এমন একটা অদ্ভুত ভংগী করে উঠে দাঁড়ালো যে সেটা আরও হাস্যস্পদ হয়ে উঠলো। পল হাতের টুপীটা সজোরে মেঝের উপরে ছুড়ে দিলো তারপর নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে সক্রোধে বলে উঠলো: আচ্ছা, মনে—থাকে—যেন!

পর মুহূর্তেই পল ওদের অট্টহাসির ভিতর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে চলে গেলো।

ওঃ! কি আমার বীরপুরুষ গো!—চীৎকার করে কে যেন বলে উঠলো।

হাসতে হাসতে ওদের চোখ বেয়ে জল নেমে এলো।

ওহো-হো! হাঃ-হাঃ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

উঃ! জাহান্নামে যাক! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওর মাথায় জড়ানো ন্যাকড়াটা লক্ষ্য করেছ? হাঃ-হাঃ-হাঃ! পিছনের দিকে কেমন লেজের মতন ঝুলে ছিলো! আর চুলগুলো! —দেখেছ, ঠিক যেন ফুলের মালা! হাঃ-হাঃ! হাঃ-হাঃ!

একঘেয়ে ঝুপঝুপ শব্দে বাইরে তখন মুশলধারে বৃষ্টি পড়ছিলো। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এলো।

কালো কালো ভিজা ডালপালার গা থেকে শেষ পাতা ক'টিকে ঝরিয়ে দিয়ে তিন দিন ধরে চললো অবিশ্রাম বর্ষণ। অদৃষ্টের মতন নির্বিকার কপট ঔদাসীন্যে ক্লান্ত গাছের ডগাগুলি ক্রুদ্ধ বাতাসের ঘায়ে ঝট্‌পট্‌ করছে তারপর ঘৃণায়, দুঃখে আর তীব্র কন্‌কনে শীতে পাগলের মতন হয়ে মাটির পানে ঝুঁকে পড়ে যেন কোন হারাণো প্রিয়াকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে। প্রবল বারিপাতের সংগে উদ্দাম হাওয়ার অবিশ্রাম গর্জনে যুগপৎ ধ্বনিত হচ্ছে বিদায়ী গ্রীষ্মের অন্তিম প্রার্থনার করুণ সুর আর আগতপ্রায় শীতের উদ্দেশ্যে স্বাগত সম্ভাষণ। আকাশ ছাওয়া ঘন ধূসর মেঘ—ওদের যেন বিদায় নেবার আদৌ কোন সদিচ্ছা নেই—নীল আকাশের স্বচ্ছ দৃষ্টির অন্তরালে কর্দমাক্ত অশ্রুমুখী ধর্ষিতা ধরিত্রীকে লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ভিজা ভারী তুষার কণাগুলি শহরের মাথার উপরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো; তেমনি করে খুঁজে ফেরা পাগল হাওয়া সেই উড়ন্ত শ্বেত তুষার কণাগুলিকে

দুহাত জড়ো করে দেয়ালে, ছাদে, আলিসায় স্তূপীকৃত করে তুললো।

সেই দিন সন্ধ্যায় পল যেমন করে কর্মক্লান্ত দিনের শেষে লোক গৃহাভিমুখে ফিরে আসে, তেমনি করে উঠান পেরিয়ে হেটে চললো। চলেছে সে অতি সন্তর্পণে, কাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, যাতে করে না জুতায় কাদার দাগ লাগে। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে নাতালিয়ার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর কি যেন খানিকক্ষণ ভাবলো। আজ ওর পরণে সর্বোৎকৃষ্ট পোষাক—পরিষ্কার তকতকে। মুখের ভাব শান্ত, গম্ভীর কিন্তু কেমন যেন একটু শীর্ণ। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে তারপর আস্তে আস্তে দোরের কড়া নাড়লো। এক পায়ের উপর থেকে অন্য পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পল দোর খোলার জন্য অপেক্ষা করে রইলো তারপর মৃদু সুরে একটি শিস দিয়ে উঠলো।

কে? —নাতালিয়া ভিতর থেকে সাড়া দিলো।

আমি, নাতাশা! —পল শান্ত উচ্চস্বরে জবাব দিলো।

আঃ! তুমি ! —দরজা খুলে গেলো।

তারপর? খবর কি? পল টুপী খুলে নাতালিয়াকে অভিবাদন জানালো।

ওঃ! কি মজার লোক তুমি! তারপর? সেদিনকার সে ভাব কেটে গেছে তো? কি আনন্দটাই না সেদিন দিলে আমাদের! আর কি চমৎকারই না দেখাচ্ছিলো তোমাকে! আচ্ছা, সেদিন তুমি ঐ পোষাকটাও কি বদলে আসতে পারোনি?

সেকথা আমার আদৌ খেয়াল ছিলো না, মাপ করো!

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে পল একটু হেসে উঠলো।

চা খাবে তো? আমি জল চড়িয়ে দিয়েছি।

না, ধন্যবাদ! এইমাত্র আমি চা খেয়ে এলুম।

নাতালিয়া লক্ষ্য করলো পলের কণ্ঠে কেমন যেন একটা শুষ্ক নির্লিপ্ত ভদ্রতার সুর।

এর মানে কি? এমন ছাড়া ছাড়া ভাব কেন? —নাতালিয়া ভাবলো, তারপর ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো একটু বাঁকা, ঘৃণার হাসি। এখন আর অন্য দশজনার সঙ্গে পলের কোন প্রভেদ নেই ওর চোখে। সেদিন

সেই অপরিচিত বাইরের লোকজনের সামনে ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পলের যা কিছু মূল্য ছিলো তাও ধূলায় অবলুণ্ঠিত হয়ে গেছে। এর আগেও অবশ্য কয়েকবার নাতালিয়া অল্পবিস্তর অবিশ্বাসীনী হওয়ার অভিযোগে নির্দয়ভাবে প্রহার খেয়েছে। অনুরূপ ব্যবহারই সে আশা করছিলো পলের কাছ থেকে; কিন্তু পল এলো সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি নিয়ে। নাতালিয়ার মতে অন্যের সঙ্গে পলের এই যে প্রভেদ সেটা আদৌ তার দাবীর অনুকূলে নয়। যারা মারধোর করে তারা সত্যি সত্যিই ভালোবাসে। আর যখন কেউ সত্যি সত্যিই ভালোবাসে এইসব ক্ষেত্রে তারা যে কেবল নির্দয়ভাবে প্রহার করেই ক্ষান্ত হয় তা নয়; এমন কি হত্যা পর্যন্ত করার চেষ্টা করে—উদ্ধত হয়ে ওঠে চরম পন্থা অবলম্বন করতে।

কিন্তু পল—সে কিনা এসে লুটিয়ে পড়লো ওর পায়ে! তাও আবার একঘর অপরিচিত বাইরের লোকের সামনে, আর মেয়েদের মতন কান্নাকাটি জুড়ে দিলো! এটা মোটেই পুরুষোচিত নয়—নয় মানবোচিত। যুক্ত করে প্রার্থনায় নয়, কান্নাভরা সিক্ত চোখে নয়—নারীকে জয় করে নিতে হয় নিজের শৌর্যে—শক্তির জোরে—যুদ্ধ করে। তবেই না সে হবে তোমার! কিম্বা—হয়তো হবে না তখনও...

পল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো।

আমাদের দুজনার ভিতরে আর কোন বন্ধন নেই। ছিলো বন্ধুত্ব, এখন তাও চুকেবুকে শেষ হয়ে গেছে। আজ সেটা অতীত!

নাতালিয়া অবাক হয়ে গেলো কিন্তু সে ভাব চেপে গেলো—বাহ্যিক প্রকাশ হতে দিলো না। —'বোধহয় পল এসেছে বিদায় নিতে...চিরদিনের জন্য।' —বিছানার উপরে বসে পড়ে নাতালিয়া পলের বাকী কথাগুলো শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বড্ডো অন্ধকার, নাতালিয়া। বোধহয় এখন আলো জ্বালাবার সময় হয়েছে...

বেশ! —নাতালিয়া উঠে আলো ধরালো।

গভীর চিন্তাক্লিষ্ট দুটি চোখ নাতালিয়ার মুখের পরে রেখে পল বলতে আরম্ভ করলো :

এই শেষবারের মতন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, নাতালিয়া! জীবনে আর কোন দিনও এ সুযোগ হবে না!

কেন? —নাতালিয়ার চোখ দুটি আপনা থেকেই নত হয়ে এলো। এমন অবস্থায় কি করা সংগত সে সম্পর্কে নাতালিয়ার কোন বিশেষ ধারণা নেই। সে কোনও একটা সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো, তখন উপযুক্ত ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে পারবে। লক্ষ্য করলো এ ক'দিনের ভিতরেই পল কতো রোগা, কতো শীর্ণ হয়ে উঠেছে। পলের ভাবভংগী ওকে বিস্মিত করে তুল্লো।

অমন কথা বলছ কেন তুমি?

সময় হয়েছে তাই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এখানেই সব কিছুর শেষ করতে হবে।...কেনই বা নয়? এর পরেও আর বেশী কি তোমার কাছ থেকে আমি আশা করতে পারি? —অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পল নাতালিয়ার মুখের পানে তাকালো।

সেদিন যা ঘটে গেছে তার জন্য নাতালিয়ার দুঃখ হলো, অনুশোচনা হলো। মুহূর্তে পলের প্রতি করুণায় ওর অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো।

নাতালিয়া অনুভব করলো বাহ্যতঃ শান্ত গম্ভীর সমাহিত ভাব সত্ত্বেও পল দারুণ অসুখী—নির্মম আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে হৃদয়। যাই হোক না কেন তবুও নাতালিয়া নারী। কোন হতভাগ্য পুরুষের মন্দ ভাগ্য চোখের সামনে দেখে কোন নারীই কখনও স্থির থাকতে পারে না—চেপে রাখতে পারে না তার অন্তর মথিত করে জমে ওঠা করুণার বিগলিত প্রস্রবণ।

তোমার এসব কথার অর্থ কি? কেন...আমি তো সব সময়েই রাজী আছি ...নাতালিয়া পলের একান্ত সন্নিকটে এগিয়ে এলো।

না—না আর তার কোনই প্রয়োজন নেই—পল একটু ঠেলে নাতালিয়াকে দূরে সরিয়ে দিলো। —এই শেষ। সে সব চুকে বুকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঠিকই বলেছিলে তুমি—আমিই বা কেমন স্বামী হবো আর তুমিই বা হবে কেমন স্ত্রী? হাঁ, এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন।...

পল একটু চুপ করে রইলো।

কি বলতে চাইছে ও? —নাতালিয়া ভাবলো, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। ভিজা তুষার জানালার গায়ে মৃদু মৃদু টোকা মেরে যেন ওকে সাবধান করে দিতে চাইছে—মনে করিয়ে দিতে চাইছে...হাঁ, আমারও ধারণা তাই তোমার কথাই ঠিক। খুবই খারাপ হতো সেটা...শান্ত মৃদু কণ্ঠে নাতালিয়া বলে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে ওর অন্তর পূর্ণ করে পলের প্রতি জেগে উঠলো করুণা।

হাঁ, ঠিকই তাই। কিন্তু আমি তো এভাবে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারিনা। কিছুতেই না! বহুদিন ধরে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি তোমার মূর্তি—প্রতিষ্ঠিত করেছি তোমায় আমার অন্তরে; আমার সবটুকু অন্তর পূর্ণ করে রয়েছ কেবল মাত্র তুমি। আবার বলছি আমি—দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ভিতরে একমাত্র তুমিই আমার সবচাইতে প্রিয়, সবচাইতে আপনার জন। একান্ত আমার আপনার। তোমার সংস্পর্শে, তোমার সান্নিধ্যে এসেই প্রথমে আমি বুঝতে পারলাম জীবনের মূল্য, বেঁচে থাকার সার্থকতা। তাই তুমি আমার কাছে সবচাইতে আপনার, সবচাইতে প্রিয়... অমূল্য সম্পদ। আমার অন্তরের সবটুকু সত্য দিয়ে এই কথাটাই আমি বার বার তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি। প্রতিনিয়ত রয়েছ তুমি আমার অন্তর জুড়ে —আমার অন্তরের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি।

পলের কণ্ঠ কেঁপে উঠলো।

নাতালিয়ার দু'গাল বেয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় নেমে এলো চোখের জল; কিন্তু যাতে সেটা পলের চোখে না পড়ে তাই সে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলো।

অধিষ্ঠিত হয়ে আছ তুমি আমার অন্তরে—আমার সবটুকু জীবন সবটুকু সত্তা পরিপূর্ণ করে...পল পুনরায় বলতে লাগলো :

আমার চোখের সামনে এমনি করে তিলে তিলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে—ডুবে যাবে কলঙ্কের পঙ্কিল কালিমায়, যাপন করবে কুৎসিত সম্মানহীন পাপ জীবন—তা দেখেও তোমায় ফেলে আমি দূরে চলে যাবো, তা কখনই হতে পারে না। কখনই না—কিছুতেই আমি পারি না তা। আমার সবটুকু অন্তর আত্মা দিয়ে যাকে আমি ভালোবাসি—দুনিয়ায় একমাত্র যে আমার আপন জন তাকে আমি অন্যের কলুষিত নোংরা হাতে কলঙ্কিত হতে দিতে পারি

না। না তা কিছুতেই হ'তে দিতে পারি না, নাতালিয়া! কিছুতেই না!

পল নাতালিয়ার দিকে একটু ঝুঁকে এলো, কিন্তু ওর মুখের পানে তাকাবার চেষ্টা করলো না। ওর কণ্ঠে জ্বলে উঠলো দৃঢ়তার অগ্নিশিখা—তার চাইতেও বেশী যেন কি...কি একটা মুগ্ধ মিনতিভরা, মার্জনাভরা সুর। পলের বাঁ হাতখানা নাতালিয়ার কোলের উপর আর ডান হাতখানা কোটের পকেটে।

এসব কথার অর্থ কি? কি বলতে চাইছ তুমি? —ফিস্ ফিস্ করে নাতালিয়া বলে উঠলো। তখনও সে তার মুখখানা অন্যদিকে ফেরানো আর প্রাণপণ শক্তিতে বুকের ভিতরের উথলে ওঠা কান্নার উদ্‌গত বেগ প্রশমিত করার চেষ্টা করছে।

তার মানে এই!...

পল তার পকেটের ভিতর থেকে একখানা লম্বা ছুরি টেনে বের করলো তারপর অকম্পিত দৃঢ় হস্তে নাতালিয়ার পাঁজরার ভিতরে আমূল বসিয়ে দিলো।

আঁ—আঁ—আঁ! —ক্ষীণ কণ্ঠে একটিবার মাত্র গোঙিয়ে উঠে নাতালিয়া ঘুরে পলের দিকে এলিয়ে পড়লো। ওর মুখখানি তখন পলের দিকে ফেরানো।

পল দু'হাতে ওর এলিয়ে পড়া দেহখানি তুলে ধরে বিছানার উপরে শুইয়ে দিলো, তারপর হাত দিয়ে কুঁচকে যাওয়া পোষাকটা টেনে ঠিক করে দিয়ে ওর মুখের পানে তাকালো।

একটা প্রশ্নভরা পরম বিস্ময়ের ভাব যেন নাতালিয়ার মুখে জমাট বেঁধে গেছে; ভ্রূ-দুটি ঊর্ধ্বে, চোখ দুটি ম্লান, নিষ্প্রভ, কিন্তু বিস্ফারিত। আধ-বোজা মুখ—দু'গালে ভিজা অশ্রুর কলঙ্ক রেখা।

এতক্ষণে পলের সুদৃঢ় স্নায়ুমণ্ডলী ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। অস্ফুটস্বরে একটিবার মাত্র গোঙিয়ে উঠে তারপর অতৃপ্ত তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে নাতালিয়ার মুখখানা চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিতে দিতে প্রবল কান্নার বেগে ভেঙে পড়লো। প্রবল কম্প জ্বরের মতন ওর সমস্ত দেহখানা বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। নাতালিয়ার দেহ ততক্ষণে ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে।

জানালার কাচের উপরে জেগে উঠলো তুষারপাতের শব্দ। চিমনির

ভিতরে গর্জে উঠলো প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার দীর্ঘ হুঃ হুঃ শ্বাস—ঠান্ডা ভিজা বন্য। উঠানের ভিতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার; অন্ধকার জমে উঠেছে ঘরের ভিতরে। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে নাতালিয়ার মুখখানা একটা অস্পষ্ট দাগের মতন ফুটে রয়েছে; ওর বুকের উপরে পড়ে আছে পল—তার সর্বাংগ যেন পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে।

দীর্ঘ বিয়াল্লিশ ঘণ্টা ওরা ছিলা দু'জনে একা। বিছানার উপরে নাতালিয়ার প্রাণহীন দেহ এলিয়ে পড়ে রয়েছে—পাশে ছোরাখানা। ওর বুকের উপরে মাথা রেখে পল কাঁদছে—অঝোর, বিরামহীন, বুকফাটা কান্না। জানালার বাইরে শরতের ঠান্ডা ভিজা বাতাস উচ্চৈঃস্বরে সেই কান্নার প্রতিধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে।

পরের দিন সন্ধ্যায় সবাই দেখলো পল ঠিক তেমনিভাবেই পড়ে রয়েছে নাতালিয়ার বুকে মাথা রেখে।

(দশ)

মানুষের বিচারের চরম দন্ড যখন পল গিবলির মাথার উপরে উদ্যত হয়ে উঠলো তখন নববসন্তের প্রথম আবির্ভাব।

তরুণ বসন্তের সোনালী রোদ জানালার পথে এসে ছড়িয়ে পড়েছে সেই ঘরে, যেখানে বসেছে বিচারশালা। দুজন জুরির কেশবিরল চকচকে টাকের উপরে রোদ পড়ে মাথা দু'টোকে নিষ্ঠুরভাবে উত্তপ্ত করে তুললো। তাঁদের ঘুম পেলো। অন্যান্য জুরি, আদালতের আর সব কর্মচারী অথবা দর্শকদের চোখে তাঁদের ঐ অলস নিদ্রালুতা পাছে ধরা পড়ে যায় সেই জন্য তাঁরা এমনভাবে ঝুঁকে বসলেন যেন দেখলে মনে হয় তাঁরা মামলার বিষয় গভীর মনোযোগের সংগে শুনছেন।

ওদের ভিতরের একজন কাছের দর্শকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন; কিন্তু হয়তো একখানাও তেমন বুদ্ধিদীপ্ত মুখ তাঁর চোখে না পড়ায় হতাশ হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। অন্য জন গোঁফের একদিক পাকাতে পাকাতে পেন্সিল কাটায় ব্যস্ত পেশকারের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইলেন।

ঠিক সেই সময় বিচারক ঘোষণা করলেন:

এই ভিত্তিতে...আসামীর সম্পূর্ণ সজ্ঞানে...এখন আমি সাক্ষীদের জেরা করতে চাই...

পরে সরকার পক্ষের উকীলের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন:

আপনার আর কিছু বলবার আছে?

সরকার পক্ষের উকীল—সাদাসিধা ভালো মানুষ গোছের চেহারা, ঠোঁটের উপরে আরসুলার মতন একজোড়া গোঁফ—অমায়িক হাস্য দন্ত বিকশিত করে জবাব দিলেন:

আসামী পক্ষের উকীল মহাশয়! আপনার আর কিছু বলবার আছে?

আজ্ঞে কিছু না, মাননীয় বিচারপতি মহোদয়!

সরকার পক্ষের উকীলের চাইতে আসামী পক্ষের উকীলও কম অকপট নন; তিনিও এক বাক্যে জবাব দিলেন যে তাঁরও আর কিছু বলবার নেই। তাঁর মুখের ভাবেও সে কথাটা যেন স্পষ্ট ফুটে উঠলো।

আসামী! তোমার আর কিছু বলবার আছে?

আসামীরও আর কিছু বলবার নেই। পলের সমস্ত মুখচোখে কেমন যেন একটা অবোধ বোকা বোকা ভাব; বসন্তের দাগেভরা ভাবলেশহীন মুখের ভংগী দেখে সবাই যেন বিরক্ত হয়ে উঠেছে ওর উপরে।

তিন পক্ষই—সরকার পক্ষের উকীল, আসামী পক্ষের উকীল এবং আসামী নিজে—একযোগে যেন দর্শকদের প্রতারিত করলো; সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে এক বাক্যে বলে দিলো যে কারুরই কিছু বলবার নেই।

সরকারী উকীল মহাশয়ের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে—প্রয়োজন মত তিনি মুখেচোখে ক্ষুধার্ত ডালকুত্তার মতন ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন; তাছাড়া ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করা এবং অন্যের ভীতি উৎপাদন করানোর দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতাও আছে। এমন একটা ভীষণ মূর্তি ধারণ করে তিনি জুরিদের দিকে তাকালেন যেন যদি তাঁরা আসামীর প্রতি এতোটুকুও দয়া প্রদর্শন করেন তবে তাদের হাতে মাথা কেটে নেবেন।

আসামী পক্ষের উকীলের মুদ্রাদোষ ছিলো, কোনও কিছু বলবার আগে

প্রতিবাদ হিসাবে তিনি নাক ঝাড়া দিতেন; তারপর চুলগুলোকে এলোমেলো করে বক্তৃতায় করুণ ভাষা ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি বলতে শুরু করলেন—অবজ্ঞা মেশানো প্রতিবাদভরা উচ্চ কণ্ঠে গড়গড় করে বলে চললেন:

জুরি ভদ্রমহোদয়গণ!...

তাঁর বাগ্মীতার ভিতরে কেবল একটিমাত্র স্থানে করুণ রসের আমেজ ফুটে উঠলো, কিন্তু বাকী বক্তৃতাটা এতো জোলো এতো প্রাণহীন হলো যে তা আদৌ হৃদয় স্পর্শ করলো না।

এই দীর্ঘ বিচার সময়ের ভিতরে আসামী মনে মনে কেবলমাত্র একটি আশা পোষণ করে এসেছে।

বিচারে যখন ওর বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো তখন সে সবাইকে শুনিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলো:

মাপ করুন!—বিচারকের দিকে তাকিয়ে পল তাঁকে অভিবাদন করলো, তারপর বলতে আরম্ভ করলো,—ওর কণ্ঠ ভাঙা, দুচোখ বেয়ে বিগলিত ধারায় জল নেমে এসেছে: মহামান্য বিচারপতি মহোদয়! একটি বারের জন্য আমি তার কবরটি দেখতে পারি?

কী?—কঠোর কণ্ঠে বিচারপতি গর্জে উঠলেন।

কেবলমাত্র একটি বারের জন্য আমি তার কবরটি দেখতে চাই—আসামী ভয়ে ভয়ে তার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলো।

অসম্ভব!—বিচারক চীৎকার করে ফেটে পড়লেন। তারপর মঞ্চ থেকে নেমে একটা ভীতিপূর্ণ পায়ের শব্দ করতে করতে গড়্‌গড়্‌ করে বারান্দার উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।

দুজন শান্ত্রী এসে আসামীকে নিয়ে চলে গেলো—যেমন করে বরাবর ওরা বিচারশালার কক্ষ থেকে আসামীদের নিয়ে যায়।

—শেষ—